ক্রীতদাস
শ্রীপান্থ

ক্রীতদাস

শ্রীপান্থ

আনন্দ

প্রিয় যুগল

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

ও

রতন খাসনবিশ

ইতিহাসে এমন কিছু কিছু আলো-আঁধারি পর্ব আছে যেখানে একবার প্রবেশ করলে বেরিয়ে আসা কঠিন। ছত্রিশ বছর আগে নিজের অজান্তে এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি একবার পা বাড়িয়েছিলাম এমন একটি অধ্যায়ে। পরক্ষণেই বুঝতে পারি এই ইতিহাস মানুষের সুখ-দুঃখের, যুদ্ধের ও শান্তির গতানুগতিক উপাখ্যান নয়। এখানে যতদূর চোখ যায় সামনে নিঃসীম অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলোর ঝলক। তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দু'পাশে গলিত শব আর কঙ্কালের পাহাড়। বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মানুষের আর্তনাদ। কানে আসে শেকলের ঝংকার, চাবুকের সপাং সপাং, নারী আর শিশুর বিরামহীন কান্না। সেই অসহ্য হৃদয়-বিদারক এবং শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। আমার মনে একদিকে ভয়, অন্যদিকে অব্যক্ত বেদনা। ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় আমি উন্মাদের মতো সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু অন্তহীন যেন সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ। সেদিন পালাতে গিয়ে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম কালা হরফে এখানে ধরা রইল তারই বিবরণ, পলাতকের জবানবন্দি।—হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যান্ড হোয়ার আই ইজ বর্ন আই ডু নট নো!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রাহাম শ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন; উইলবারফোর্স সংগ্রহশালা, হাল;
মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্ট, নিউইয়র্ক; আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরি উপদেষ্টা
শক্তিদাস রায় ও তাঁর সহকারী সুনীল দাস,
মীরা সরকার, গৌতম ভদ্র, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, পুষ্পেন্দু নাথ
এবং যেসব বই থেকে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে
তাদের প্রকাশক, লেখকবৃন্দ এবং মূলসংগ্রহকারীগণ

"হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যান্ড হোয়্যার আই ইজ বর্ন আই ডু নট নো!" বলেছিলেন ভার্জিনিয়ার এক বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ। লিঙ্কনের পায়ে পায়ে সহোদর ভাইয়ের মতো ছুটে এসেছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক। হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন—কে তুমি বলো। বুড়ো হেনরি ভাঙা ইংরেজিতে বলেছিল—জানি না। আমরাও তাই বলি।—আমি কে, বয়স আমার কত,—কোথা আমার জন্ম আমি জানি না। কেউ জানে না। শুধু এটুকুই জানি আমরা যেদিন জন্মেছিলাম, লুম্বিনী উদ্যানে গৌতম সেদিন ভূমিষ্ঠ হননি, আমাদের কৈশোরে জেরুসালেমেও আমরা যিশু নামে কারও নাম শুনিনি, জুলিয়াস সিজার তখনও গলদেশ আক্রমণ করেননি,—সব ক'টি পিরামিডের কাজ শেষ হয়নি। শুধু তাই নয়, আমাদের যখন যৌবন, বাবর তখনও হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেয়নি, সেন্টামারিয়া স্পেনের উপকূল ছেড়ে নতুন পৃথিবীর সন্ধানে বের হয়নি, ফরাসি দেশে বিপ্লব হয়নি, ইংল্যান্ডে উইলবারফোর্স নামে কোনও ভদ্রসন্তানের নাম শোনা যায়নি। আমাদের যখন চূড়ান্ত যৌবন, সভ্যতার তখন শৈশব মাত্র। তামা আর ব্রোঞ্জের দিন পেরিয়ে সম্ভবত মানুষ তখন সবেমাত্র লোহা হাতে পেয়েছে—বর্শার সঙ্গে শেকলের কথা ভাবছে।

আমি সেই সূর্যোদয়ের দিন থেকেই আছি। আমরা সভ্যতার এক আশ্চর্য সহযাত্রী। সিন্ধু উপত্যকায় যেদিন নবীন মানুষের পদসঞ্চার, আমরা সেদিন গমের খেতে কাজ করছি, নীল অববাহিকায় ফারাওদের আবির্ভাবের আগে থেকে আমরা কাপাস বুনেছি। আমাদের হাতে হাতে মহেঞ্জদরো আমাদের হাতে হাতে পার্থেনন, পিরামিড। আমরা নেবুচাঁদ নাজারের পানপাত্রে সাকি হয়ে সুরা ঢেলেছি, থিব্‌স্‌-এ আলেকজান্ডারের লড়াই দেখেছি। হোমারের কালে আমরা উলঙ্গ দেহে খনিতে কাজ করেছি, বাইজেনন্টাইন সম্রাটদের ক্ষুধার্ত আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্যে আমরা নিজেদের সিংহের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছি, রোমান সেনেটারদের করতালির লোভে আমরা তলোয়ার হাতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করেছি—আপন সঙ্গিনীকে কুমিরের মুখে তুলে দিয়েছি।

অ্যাম্ফিথিয়েটারে আমরা ক্রীড়াবস্তু, হারুন-অল-রসিদ-এর প্রাসাদ-অভ্যন্তরে পরিচয় আমাদের হুরি, আবার দিল্লি-লাহোরে হারেমের দরজায় দরজায় আমরাই খোজা প্রহরী। আমরা কখনও পৌরুষহীন পুরুষ, কখনও বাদশাহের ঈর্ষা অপরূপা নারী। পণ্য হয়ে আমরা দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, উপহার হয়ে আমরা এক রাজধানীর শহরতলি থেকে দেশান্তরে সম্রাটের অধীশ্বরী হয়েছি। আমরা কখনও

কেবলই খেটে-খাওয়া মানুষ, কখনও নর্তকী, কখনও কবি, আমরাই কখনও হিন্দুস্থানের বাদশা, রোমের যাজক। আমরা যখন কাঁদি অ্যারিস্টটলের মতো মানুষ তখন হাসেন, আমরা যখন শেকল ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াই তখন হাইতি তো সামান্য কলোনি—রোমান সাম্রাজ্যেরই ভিত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে। আমাদের কথা শুনে এলিজাবেথ কাঁদেন, প্লেটো ভাবতে বসেন—তবুও হাজার হাজার বছর পরে জর্জিয়ার গভর্নর সরকারি কাজ ছেড়ে জাহাজ নিয়ে আমাদের খোঁজে আফ্রিকা ধাওয়া করেন।—রাজা চতুর্থ উইলিয়াম কোম্পানি গড়েন, কলকাতার কাগজ বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কমদামি আফ্রিকান তরুণী খোঁজে! আমরা এক আশ্চর্য অস্তিত্ব। সভ্যতার এক বিস্ময়কর সঙ্গী। শেকল সবদিন ছিল কি নেই, মনে পড়ে না, আমাদের উলঙ্গ পিঠ ইতিহাসের শিলালিপি। তাকিয়ে দেখো সেখানে নানা রঙে, নানা ভাষায় লেখা আছে বান্দাছাপ— মানুষের বিস্ময়কর কাহিনী। আমরা মানুষের বিস্ময়কর কাহিনী। আমরা ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। সম্ভবত আজও আমরা বেঁচে আছি। আমি এই বিশ শতকের পৃথিবীতে আছি। হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যান্ড হোয়ার আই ইজ বর্ন আই ডু নট নো!

আমি জানি আমি কে। আমি জানি কেন আমি আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজে, এই আখের খেতে। সে অনেক-অনেককাল আগের কথা। এবং লিঙ্কন তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি। লিভিংস্টোন প্রদীপ হাতে আফ্রিকার অন্তর্লোকে পা বাড়াননি। কিন্তু খ্রিস্টের বয়স হয়েছে, আমরা জানি, বেথেলহামের সন্ন্যাসীর বিদায়লগ্ন এক হাজার সাতশো ছেষট্টি পেরিয়ে সাতষট্টিতে পড়েছে, তাঁর প্রতাপ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। আমরা তখন উপকূলে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে পশ্চিমের সেই সূর্যোদয় দেখছি। আনন্দে আতঙ্কে, উত্তেজনায় আশঙ্কায় ঢাক পিটিয়ে বনের মানুষকে ডাকছি, শিশুর কৌতূহল নিয়ে সাগরের দিকে আঙুল তুলে একজন আর একজনকে বলছি—দেখো, দেখো।

পাল-খাটান মস্ত মস্ত জাহাজ ওদের, অদ্ভুত নিশান, অদ্ভুত চালচলন। হাতে হাতে আগুন-ভরা নল, পলকে সেখান থেকে মরণ ছুটে বেরিয়ে আসে। খোল বোঝাই পিপে ভরতি মদ, ওরা বলে ‘রাম’, অদ্ভুত গন্ধ তার, আশ্চর্য স্বাদ। ওরা আমাদের জাহাজে নিয়ে যায়, ‘রাম’ খেতে দেয়, রেশমি রুমাল দিয়ে আদর জানায়। মেয়েরা রং-বেরংয়ের পুঁতি পায়। সর্দারেরা তলোয়ার, বন্দুক, বাহারি পোশাক। আমরা আপত্তি করতে চাই, কিন্তু ওরা কিছুতেই শোনে না, জাহাজ খালি করে দু'হাতে সব বিলিয়ে দেয়, বলে ভাবছিস কেন? যিশুর দেশের মানুষ আমরা, ঈশ্বর দু'হাত ভরে আমাদের দিয়েছেন, তোরা নিবি বইকি!

মাঝে মাঝেই ওরা আসত। চলে যাওয়ার পর একবার দেখা গেল জনাকয় মেয়ে-মরদ গাঁয়ে নেই। সর্দার বলল—আমরা হল্লায় মেতেছিলাম, হয়তো বাঘে খেয়েছে, পুরোহিত বলল—হয়তো প্রেতে ধরে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলল—কে জানে, হয়তো সেই সাদা মানুষগুলোই ওদের খেয়ে ফেলেছে। একজন বলল—অসম্ভব

নয়, আমি দেখেছিলাম ক্যাপ্টেন বার বার লোভীর মতো মেয়েগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।—কে জানে, ওরা হয়তো-বা চোখেই খায়! কথাটা বিশ্বাস হল না বটে, কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল। আমরা পঞ্চায়েত ডেকে স্থির করলাম, আর জাহাজে যাওয়ার দরকার নেই, হতে পারে 'রাম' সরেস জিনিস, কিন্তু তা হলেও একটু সাবধান থাকা দরকার। বিশেষ করে আরও পাঁচ গাঁয়ের ধারণা, মানুষগুলো সুবিধের নয়। আচ্ছা, ঘরে থেকেই দেখা যাক না!

এ বার থেকে জাহাজ এলেও আমরা আর ঘর থেকে বের হই না। আমাদের মধ্যে একটু ভিতু যারা তারা আরও সাবধান, সাগরে পাল উঁকি দেওয়ামাত্র বনে পালিয়ে যায়। ওরা আসে, কাউকে দেখতে না পেয়ে মনমরা হয়ে ডেকের ওপরই ঘুরে বেড়ায়, কখনও-বা এক রাত্তির নোঙর করে থাকে, তারপর আবার নিজেদের পথে চলে যায়। আমরা মনে মনে ভাবি, আপদ বালাই।

পর পর দু'বার এমন হল। ওরা এল, চলে গেল। তৃতীয়বার এক অদ্ভুত কাণ্ড। ভোরে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি, আমাদের দুয়ারে পর পর পাঁচখানা জাহাজ বাঁধা। এতকাল জাহাজ সাগরেই থাকত, এ বার উপকূল ছেড়ে চলে এসেছে নদীর ভেতরে, একেবারে গাঁয়ের ধারে। চোখ বুঁজে থাকলেও ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কারণ আমাদের গাঁয়ের সত্যিই কোনও নাম ছিল না। ওরা নাম দিয়েছিল কালাবা। ওটা আসলে আমাদের নদীর নাম। বিয়াফ্রা উপসাগরের নাম শুনেছ নিশ্চয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল যেখানে হঠাৎ মানুষের চোয়ালের পরে গলার মতো বেঁকেছে সেখানটায় শান্ত জলের এই আনন্দিত সাগর। তারই বিশাল বুকে অরণ্যের আদিমতা নিয়ে আছড়ে পড়ছে বিরাট নদী কালাবার। কেউ কেউ বলে—কালাবা। বিরাট নদী। সঙ্গমে চওড়ায় প্রায় তিন মাইল। স্বভাবতই জল এখানে অপেক্ষাকৃত কম, লগি ফেললে তিন থেকে পাঁচ ফেদম। সুন্দর জায়গা। আফ্রিকা এখানে মধ্যরাত্রির অরণ্য নয়। নদীর দুই তীরের বন ঘন ঝোপ মাত্র। তারই মধ্যে নির্মম আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি তাল নারকেল। সূর্য তাদের কাছে নাগালের বাইরে নয় বলেই হয়তো গাছগুলো বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে গেছে, ছাতার মতো পাতাগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অগণিত লেগুন,—জলা; তালের ছায়ায় সেখানে নলখাগড়া আর হাওয়ার খেলা।

নদীর মুখে এমনি দুটি জলার মধ্যে ছোট ছোট দুটি দ্বীপ। তার পিঠে এলোমেলো কতকগুলো কুটির, দুটি বসতি। ওরা তার নাম দিয়েছিল ওল্ড কালাবার আর নিউ কালাবার। কখনও নিউ কালাবারকে বলত ওরা নিউ টাউন। আমরা সেই জনপদের মানুষ। রক্তে দুই দ্বীপ আমরা এক ছিলাম। একই দেবতা, একই ভাগ্য, একই পৃথিবী। সুতরাং পাশাপাশি এই দুই দ্বীপে অশান্তির কোনও কারণ ছিল না। চিরকাল আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী। কিন্তু সেবার উপকূলে সেদিন এক সঙ্গে পঞ্চ জাহাজ, আমরা তখন উত্তেজিত প্রতিবেশী। তুচ্ছ কারণে অবশ্য, কিন্তু আমাদের দুই দ্বীপে সেদিন মুখ

দেখাদেখি বন্ধ। সুতরাং আমরা ওল্ড কালাবার মানুষেরা নিউ টাউনের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটতে পারলাম না, অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে জাহাজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দিন যায়, কিন্তু জাহাজের নড়বার কোনও লক্ষণ নেই। আমরা শুনলাম—শুনতে পেলাম জাহাজগুলো সব এক জায়গার নয়। তাদের এক-একটি এক-এক নাম এক-এক দেশ। নামগুলো সব অদ্ভুত অদ্ভুত; ইন্ডিয়ান কুইন, ডিউক অব ইয়র্ক, ন্যান্সি, কনকার্ড, ক্যান্টারবেরি। তার কোনটি নাকি এসেছে লিভারপুল থেকে, কোনটি বোস্টন, কোনটি লন্ডন থেকে। তা আসুক, কিন্তু এ ভাবে মিছিমিছি নদীতে এসে পড়ে থাকা কেন? তবে কি ওরা পথ ভুল করেছে? দূরে থেকে আমরা দেখতাম এক দু'জন করে নিউ টাউনের লোকেরা জাহাজে উঠছে, ডেকে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে চারপাশে কী যেন দেখাচ্ছে। বোধ হয় পথ ঘাট বোঝাচ্ছে। ওরা ডেক ছেড়ে নেমে আসছে, দেখামাত্র আমরা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতাম, যে-যার কাজে চলে যেতাম। তখন জুম-এর মরশুম। মাঠেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের এক গল্প,—জাহাজ, জাহাজ, আর জাহাজ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরামাত্র হঠাৎ ঢাকের দুম-দুম। চেনা আওয়াজ, ভয়ের কিছু নয়,—সর্দারের দাওয়ায় কথাবার্তা আছে,—পঞ্চায়েত। ওল্ড টাউনের মেয়ে-মরদ সবাই ঘর ছেড়ে তখুনি সেদিকে ছুটল। সভা বসল। সর্দার বলল,—জাহাজের ক্যাপ্টেনরা আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। তারা এখানে এসে শুনেছে আমরা এক রক্তের মানুষ হয়েও দুই দ্বীপ শত্রু হয়ে আছি, শুনে তারা খুব ব্যথিত হয়েছে। তারা চায় আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলি। নিউ টাউনের সর্দারকেও তারা জাহাজে নেমন্তন্ন করেছে। আমি গেলে ওরা মধ্যস্থ হয়ে সব ঝামেলার ফয়সলা করে দিতে রাজি। সঙ্গে আমি আমার গাঁয়ের লোকেদেরও নিয়ে যেতে পারি। বিবাদ মিটে গেলে জাহাজে খাওয়া দাওয়া হবে।—কি তোরা রাজি?

আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক শলাপরামর্শ করলাম। তারপর বললাম—গররাজি হয়েই লাভ কি? বিবাদটা যদি মিটে যায় তা হলেই ভাল নয় কী? এক ভয়, আগের বারের মতো কেউ যদি হারিয়ে যায়। এ বার বরং ক'জন যাচ্ছি মাথা গুনতি করে যাব, ফেরার সময়ে মাথা গুনে ফিরব।

সর্দার বলল—হুঁ, তা বুদ্ধি মন্দ নয়। তবে এখনি ঠিক করে ফেলা যাক ক'জন যাবে। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমি তাই নিজে যেতে পারব না। তবে ভয় নেই, বদলে আমার বউরা যাবে। আর যাবে আমার তিন ভাই। কথাবার্তা যা বলা দরকার তা এই তিনজনের বড় যে সেই এম্বোই বলবে। এ বার তোরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নে তোরা ক'জন যাবি। এক সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—আমি যাব! আমি যাবি! সর্দার বলল—বেশ, তাই যাবি।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই আমাদের যাত্রার আয়োজন শেষ। সারি সারি ডোঙ্গা জলে ভাসান হল। তার প্রথমটিতে সর্দারের বউরা, এম্বো এবং তার দুই ভাই,—এবং বাছা

বাছা আর সাতাশ জন। পিছনে আরও নয়টি ডোঙা বোঝাই করে আমরা ওল্ড কালাবার বাকি মানুষেরা।

ক্যাপ্টেন নিজে এগিয়ে এসে আঙুল টিপে অভ্যর্থনা জানাল এম্বোকে। প্রথমে 'ইন্ডিয়ান কুইন'-এ আমাদের ভোজ হল। তারপর দেখতে দেখতে আমরা পাঁচ জাহাজে ছড়িয়ে পড়লাম। সর্বত্র অঢেল খাবার। অদ্ভুত অদ্ভুত সওদা,—অফুরন্ত হুইস্কি, রাম। আমরা খেয়েই চলেছি। কে কোন জাহাজে আছে কারও সেদিকে হুঁস নেই। আমি কেবল লক্ষ রাখছি এম্বো এই জাহাজে আছে কি না। সর্দার নিজে যখন আসেনি, তখন এম্বোই আমাদের সর্দার। তার সঙ্গে থাকলে শুধু যে সেরা জিনিস পাওয়া যাবে তাই নয়, আপদবিপদের সম্ভাবনাও কম। আমি এম্বোর পাশে দাঁড়িয়ে আরও একটা রাম-এর বোতল হাতে তুলে নিয়েছি। ওরা 'হুইস্কি' 'রাম' সবই লাইমজুস কিংবা চিনি আর জলের সঙ্গে মিশিয়ে খায়, আমরা ঢকঢক করে এমনিতেই গলায় ঢেলে দিই, ওরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ শূন্য বোতলটি রাখতে গিয়ে এ বার আমি নিজেই অবাক। ক্যাপ্টেন এম্বোর বুক নিশানা করে সেই আগুনে-নল উঁচিয়ে ধরেছে। আমাদের ওল্ড কালাবার লোকেদের প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ যম। তাদের কারও কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে পিস্তল। এ দৃশ্য আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। আমাদের লোকেরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, আমি কোনও দিক না ভেবে ক্যাপ্টেনের মাথা লক্ষ্য করে হাতের বোতলটা ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠল। বোতলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি বলেই গুলিটা এম্বোর গায়ে লাগল না, কিন্তু আমাদের সঙ্গী আর একটা মেয়ে গোড়াকাটা গাছের মতো উপুড় হয়ে ডেকের বুকে আছড়ে পড়ল। ভোজসভা চোখের নিমেষে রণক্ষেত্রে পরিণত হল। চারদিকে আর্তনাদ, হই হল্লা। গোলা ছুটছে, বর্শা ঝিলিক দিচ্ছে। আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ সবের জন্যে তৈরি ছিলাম না। তা ছাড়া খেয়ে খেয়ে আমরা ক্লান্ত। তবুও হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে ওল্ড কালাবার মেয়ে-মরদেরা লড়াই করে চলল। কেউ কেউ লাফিয়ে জলে পড়ল। কিন্তু বৃথাই। ওল্ড কালাবারের কপালে সেদিন দুর্ভাগ্যের কাহিনীই লেখা। কেন-না, চারদিকে আর্তনাদ শুনে বোঝা যাচ্ছে, শুধু আমাদের এই ডিউক অব ইয়র্কের ডেকেই নয়,—সব ক'টি জাহাজে একই ঘটনা ঘটছে। আমরা প্রতারিত হয়েছি, কোন অজ্ঞাত পাপে স্বেচ্ছায় মৃত্যুফাঁদে পা দিয়েছি। এ আমন্ত্রণ দস্যুদলের ষড়যন্ত্র মাত্র।

এই ষড়যন্ত্র আরও বীভৎস ঠেকল যখন দেখা গেল, এর পিছনে নিউ টাউনের লোকেরাও রয়েছে। যারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বর্শা ছুঁড়ে তারা তাদের চিরকালের মতো কালাবারের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আপনজনদের নৌকো দেখে যারা সাঁতরে ওদের নৌকোয় উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাদের বেঁধে ফেলেছে। তারপর নিরস্ত্র ওল্ড কালাবারের লড়াই বৃথা। আমরা তখনও যারা বেঁচে আছি, তারা হাত বাড়িয়ে মাটিতে

উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেনের লোকেরা এসে আমাদের হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। লড়াই থেমে গেছে। জাহাজে জাহাজে আর্তনাদ কমে এসেছে, শুধু দু'-একটি মেয়ে নিজের ছেলে অথবা স্বামীর নাম ধরে ডুকরে কাঁদছে। সে-কান্নায় অন্ধকার উপকূল থমথম করছে। জয়ধ্বনিতে তা ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ দুম দাম করে বিজয় গৌরবে ডিউক অব ইয়র্কের ডেক-এ এসে হাজির হল নিউ টাউনের সর্দার। ওরা তার নাম দিয়েছিল—উইলি অনেস্টি। সে বলল—ক্যাপ্টেন, আমার নজরানা দাও। ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কী যেন হিসেব করল, তারপর রুমাল, মদ, রুটি এবং কতকগুলো লোহার মুখোশ আনিয়ে তার সামনে রাখল। উইলি চিৎকার করে উঠল,—কিন্তু সাহেব আসল জিনিস কোথায়?

সাহেব বলল—সর্দার আসেনি। তার ভাইরা এসেছে। এম্বো এখানেই আছে। যদি চাও তবে তাকে দিতে পারি বটে।

উইলির তখন রক্তের নেশা ধরে গেছে। তার সর্বাঙ্গে রক্ত, বর্শায় রক্ত, সে চেঁচিয়ে উঠল, বেশ তাকেই দাও! আমরা তাকেই চাই!

ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এম্বো শেকল বাঁধা হাত দুটি বুকে রেখে কাঁদতে লাগল। সে বলল—সাহেব, তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করে এখানে এনেছ, ফাঁকি দিয়ে আমাদের লোকেদের বুনো শূয়রের মতো মেরেছ, নিউ টাউনের এই চিতাগুলোকে আমার অসহায় ভাইবোনদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছ; সাহেব দোহাই তোমার, এ বার তুমি থামো। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি আমাকে নিয়ে যাও, কিন্তু তবুও তুমি আমাকে এই রাক্ষসদের হাতে তুলে দিয়ো না। সাহেব, তোমার ঈশ্বরের কাছে নিজেকে দোষী কোরো না, তুমি আমাকে এ ভাবে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়ো না।

এম্বোর সেই আর্তনাদ শুনে আমার সহ্য হল না, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। একটি লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল। সামনে উদ্যত বর্শা হাতে আরও একটি লোক। ভয়ে আমার গলা থেমে গেল। ওরা এম্বোকে জোর করে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। এম্বো কিছুতেই যাবে না। সে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। হঠাৎ হাতের কাছে একটা রেলিং পেয়ে এম্বো সেটা আঁকড়ে ধরল। জোয়ান মানুষ। গায়ে ওর বরাবরই অসুরের মতো শক্তি। তার ওপর মৃত্যুভয়, সামনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। চারজন সাদা মানুষ টেনে ওর সেই বজ্রমুষ্টি আলগা করতে পারল না। বিরক্ত ক্যাপ্টেন রেলিংয়ের ওপর ওর মাথাটা চেপে ধরল, তারপর হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। কোমর থেকে তলোয়ারটা টেনে নিয়ে সে নিউ টাউনের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে এক ঘায়ে এম্বোর মাথাটা কালাবারের জলে ফেলে দিল। আমরা এ দৃশ্যের জন্যে তৈরি ছিলাম না। সম্ভবত নিউ টাউনের লোকেরাও না। আমি চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢাকলাম।

তারপর অবশ্য এক সময় চোখ খুলেছিলাম। কিন্তু তখন অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে এম্বো বা কালাবার কিছুই ছিল না। কালাবার তাল নারকেল, আমার বউ ছেলে মেয়ে সব সেই অন্ধকারে একাকার। দশ সপ্তাহ পরে আবার যখন দিনের আলোয় এসে দাঁড়ালাম তখন আমার সামনে নতুন দেশ, নতুন বন্দর। শুনেছিলাম—এ দেশের নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এবং আমি আমার সঙ্গের এই চব্বিশটি নারীপুরুষ, আমরা—ক্রীতদাস।

এটা প্রথা নয়। তোমরা কালাবারের মানুষেরা যেভাবে লুঠ হয়েছিলে সেটা রীতি নয়,—দস্যুতা। আমরা কঙ্গোর উপকূলের মানুষেরাও লুণ্ঠিত হয়েছি বটে তবে এ ভাবে নয়,—আখ কাটতে কাটতে কপালের ঘাম মুছে বলবে আর একজন। কপালে তার বান্দাছাপ তখনও স্পষ্ট। সেটিতে আঙুল ঠেকিয়ে মানুষটি বলবে—দেখছিস না, আমাকে যারা এনেছিল সে-সাহেবদের নাম অন্য। ওদের রীতিনীতিও ভিন্ন। ওরা নগদ কড়িতে ছাড়া কখনও মানুষ কিনবে না। ওরা দাস নয়, ক্রীতদাস চায়। হামলা করে মানুষ ধরে জাহাজে তোলা আর নগদ কড়ি ফেলে কেনা এক জিনিস নয়। ওরা ধার্মিক ছিলেন, বলতেন—জবরদস্তি করব কেন; আমরা কি ডাকাত! আফ্রিকায় ডাকাতেরা এসেছে তোদের আমলে, ১৭৫০ সনের পরে। তার আগে উত্তরে কেপ ভার্দে থেকে শুরু করে দক্ষিণে বেঙ্গুয়েলা বা কেপ সেন্ট মার্থা অবধি গোটা পশ্চিম উপকূলের মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস কর, সবাই এক কথা বলবে। গোরি, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া,—বিয়াফ্রা, বোন্নি, কালাবার, অ্যানামোবি, আম্‌ব্রিজ, কঙ্গো—সব এলাকায় তখন এক নিয়ম।

ওরা মানুষের সন্ধানে জাহাজ নিয়ে আসত। আমাদের সর্দারেরা ওদের অভিনন্দন জানাত। কেন-না লোকগুলো সত্যিই ভাল। ওরা তাদের মদ দিত, খাবার দিত, পোশাক দিত। বদলি হিসেবে সর্দার তাল খেজুরের রস, হাতির দাঁত, লোমের পোশাক দিত। সঙ্গে দিত নিজের তহবিল থেকে কিছু দাস-দাসী। অবশ্য দাস নাম ছিল না তাদের, কিন্তু আমাদের মধ্যেও সবল আর দুর্বল মর্যাদায় এক ছিল না। আমরা অন্য কোনও দলের সঙ্গে লড়াই করে যাদের ধরে আনতাম, সর্দার তাদের নিজের কাছে আটকে রাখত। অনেক সময় দলের লোকেরা নজরানা মিটিয়ে দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। অনেক সময় আমাদের হয়ে ওরা বছরের পর বছর খাটত। এ ছাড়াও অনেকে ঋণের কারণে দাস হত, অনেকে অধর্মের কারণে। কেউ হয়তো তোমার দেবতাকে অপমান করল, তাকে তুমি দাস করে রাখতে পারো। কারও বউ হয়তো স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে অন্য পুরুষে সোহাগ করে, স্বামী জানতে পারলে সেই মানুষটিকে ধরে এনে দাস করে রাখতে পারে। কিন্তু রীতি থাকলেও আমাদের পৃথিবীতে অনেক দাস ছিল না। বাইরের মানুষের চোখে সে জগত অন্ধকার ঠেকলেও আমাদের দুনিয়ায় ন্যায় ছিল, শান্তি ছিল। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মোটামুটি খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, পরনে কাপড় ছিল। সে-কাপড় হয়তো বাহারি ছিল না, কিন্তু আমরা তা পরেই আনন্দিত ছিলাম। আমাদের সে-আনন্দের চিহ্ন আমাদের এই দেহ।

দম্পতি। আফ্রিকার ভাস্কর্য। ওঁরাই একদিন ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী।

বিদ্রোহের অপরাধে শাস্তি হচ্ছে এক ক্রীতদাসীর।

আমরা আফ্রিকার উপকূলের মানুষেরা সেদিন আদিম অরণ্যের মতোই সুখী অস্তিত্ব।

সেই সুখের জগতে প্রথম চিন্তা-বিন্দু একটি পাল-খাটান জাহাজ, 'রেইন-বো'। রামধনুকের মতোই সুন্দর জাহাজ। ক্যাপ্টেনের নাম স্মিথ। ঠিকানা—বোস্টন। মাডিরা থেকে ফেরার পথে কী মনে করে তিনি গিনিতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বন্দরে তখন আরও জাহাজ আছে। কেন-না, আফ্রিকা আর অজ্ঞাত পৃথিবী নয়, শ্বেতাঙ্গরা বহুদিন এখানে আনাগোনা করছে। তা ছাড়া এখানকার বলিষ্ঠ মানুষগুলোর ওপর সভ্যতার নজর পড়েছে। সুদূর ১৪৪৪ সন থেকে আধুনিক দুনিয়া গোলামের সন্ধানে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম জাহাজখানা পাঠিয়েছিলেন পর্তুগালের উদ্যোগী সম্রাট, প্রিন্স হেনরি, দি নেভিগেটার! তারপর কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং আফ্রিকায় নতুন করে ইউরোপের অভিযান। ১৪৯৪ সনে কলম্বাস পাঁচশো রেডইন্ডিয়ানকে দাস করে উপহার পাঠিয়েছিলেন তাঁর রানিকে। বলেছিলেন—এগুলোর বদলে আমার দেশের মানুষ যদি এখানে শূয়র মোষ পাঠায় তবে উপনিবেশকারীরা উপকৃত হবে। ইসাবেলা কোমল হৃদয়া ছিলেন। তিনি সায় দিতে পারেননি। ক্যারেবিয়ানরা আবার ফেরত গিয়েছিল তাদের মাতৃভূমিতে। তখন মুশকিল আসান হয়ে আসরে আবির্ভূত হলেন চিয়াপার মাননীয় বিশপ। তিনি বললেন—রেডইন্ডিয়ানদের বাঁচাতে হলে একমাত্র সৎ উপায় আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ দাস সরবরাহ। শুরু হল পশ্চিমের দাস-অভিযান। ১৭০০ সনে এই গিনিতে বসেই স্পেন আর পর্তুগাল কোম্পানি খুলেছে। আমেরিকা এবং ক্যারেবিয়ানের দ্বীপগুলোতে তারা বছরে দশ হাজার টন দাস সরবরাহ করবে। ইংরেজরাও আছে। স্যর জন হকিন্স পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি এলিজাবেথকে প্রণাম করে জাহাজ নিয়ে জলে ভেসেছিলেন। সে ১৫৬২ সনের কথা। তার জাহাজের নাম ছিল—'জেসাস'। যিশু সেই থেকে আরও বিশেষভাবে আফ্রিকায় চেনা নাম।

হকিন্স যথাসময়ে তাঁর সাফল্যের বার্তা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। শুনে এলিজাবেথের মতো কঠিনহৃদয়া রানিও নাকি রুমালে চোখ ঢেকেছিলেন। তিনি বলে উঠেছিলেন—ইট উড বি ডিটেস্টেবল্। তা হলেও হকিন্সকে স্যর করতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ, ইংল্যান্ডের রানির পক্ষে অদেখা নারীদের শোকের কান্নার চেয়ে, সামনের পুঞ্জীভূত পাউন্ডের পাহাড়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ! রাজা দ্বিতীয় চার্লস আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এ-ব্যবসা রাজত্বের পক্ষে সমৃদ্ধিসূচক। সুতরাং, হে সাহসী নাবিকদল, জাহাজ ভাসাও!

নানা দেশের জাহাজ তখন আফ্রিকার উপকূলে। কিন্তু কোথায় দাস? সর্দারদের তহবিলে যা ছিল বহুদিন তা শেষ হয়ে গেছে। হওয়ারই কথা। কেন-না, ১৬৮০ থেকে ১৭০০ সন অবধি কুড়ি বছরে একমাত্র ইংরেজরাই কেড়ে নিয়ে গেছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষকে। তা ছাড়া খুচরো ব্যবসায়ীরাও আছে। এ সময়ে তারাও পেয়েছে কম করে এক লক্ষ ষাট হাজার। ক্যাপ্টেন স্মিথ-এর 'রেইন-বো' সে-আমলেরই অভিযাত্রী। সুতরাং ভাগ্য তার তত প্রসন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্যাপ্টেন অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। এতদূর এসে এ ভাবে খালি জাহাজ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না, যা হোক একটা কিছু করা দরকার। চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এত এত মানুষ, তা হলেও আমরা খালি হাতে ফিরে যাব কেন?

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। এক বৈঠকও লাগল না। এক সঙ্গে বসামাত্র মাথা খুলে গেল। স্মিথ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—হুর-রা! এই তো চাই। পরের দিন সকালেই জাহাজ থেকে একটি 'খুনি' নামান হল। খুনি মানে ছোট্ট একটি কামান। সেকালে তার এটাই ডাকনাম।

সঙ্গে কামান নিয়ে শ্বেতাঙ্গ দল কাছেই একটি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল। বন্দরের কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের কাণ্ড দেখে অবাক। তারা সভয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল—হঠাৎ হাসিখুশি মানুষগুলোর এমন মেজাজের কারণ কী। স্মিথ চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল—তা নিয়ে তোদের দরকার?—আমাদের যারা অপমান করে, তাদের আমরা উচিত শিক্ষা দেব বইকি!

সেদিন রবিবার। আমরা শুনেছি সাদা মানুষদের সেদিন ঈশ্বর ভজনার দিন,—প্রভুর দিন। তারই মধ্যে স্মিথ এবং তার বন্ধুরা কামান বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওরা একটি নিরীহ গাঁয়ের ওপর চড়াও হল। মিথ্যে ঝগড়ার কথা তুলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে, মানুষজন মেরে চারদিক ছারখার করে দিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল। জয়ের চিহ্ন হিসেবে বিজয়ীদের সঙ্গে এল ছ'টি কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ-তরুণী। স্মিথ নিজের ভাগে পেল দু'জনকে। তাই নিয়ে সে সগর্বে বোস্টনের পথে পাল তুলে পত পত করে ভেসে চলল।

স্মিথ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আমার মাতৃভূমির নতুন ইতিহাস। সে-ইতিহাস পরবর্তীকালের পৃথিবী অবশ্য শুনেছে; ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, মার্কিন কংগ্রেস অনেক লজ্জার কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করেছে। কিন্তু তারা শুধু বাইরের চাপ চাপ রক্তের ছাপগুলোই দেখেছে—সেই তরুণীটি, জুমখেতে চাষ করছিল যে বাপ-বেটা, তাদের কলজে দুমড়ে মুচড়ে যে-কান্নাটা গলা ঠেলে উঠতে উঠতে হঠাৎ চাবুকগুলো দেখে থেমে গিয়েছিল, শুকনো চোখের তলায় প্রতি মুহূর্তে যে ভিক্টোরিয়া হ্রদের মতো বিশাল জলাধারগুলো থই-থই করছিল, তার কথা জানত না। ডেকে সার করে দাঁড় করান প্রতিটি তরুণ-তরুণীর অন্তর সেদিন এক একটি নায়েগ্রা। তাদের ঘৃণা, আতঙ্ক, আর কান্না ছাড়া পেলে দুটো জাহাজ তো ছার, সভ্যতা ভেসে যায়।

স্মিথ সাহেবের পরে যারা এসেছিল, তাদের জাহাজে আলেকজান্ডার নামে ডাক্তার ছিলেন একজন। মেয়েটি তার নজরে পড়েছিল। কৌতূহলী ডাক্তার ব্যবসায়ের রীতি ভুলে ওর পালিশ করা আবলুশ কাঠের মতো কালো পিঠটায় সাদা হাতটা রেখে জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে এলি?

মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল—তোদের জালে পড়ে।

ডাক্তার বলেছিল—সেই জালের ঘটনাটাই তো শুনতে চাইছি আমি।

সে আবার শোনার কি? আমার এক শত্রু ছিল গাঁয়ে। আমি জানতাম—বন্ধু। সকালে বাড়ি এসে বলে গেল, সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি যাবি, ভোজ হবে। উঠোনে পা দিতে না দিতে দুটো মরদ আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে তোদের এখানে নিয়ে এল। আমার বাপ জানে না, আমি এখন কোথায়।

তোরা কী করে এলি? ডাক্তার সেই বুড়ো বাপ আর তার জোয়ান ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

—আমরা খেতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ ক'টা লোক আমাদের ধরে নিয়ে এল।

—আর তুই?

—আমি সওদা কিনে বন্দরে এসেছিলাম। আমার গাঁয়েরই একটা মানুষ বলল—সাহেব তোকে জাহাজে ডাকছে, বোধহয় সওদা কিনবে। আমি জাহাজে আসতেই সাহেব ওর হাতে দু'বোতল মদ দিল। আর আমার হাতে এই শেকল পরিয়ে দিল।

আফ্রিকা, অন্ধকারের মহাদেশ সেদিন হঠাৎ রাতারাতি আরও অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে যেন। আপন গাঁয়ের মানুষ নিজের মানুষকে এনে বেচে দিয়ে যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে বেচে দিচ্ছে,—মদের লোভে পুরোহিত তার শিষ্যকে। এ আফ্রিকা চিরকালের আফ্রিকা নয়। এ লোভ তার আত্মায় বরাবর ছিল না। বিন্দু বিন্দু করে এই বিষ উপকূলের শিরায় শিরায় প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্যাপ্টেনদের তীক্ষ্ণ চোখ দুর্বল দলপতিকে বেছে এনে ডেকে বসিয়ে রাজার মতো আপ্যায়িত করেছে, যাওয়ার সময় দুটো রেশমি রুমাল আর একটা গাদা বন্দুক হাতে তুলে দিয়ে বলেছে—আমরা বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ফল হিসেবে দেখা গেছে—দলপতি বন্দুক হাতে মানুষ শিকারে নেমেছে। পুরোহিত মিথ্যে অজুহাতে স্ত্রীকে স্বামীর থেকে কেড়ে আনছে। উদ্যোগী দালালেরা রূপসী তরুণীদের দিয়ে ফাঁদ পাতছে। মোহিনীর হাতে ছেলে-ধরিয়ে জাহাজের খোল বোঝাই করছে। বোন্নি, অ্যানামাবো, কালাবার—বন্দরে বন্দরে তখন রাতদিন কেনাবেচা চলেছে। আমি সেকালেরই গোলাম। চোরেরা যখন ডাকাত হয়েছে, ক্যাপ্টেনেরা যখন নিজের দালালদের নিয়ে বন্দুক হাতে ডাঙায় নেমেছে—তার আগের কালের। স্মিথদের আগে আমার জন্ম। আমাকে ধরেছিল যারা তারা নেকড়ে নয়,—শেয়াল!

আমিও শেয়ালের শিকার। আমাকে বেচেছিল যে, সে বুড়ো শেয়াল, ওই, ওই যে। মেয়েটি খেতের আর এক কোণে বসে বসে ঢেলা ভাঙছিল যে-মানুষটি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলল—উইলিয়াম সাহেব আদর করে নাম দিয়েছিল ওর জনসন। বেন জনসন। কত মেয়ের সর্বনাশ যে করেছে ও তার হিসেব নেই। হাটের পথে গাঁয়ে ফিরছি, জনসন আমাকে কাছে ডাকল। আমি পালিয়ে যেতে চাইতেই ও আমাকে ধরে ফেলল। কাছেই ঝোপের আড়ালে ওর লোকেরা লুকিয়ে ছিল। তারা এসে আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল। সে-রাত্তির হাটের একটা ঘরেই আমাকে আটকে রাখল। সোহাগ করে জনসন আমাকে খেতে দিয়েছিল। আমি খাইনি। বাপের জন্যে

কান্না আসছিল। গাঁয়ের সবাই জানে লেগুয়ার সঙ্গে আমার ভালবাসা, আমাদের বিয়ে হবে। মরদটা হয়তো আমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

সকাল হতেই জনসন বলল—চল, এ বার জাহাজে যাবি চল। আমি কিছুতেই যাব না। জনসন বলল—সাহেবরা রাতে কারবার করে না, নয়তো তোকে রাতে বিদেয় করে দিতে পারলেই ভাল ছিল! শুনে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মিছেই কান্না। জনসন টানতে টানতে আমাকে জাহাজঘাটায় এনে হাজির করল। সাহেব আমাকে হাতে শেকল পরিয়ে ওকে দু'বোতল মদ দিল। জনসন আমার দিকে তাকিয়ে দুই বগলে দুটি বোতল নিয়ে সাহেবদের মতো শিস দিতে দিতে জাহাজ থেকে নেমে গেল! আমি অবাক হয়ে ওর পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দু'বোতল মদের জন্যে মানুষ মানুষকে বেচে দিতে পারে, এই আমি প্রথম দেখলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই জাহাজে আবার হইচই। তাকিয়ে দেখি জনসন আবার আসছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য জনসন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যেন। জনসনের হাত দুটি পিছনের দিকে এক সঙ্গে বাঁধা। তার গলায় আলগা করে বাঁধা একটা দড়ি। কতকগুলো লোক ওকে টানতে টানতে একেবারে ক্যাপ্টেনের সামনে এনে ফেলেছে। আমার কলজেটা আনন্দে লাফাতে লাগল। আমি ডেকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যে-মানুষটি ওর গলার দড়িটা ধরে রেখেছে, সে লেগুয়া।—আমার লেগুয়া। আমি চিৎকার করে উঠলাম—লেগুয়া, এই যে আমি। হকচকিয়ে গিয়ে লেগুয়া পিছনে তাকাল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেল না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম—লেগুয়া, এই যে আমি! এ বার আর লেগুয়ার ভুল হল না। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে তার চোখ আমার চোখের ওপর পড়ল। কিন্তু লেগুয়ার তখন কথা বলার সময় নেই। বেন জনসন দড়ি টানছে, গলা ছেড়ে সে চেঁচাচ্ছে—ক্যাপ্টেন আমাকে চিনতে পারছ নিশ্চয়, আমি জনসন। মনে পড়ছে? আমি জনসন, কিছুক্ষণ আগেই যে আমি তোমাকে একটা চমৎকার মেয়ে দিয়ে গেলাম!—

ক্যাপ্টেন বলল—সব মনে পড়ছে। কিন্তু তা হলেও উপায় নেই বাছা, ওরা যখন তোমাকে ধরে এনেছে আমাকে কিনতেই হবে।—কী রে তোরা একে বেচতে চাস?

লেগুয়া বলল—তবে সারারাত দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ালাম কেন? সে কি ওকে মদ খাওয়াবার জন্য?—আমার মানুষকে যে শেয়ালের মতো চুরি করে এনে বেচেছে তাকে আমরাও বেচব বইকি। ওর সঙ্গের ছেলেগুলোও সায় দিল।—ক্যাপ্টেন তোমাকে কিনতেই হবে। জনসন চেঁচাতে লাগল—দোহাই ক্যাপ্টেন, বন্ধুর মান রাখো, তুমি আমাকে কিনতে চেয়ো না।

ক্যাপ্টেন বলল—তা কি করে হয়? আমি ব্যবসায়ী, আমাকে ব্যবসার রীতি রাখতেই হবে। লেগুয়া এই নাও তোমার হুইস্কি, এ বার তুমি যেতে পারো। জনসন, এই নাও শেকল, চটপট বাছা 'গালি'তে ঢুকে পড়ো।

লেগুয়া চলে যাচ্ছে। আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে না। বার বার পিছনে তাকাচ্ছে,—ওর চোখ ভরে জল আসছে। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, লেগুয়া থমকে দাঁড়াল, কাউকে না দেখতে পেয়ে হাওয়ায় বার দুই হাত নাড়ল, তারপর সিঁড়িতে পা দিল। আমি তখনও তাকিয়ে আছি। আর একটা সিঁড়ি নামলেই লেগুয়া আমার চোখ থেকে হারিয়ে যাবে। ওকে আর কোনওকালে দেখা যাবে না। লেগুয়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে কী যেন ভাবল, তারপর হাতের বোতল দুটো জলে ছুঁড়ে দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। আমি বলে উঠলাম—সাবাস মরদ! সাবাস! পাশের 'গালি' থেকে জনসন তখনও চেঁচামেচি করছে—সাহেব, এর কোনও অর্থ হয় না সাহেব!

জীবনে আমার সবচেয়ে বড় শান্তি বুড়ো-শেয়াল সেই থেকে আমার চোখের সামনেই আছে। আফ্রিকায় সেদিন সত্যিকারের বাণিজ্য ছিল। দিনের আলো না ফুটলে কেউ মানুষ কিনত না,—বদলি হিসেবে কিছু না দিয়ে কোনও ক্যাপ্টেন কাউকে 'গালি'তে ঠেলে দিত না। তস্করের হাটেও সেদিন নিয়ম ছিল। আর তা ছিল বলেই আমি ভাগ্যবতী। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা আমার, কিন্তু সব দুঃখ জুড়িয়ে যায়—যখন ওই বুড়ো শেয়ালটির দিকে তাকাই। জনসন আর আমি—বাঘ আর হরিণী। আমরা যে একই মনিবের ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী!

এই ইতিহাসের ইতিহাস আছে। একবার তা শোনা যাক।

নামহীন সেই যুদ্ধ জাহাজটির সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজও কেউ জানে না। শুধু এটুকুই জানা গেছে পাল-খাটানো সেই জাহাজের কাপ্তান ছিলেন একজন ডাচ। প্রিন্স অব অরেঞ্জ-এর ছাড়পাত্র ছিল তাঁর বর্ণাঢ্য কোটটির কোনও এক গোপন কোণে, আর জাহাজের খোলে ছিল কুড়িটি অদ্ভুত দর্শন প্রাণী। তারা মানুষেরই মতো, তবু যেন মানুষ নয়। কালো কষ্টিপাথরের মতো রং, পালিশ-করা পাথরের মতো মসৃণ, মাস্তুলের মতো মজবুত তাদের শরীর। শেকলে বাঁধা পাগুলো ক্লান্তিতে টলমল, ডেক থেকে কোনওমতে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে একদল কৌতূহলী দর্শক। বিচিত্র ভাষায় তারা কথা বলছে। অপরিচিত তাদের উল্লাসের ভঙ্গি। অজ্ঞাতলোকের আগন্তুকরা বিহ্বল, স্পষ্টতই ভয়ার্ত। কাপ্তেন জেমসটাউনের লোকেদের সঙ্গে বন্দিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন,—নিরাগস!—নিগ্রো। সেটা ১৬১১ সালের কথা। সুখ্যাত 'মে ফ্লাওয়ার'-এর তট স্পর্শ তার পরের বছরের ঘটনা।

অতলান্তিকের ওপারে 'নতুন পৃথিবী'তে কুড়িজনের এই দলটিই অবশ্য আফ্রিকার প্রথম রপ্তানি পণ্য নয়। ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার দিন থেকেই আফ্রিকা তার সহযাত্রী। শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বয়ে বেড়ানোর জন্যই যেন সেদিন পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়েছিল দুর্ভাগা মহাদেশ। আমেরিকায় প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটি কবে পা রেখেছিলেন তা বলা শক্ত। নিঃসন্দেহে সেখানে তে-রাত্তির পার হতে-না-হতে সাদার পিছনে ছায়ার মতো ফুটে উঠেছিল বিশালাকার কৃষ্ণাঙ্গ

মূর্তিগুলো। কেন-না, জ্ঞাত ইতিহাস বলে, বালবোয়া (Balboa) যখন প্রশান্ত মহাসাগর চিহ্নিত করেন তখনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিরিশজন নিগার, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। করটেজ (Cortez) যখন মেক্সিকো জয় করেন তখনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন আফ্রিকার দাস যোদ্ধার একটি দল। নিগ্রোরা পেরুতে পিজারো-র (Pizarro) সহযাত্রী, ইকুয়াডোরে তারা আলভারাডো-র (Alvarado) সঙ্গী। ব্রাজিলের হাটে সুদূর ১৫৩৮ সালেও চলেছে কালো গোলাম কেনা-বেচা।

১৭৯৮ সালে অতএব দেখা গেল মাথাগুনতিতে দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যা যদি সাকুল্যে সাড়ে বত্রিশ লক্ষ হয়, তবে তার মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ কমপক্ষে উনিশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার! এমনকী এ কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না যে, জনৈক ডাচ ব্যবসায়ীর উদ্যোগেই উত্তর আমেরিকায় প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ দাস আমদানি। সে-কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বরং লুকাস ভাসকুইজ ডি আইলন (Lucas Vasquez de Ayllon)। তিনিই জেমসটাউনের আদি প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ সালে তিনি যখন নতুন ঠিকানার সন্ধানে সেখানে নেমেছেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একশো ভাবী-গৃহস্থ, উননব্বুইটি ঘোড়া আর একশো নিগার। লুকাস তাদের সংগ্রহ করেছিলেন আফ্রিকা নয়, কাছাকাছি হাইতি থেকে। উত্তর আমেরিকায় তখন স্পেনের যে-সব তালুক সেখানেও সাদার সঙ্গে ছায়ার মতো রাশি রাশি কালো মানুষ। তবু দাস-ব্যবসায়ের দীর্ঘ এবং নির্মম ইতিকথায় সেই নামহীন জাহাজ আর হারিয়ে-যাওয়া নামের সেই ডাচ কাপ্তান বা ব্যবসায়ী চিরকাল বেঁচে থাকবেন, কারণ ইংরেজদের নয়াপত্তন যে আমেরিকার মাটিতে সেখানে তাঁর হাত ধরেই জাহাজ থেকে নেমেছিল খাস আফ্রিকার কুড়িজন সন্তান। শেকলে-বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গ দাস।

শুধু দাস-ব্যবসায়ে নতুন অধ্যায় নয়, সম্ভবত সেদিনই শুরু হয়েছিল আমেরিকার নতুন ইতিহাস। ক্যারোলিনার চাল, লুসিয়ানার আখ, ভার্জিনিয়ার তামাক, তুলোর পাহাড়, সব বৈভবের পিছনেই রয়েছে কালো হাত। কে জানতেন, একদিন দেশের সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, খেলার মাঠে, এমনকী দেশের রাজনীতিতেও কথা বলবে এই আগন্তুক দল। আজ যারা বন্য প্রাণীর মতো বোবা, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলা যাদের জীবনধারা, ওভারসিয়ারের চাবুকের ঘা পিঠে পড়লেও যারা আর্তনাদ করে না, শুধু গোঙায়, একদিন তারাও বাঙ্ময় হবে, তারাও একদিন বলবে নিজেদের কথা। লজ্জায় দু'হাতে চোখ ঢাকা ছাড়া সেদিন কোনও জবাব খুঁজে পাবে না এই গর্বিত সভ্যতা। সেদিক থেকে ভাবলে "সান্তামারিয়া"-র মতোই মার্কিন দেশের ইতিহাসে সেই তরীটি অতিশয় জরুরি ছিল। তার খোলে যে মধুকর তাতে আপাতত অমৃতের স্বাদ বটে, কিন্তু একদিন তা বিষভাণ্ড হয়ে উঠবে নিশ্চয়। সেদিন অবশ্য সেই সম্ভাবনার কথা কারও মাথায় উদিত হয়নি। ওই ডাচ জাহাজ যে দ্বিতীয় সংবাদটি বহন করে নিয়ে এসেছিল নতুন উপনিবেশ তাই জেনে আনন্দে আত্মহারা। কেন-না, জানা গেল দরিয়ার ও পারে রয়েছে বেওয়ারিশ এমন এক আশ্চর্য দুনিয়া যেখানে রয়েছে রাশি রাশি কালো মানুষ যাদের কাঁধে হাত রাখতে পারলেই পাকা মালিকানা!

ঔপনিবেশিকরা তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। বস্তুত উত্তর আমেরিকায় ইংরেজের উপনিবেশগুলোতে নিয়মিত দাস-ব্যবসার সেদিনই নাকি প্রকৃত সূচনা। আর, সেদিনই নাকি মার্কিন নৌ-বহরের শুভ উদ্বোধন। নতুন সওদাগরি জাহাজগুলিকে নিরাপদ বন্দরে ফিরিয়ে আনার জন্য কামান বন্দুক নিয়ে তাদের পিছু পিছু পাল খুলে দিয়ে অতলান্তিকের তরঙ্গে নেচে নেচে সঙ্গত করত যুদ্ধ-জাহাজগুলি। দেশ রক্ষা নয়, উপনিবেশের নিরাপত্তাও নয়, ওদের কাজ লুঠ করে আনা জাহাজবোঝাই কালো-মানিক পাহারা দেওয়া! পথে যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেই অমূল্যধন, তা-ই এই রণমূর্তি।—হায়, ক্ষাত্রধর্ম!

সুতরাং, দেখতে দেখতে আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল উজাড় হওয়ার দাখিল। একটা আস্ত মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ ভাবে একদিন ছাড়খার হয়ে যাবে, কেউ কি তা ভেবেছিলেন? কোনও দুর্ভিক্ষ নয়, অনাবৃষ্টি নয়, মহামারী নয়, এই মহাশ্মশান রচনা করেছে নিষ্ঠুর লোভাতুর শ্বেতাঙ্গের দল। বোম্বেটের মতো নিজেদের মাটি থেকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে লুঠ করে নিয়ে গেল তারা লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে! তারা অতঃপর দাস, স্বাভাবিক মানুষ নয়, ক্রীতদাস। তাদের শরীর-মনের উপর আর কোনও অধিকার নেই। সবই প্রভুর ইচ্ছা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এমনকী যৌনতা, কোনও কিছুতেই আর তাদের কোনও অধিকার নেই। কেন-না, খাট-পালঙ্ক, কোট-প্যান্টালুন, ঘটি-বাটির মতো সে সম্পত্তি। তার উপর মালিকের সর্বসত্ব প্রতিষ্ঠিত। হাতে তার গোলামের মৌরশি পাট্টা!

বলা হয়েছে পয়োকুম্ভ একদিন বিষকুম্ভে পরিণত হতে পারে সে-সম্ভাবনা তখন কারও মাথায় উঁকি দেয়নি। অবশ্য রাতারাতি কিছুই ঘটেনি। কিন্তু ক্রমে একদিন ঔপনিবেশিকরা জেনেছিল জাহাজ বোঝাই নতুন সম্পত্তির সঙ্গে তাঁরা বয়ে এনেছেন রাশি রাশি উদ্বেগও। দাস পলাতক হতে পারে। দাস খুনি হতে পারে। দাস বিদ্রোহী হতে পারে। দাস মশালের আগুনে প্রভুর কুঠি জ্বালিয়ে দিতে পারে। শুধু নিঃশব্দে শ্রমদান নয়, দাস রাত্রির ঘুমও কেড়ে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, ওদের নামে আসরে অবতীর্ণ হতে পারেন স্বদেশের বিবেকবান মানুষও। সংবেদনশীল লেখকরা ওদের নামে কলম ধরতে পারেন। অ্যাবলিসনিস্ট সোসাইটি, আব্রাহাম লিঙ্কন, গৃহযুদ্ধ, রি-কনস্ট্রাকশন, জিম ক্রো, সাদা-কালো দ্বন্দ্ব, মার্টিন লুথার কিং, স্যালকম এক্স, মোহম্মদ আলি, জেমস বল্ডুইন...। এবং আজকের নানা সামাজিক সমস্যা। কালো-মানুষ আজ আর নিগার বা নিগ্রো নন, তাঁরা আফ্রিকার-আমেরিকান। তাঁদের রকমারি দাবি। দাবির পর দাবি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে নব নব প্রতিবাদ। সবই সেই কলঙ্কময় ইতিহাসের প্রতিদান। আজকের আমেরিকার ঐশ্বর্য, শক্তি, প্রতিপত্তি, সমস্যা ও বিরক্তি সবকিছুর মূলে সেই ডাচ জাহাজ। তার লৌহ-নোঙরের জাদুস্পর্শেই বিশাল আমেরিকার অহল্যা-মাটি নিজেকে উন্মোচিত করেছিল, তেমনই আড়ালে সঞ্চয় করে তার লজ্জা।

পৃথিবীর একমাত্র মহাবলী আমেরিকা যত উদ্ধত, যত প্রতিস্পর্ধীই হোক না কেন,

দুনিয়ার মানুষ জানে তার ইতিহাস ক্লেদাক্ত। এই গর্বোদ্ধত মহাশক্তির হাত লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের রক্তে কলুষিত। আরবমুলুকের কোনও গন্ধসারের সাধ্য নেই সেই দুর্গন্ধ পুরোপুরি ধুয়ে ফেলতে পারে!

প্রশ্ন: যদি ইতিহাস অন্য রকম হত? যদি কোনও দিন কোনও ওলন্দাজ জাহাজ অদ্ভুত সেই পসরা নিয়ে আমেরিকার মাটিতে নোঙর না করত? যদি আফ্রিকা নামে পৃথিবীতে কোনও মহাদেশই না থাকত? কিংবা পর্তুগিজরা যদি কোনও দিন আফ্রিকার কালো মানুষগুলোকে খুঁজে বের না করতে পারত? অথবা আফ্রিকার মানুষেরা যদি ইউরোপিয়ানদের মতো সবাই শ্বেতবর্ণের মানুষ হত? কিংবা ধর্মবিশ্বাসেও সবাই হত খ্রিস্টান? তা হলে কি আমেরিকার এই আশ্চর্য সভ্যতার সাধনা বিফলে যেত? এই ঐশ্বর্য, এই গর্ব, সবই নিছক স্বপ্ন হয়েই থাকত?

এই বৃহৎ প্রশ্ন চিহ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর:—না। অন্তত আমেরিকার জীবন-কথা আফ্রিকার কালো মানুষের অপেক্ষায় ছিল না। নব-জীবনের অভিযাত্রা সেই এক কুড়ি কৃষ্ণাঙ্গের পদসঞ্চারের অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সেখানে।

মার্কসবাদ অনুসারে মানুষের ইতিহাস বিভক্ত পাঁচটি পর্বে। প্রথম—আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দ্বিতীয়—দাস-সমাজ, তৃতীয়—সামন্ততন্ত্র, চতুর্থ—ধনতন্ত্র এবং পঞ্চম—সমাজতন্ত্র। সর্বশেষ ব্যবস্থাটির পূর্ণ রূপায়ণ এখনও অদেখা। মার্কসবাদীরা বলেন, প্রথম পর্বটি বাদ দিলে অন্য সব পর্বেই উৎপাদন ছিল কম-বেশি দাস-নির্ভর। আর দাস-অধ্যায় হিসাবে যে-অধ্যায়টি বিশেষভাবে চিহ্নিত, সেখানে পূর্ব কি পশ্চিম পৃথিবীর সর্বত্র ছিল ক্রীতদাস কাহিনী। পূর্ব পৃথিবীতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, শাসককুল স্বভাবতই উৎপাদনে যাদের শ্রম আদায় করে নিতেন তাঁরা ছিলেন একধরনের দাস। রোমের মতো চাবুক মেরে শেকলে বেঁধে তাঁদের খনিতে কাজ করানো হত না বটে, কিন্তু মূলত সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর সঙ্গে প্রভুকুলের সম্পর্ক ছিল দাস আর মনিবের। ব্যাবিলনের 'মুসকেনু', চিনের 'কো', ভারতের 'শূদ্র', সকলের সম্পর্কেই এই শ্রেণী-সম্পর্ক সত্য বলা চলে। এই তত্ত্বে পণ্য হিসাবে মানুষ ও তার শ্রমই শেষ কথা, সেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ পরিচয় গৌণ। রোমানরা কি পরাজিত গ্রিকদের দাসে পরিণত করেনি? রোমের বাজারে কি ইংরেজ ছেলে-মেয়ে বিক্রি হয়নি?

সমাজ বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ ইতিহাসে যখন দাসদের পর্ব চলছে তখন হয়তো বর্ণ জাতি এ সবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য ছিল যাদের দাস করা হল তারা আপনজন না বাইরের মানুষ। যেহেতু উৎপাদনের ওই পর্বে যুদ্ধ ছিল দাস সংগ্রহের উৎস এবং যুদ্ধ হত নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর, সুতরাং পরাজিত দাসরা প্রায়শ ছিল—'অপর'। অন্যভাবে বললে বহিরাগত। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে এই ভেদরেখাটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মুছে যায়। সামন্ত প্রভুরা নিজেদের রাজ্যের মানুষকে ভূমিদাসে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি, প্রয়োজনে

তাদের কেনা-বেচাও করেছেন। প্রাচীন রোমান আইন অনুসারে কোনও কারণে যদি কোনও স্বাধীন-রোমান অপরাধী সাব্যস্ত হন, এবং দাসত্বে দণ্ডিত হন, তবে তাঁর মালিক তাঁকে বিদেশে বিক্রি করে দিতে পারেন। ইসলামে বলা হয়েছিল কোনও স্বাধীন মুসলমানের সন্তানকে দাস করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব কি সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী বলে না? সেই সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের দিনগুলো থেকে অভিযাত্রী মুসলিম সমর নায়করা যে কত দাস-দাসী নিয়ে এ দেশে পৌঁছেছেন এবং বিজয়ীরা এ দেশের মানুষকে শেকলে বেঁধে অন্য দেশে নিয়ে গিয়েছেন তার লেখাজোকা নেই। আগমন এবং গমন, এই দুই প্রবাহেই দাসবাহিনীর মানুষগুলো কিন্তু সবাই অ-মুসলিম ছিলেন না। তা ছাড়া ভারতে সুলতানি আমল থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত আফ্রিকা থেকেও রপ্তানি করা হয়েছে অসংখ্য দাস, তাদের মধ্যেও মুসলমানের অভাব ছিল না। আসল কথা,—প্রয়োজন। আসল কথা—সস্তায় শ্রম। প্রাচীন পৃথিবীতে এই শ্রমের যেমন চাহিদা ছিল, তেমনই ছিল সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রেরও শৈশব থেকে। প্রাচীন অ্যাথেন্সে নাকি এক সময় ক্রীতদাস ছিল চার লক্ষ! ১৮৬০ সালের একটি হিসাব বলছে, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে ক্রীতদাস আমদানি করা হয়েছিল বেশি সংখ্যায়, সেখানে ক্রীতদাসরা ছিল মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ!

গ্রিকরা গ্রিকদের দাস বানিয়েছে। যদিও আদিম রোমান আইনে বলা হয়েছিল 'দাসপ্রথা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচার' ('কনট্রারি টু নেচার'), তবু রোমানরা গ্রিকদের এবং তাদের সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলের মানুষদের বিনা প্রশ্নে দীর্ঘকাল ধরে দাসে পরিণত করেছে। মুসলমান শাসকরা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। খ্রিস্টানরা যেমন খ্রিস্টানদের দাসে পরিণত করেছেন, হিন্দুরা তেমনই হিন্দুদের, মুসলমানরা মুসলমানদের। প্রশ্ন যেখানে উৎপাদনের, প্রশ্ন যখন স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা, সেখানে জাতি বর্ণ ধর্ম নিয়ে ভাববার সময় কোথায়! সুতরাং, প্রাচীন দাসপ্রথার যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ কোথায়ও কোনও প্রশ্ন তোলেননি। বুদ্ধিদীপ্ত গ্রিস, বলদর্পী অথবা আইন অনুরাগী রোম, কোথায়ও এই 'প্রকৃতি বিরোধী' প্রথা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ভারত বা চিনেও মানুষের প্রতি মানুষের এই অমানবিক ব্যবহার নিয়ে কেউ বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন শোনা যায়নি। এমনকী খ্রিস্টধর্মও দাসপ্রথা সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হয়নি। কোনও বিবেকের দংশনের জন্য নয়, নৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য নয়, সমাজ পরিবর্তনের একটি বিশেষ পর্বে, অর্থাৎ মার্কস কথিত সামন্তযুগের সূচনায় ধীরে ধীরে এই প্রথা বনেদিয়ানা থেকে চ্যুত হয়।

বলা আবশ্যক তখনও কিন্তু তার অবলুপ্তি ঘটেনি,—শেকলে বাঁধা দাস জন্মান্তরে হয়তো ভূমিদাস, এই যা। অর্থাৎ, প্রথাটির কঠোরতা কমে কিছু রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা দরকার, খ্রিস্টধর্ম যখন ইউরোপের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তখনই, অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ দিকে, দেখা গেল খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলির উদ্যোগেই আবার ফিরে আসছে আগেকার সেই নগ্ন, বর্বর দাসপ্রথা। আমরা আপাতত সেই পর্বেই হাজির। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে মুদ্রারাক্ষস শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল, যাঁদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে

সর্বক্ষণ প্রভু যিশুর নাম। আর তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে পায়ে শেকল-বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং নারীর সারি। তারা আফ্রিকা থেকে কেড়ে আনা। ধর্মে এখনও তারা খ্রিস্টান নয়। আমাদের প্রশ্ন ছিল—পৃথিবীতে যদি কালো মানুষ না থাকত? কিংবা কালো মানুষরা যদি সবাই খ্রিস্টান হত, কী হত? আমেরিকার খেতখামার কি সব পতিত জমিতে পরিণত হত? আমরা এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম—না। কেন-না, আসরে কালো মানুষের আবির্ভাবের আগেই নতুন পৃথিবীতে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রীদের নবজীবনের সাধনা। সেই পটভূমিটিকে স্পষ্ট করার জন্যই প্রাসঙ্গিক এই আলোচনা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেল জাতিবিদ্বেষ নয়, বর্ণবিদ্বেষ নয়, ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়। মানুষ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল শুধু মুনাফার জন্য। আরও অর্থ, আরও সম্পদ, আরও সুখের জন্য। এ কালের একজন মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ বলেন, 'দাসপ্রথার মূলে জাতিবিদ্বেষ নয়, বরং জাতিবিদ্বেষ দাস প্রথারই ফল।' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাক্ষী খাস আমেরিকা। এই কুবেরের দেশের সমকালের ইতিহাসের বিবর্ণ পাতাগুলো আবার উলটানো যাক।

স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ হৃদয়হীন শাসক ছিলেন না। তাঁর মহিষী ইসাবেলাও ছিলেন যথেষ্ট কোমল হৃদয়। কলম্বাসকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—যে-দেশ খুঁজে পেয়েছ সে-দেশে স্থানীয় বাসিন্দা রেডইন্ডিয়ানদের প্রতি দুর্ব্যবহার কোরো না। তাদের ভালবেসো। কলম্বাস স্বভাবত দুর্বৃত্ত ছিলেন এমন কথা আমরা না-ই বললাম। তবে আর পাঁচজনের মতো তাঁরও একটি বিষয়ে দুর্বলতা ছিল, তিনি 'হলুদ-ধাতু' সুবর্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। 'স্বর্গে' এসে খালি হাতে ফেরার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। বেপরোয়া স্প্যানীয়রা মনে মনে প্রায় প্রত্যেকেই স্বর্ণসন্ধানী। সুতরাং কলম্বাসকে সোনা-কুড়াবার কাজে নিয়োগ করতে হল পরাজিত রেডইন্ডিয়ানদের। পৃথিবীর ওই খণ্ডে সেই হতভাগ্যরাই প্রথম দাস। স্বাধীন, শান্ত এবং স্বচ্ছন্দচারী ইন্ডিয়ানরা বিনা প্রতিবাদে এই জীবনকে মেনে নিতে রাজি হলেন না। ১৪৯৫ সালের কথা। হাইতিতে ওঁরা বিদ্রোহ করলেন। অদূরে 'ইসাবেলা'। মাত্র ক'মাস আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরিক্রমা করে সেখানে এসে তাঁবু ফেলেছেন কলম্বাস। নলখাগড়ার বর্শা হাতে হাজার হাজার রক্তবর্ণ ইন্ডিয়ান এগিয়ে এল তাঁর দিকে। উপনিবেশ রক্ষা করতে হলে এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। কলম্বাস নির্মম হাতে দমন করলেন বিদ্রোহীদের। নিরস্ত্র মানুষের সে এক লজ্জাকর অভিযান। ইউরোপীয় দর্শকদের কাছে অসহ্য সেই নৃশংস দৃশ্য। অন্তত একজন কোনওদিন ক্ষমা করতে পারেননি কলম্বাসের এই অপরাধ। তিনি কাসাস (Bartolome de Las Casas) নামে মেক্সিকোর একজন যাজক। হত্যাকাণ্ডের সময় হাইতিতে ছিলেন তিনি। ক'বছর পরে তাঁর মুখেই স্পেনের মানুষ শুনেছিলেন সেই বর্বরতার কাহিনী।

১৫১৭ সালের কথা। ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলা তখন আর সিংহাসনে নেই।

স্পেনের অধিপতি তখন পঞ্চম চার্লস। লা কাসাস রাজ-সমীপে প্রার্থনা জানালেন রেডইন্ডিয়ানদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। ওরা বড় অসহায়, বড়ই সরল। চার্লস দ্বিধাগ্রস্ত,—কিন্তু—। বিকল্পের কথাও আমি ভেবে রেখেছি সম্রাট, উত্তর দিয়েছিলেন বিবেকবান যাজক, রেডইন্ডিয়ানদের বদলে নিগারদের দিয়েও অনায়াসে কাজ করানো চলে। ওরা দুর্ধর্ষ, বলবান। শ্রমিক হিসাবে ওরা অতুলনীয়। পর্তুগিজরা বহুকাল ধরেই ওদের কাজে লাগাচ্ছে, আমরাই-বা পারব না কেন?—বছরে চার হাজার নিগ্রো আমদানির অনুমতি দিলেই সব সমস্যা মিটে যায় সম্রাট।

চার্লস নির্বোধ নরপতি ছিলেন না। যাজকের যুক্তিটি তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন,—তথাস্তু। রাজকীয় সনদ হাতে একজন পারিষদ পরদিনই নিগ্রোর সন্ধানে আফ্রিকা যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। আমেরিকায় দাসত্বের ইতিহাসে লালের বদলে এল কালো।

অবশ্য রাতভোরেই নয়। স্প্যানিশরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে যা করেছিল খাস আমেরিকায় ইংরেজ এবং ডাচরা প্রথমে সে-চেষ্টায়ই মেতে ছিলেন। রেডইন্ডিয়ানদের তাঁরা দাসে পরিণত করার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। নিউ ইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট আমেরিকার বিশ্বজয়ী শ্রেষ্ঠীকুলের কাছে রোমতুল্য। একদা ওই স্থানটিকে ঘিরে ছিল একটি উঁচু দেওয়ালের বেষ্টনি। ডাচরা সেটি তৈরি করেছিলেন যে-সব রেডইন্ডিয়ানদের বন্দি করে দাসে পরিণত করা হয়েছে তাদের সেখানে কড়া পাহারায় আটকে রাখার জন্য। তবু শেষ পর্যন্ত লালের বদলে কালোর দিকে ঝুঁকতে হল। কারণ, এই আজব পৃথিবীর আজব মানুষগুলো দাস হিসাবে নিতান্তই অযোগ্য, ডাঙায় তোলা মাছের মতো ওরা নিমেষে নেতিয়ে পড়ে। তারপর এক সময় সব শেষ।

অবশ্য অন্য ভাবেও ঔপনিবেশিকরা খতম করেছেন ওদের। হত্যা, আগুন, লুঠ, বলাৎকার, বিজয়ী আগন্তুকদের কাছে সেদিন কোনও অপরাধই অপরাধ নয়। ওদের জমি কেড়ে নিতে হবে, ওদের দেশ কেড়ে নিতে হবে। সুতরাং, মৃত্যুর মহোৎসব সেদিন আমেরিকার মাটিতে। সেই শূন্যতা পূরণ করতে হলেও মানুষ চাই। নতুন মানুষ। সুতরাং, চলো আফ্রিকা।

আফ্রিকার কালো মানুষের ভাগ্য যে সেদিন আমেরিকায় ইউরোপের নয়াপত্তনের সঙ্গে এ ভাবে শেকলে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল সে-কোনও বিশেষ মানুষের ষড়যন্ত্রের ফলে নয়, বিশেষ করে দুটি ফসলের জন্য। আরও স্পষ্ট করে বললে দুটি কৃষিপণ্যের জন্য। কলকারখানা যেমন ধন উৎপাদন করে ওই বিশেষ কালপর্বে কৃষিক্ষেত্রও তখন মাটিতে সোনা ফলায়। অর্থনীতির ভাষায় ওই সব ফসল 'ক্যাশ ক্রপ', বা নগদি ফসল। আমেরিকায় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগদি-ফসল আখ আর তুলো। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে ইংরেজ উপনিবেশগুলোতে এদের চাষ প্রসার লাভ করে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে। সেখানে তখন হাইতির মতো আখ-খেত নেই, ফলে মাটিতে চোখের জলের প্রয়োজন ছিল কম। তা ছাড়া, অতলান্তিকের ও পার থেকে মানুষ ধরে বয়ে

আনার সামর্থ্যই-বা কোথায়? তার চেয়েও বড় কথা বসুন্ধরার রসাস্বাদন আফ্রিকার অপেক্ষায় থেমে নেই, প্রয়োজনীয় ভৃত্যবহর ইউরোপ থেকেই আসছে।

অতএব আড়াল করার উপায় নেই, অতীতের মতো নবযুগের দাস-বাহিনীতেও শুধু লালের বদলে কালো নয়, সাদার হাতে সাদা শেকল পরাচ্ছে দেখা গিয়েছে সেই দৃশ্যও। দাস-কাহিনীতে সে-এক স্মরণীয় অধ্যায়। স্মরণীয়, কারণ এ কাহিনী সেই দূর অতীতের নয়, পৃথিবীতে যখন আলো কম, ধর্ম যখন আদিমতায় আচ্ছন্ন, আমরা আর ওরা, আপন অথবা বহিরাগত, এই ভেদরেখা যখন বলতে গেলে মানুষকে শত্রু আর মিত্র দুই শিবিরে ভাগ করে রেখেছিল, সে-পৃথিবী বহুদিন গত। সে-যুগ তখন প্রাগৈতিহাসিকের অন্তর্গত। আধুনিক পৃথিবীতে জাতি-রাষ্ট্র চিহ্নিত, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত, ধর্মীয় চেতনা অনেক পরিস্রুত এবং উন্নত, তারই মধ্যে মানুষ স্বদেশের, স্বগাত্রবর্ণের, স্ব-ভাষাভাষী মানুষকে যখন দাসে পরিণত করে তখন সে-ঘটনা স্মরণযোগ্য হয়ে উঠে বইকি! আফ্রিকা না থাকলে আমেরিকার এই আশ্চর্য জন্মান্তর সম্ভব হত কি না তার চূড়ান্ত উত্তর এই অধ্যায়েই নিহিত। সন্দেহ কী, কালো মানুষ না থাকলে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে হত সাদাকেই। কারণ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একদল প্রভু হলে, অন্য দল দাস, সে আর এমন কী কথা!

দাস-ব্যবসায়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর, সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা শতকের পর শতক জুড়ে কালো মানুষ কেনা-বেচা। এশিয়া আফ্রিকার পাঠকের কানে শ্বেতাঙ্গদের হৃদয়হীনতার তুলনা নেই। তাঁরা অনেকেই জানেন না—একই হৃদয়হীনতা দেখেছে সেদিন ইউরোপের উদ্যোগী শ্বেতাঙ্গের দরিদ্র এবং অসহায় প্রতিবেশীটি। সমান কান্না-মুখর তাঁদের কাহিনীও।

ব্রিটিশ বন্দর-এলাকায় সেদিন হামেশাই লোকেরা হারিয়ে যায়। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, কারও রেহাই নেই। থেকে থেকেই কেউ না কেউ উধাও।—কোথায় যায় ওরা? গরিব মা-বাবা ভেবে পান না কোন নিশির ডাকে ঘরছাড়া ওঁদের সন্তানেরা।—কোথায় গেল পাড়ার সেই জোয়ান ছেলেটি?—সেই কিশোরী মেয়েটি। উত্তরটা তৎকালেই জানা গিয়েছিল। জানা গিয়েছিল—শহর বন্দরের চারপাশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেপারির চরেরা। সাধাসিধে কিংবা দরিদ্রদের হাতের নাগালে পেলেই তারা তাদের টেনে নিয়ে আসে বন্দরে নোঙর করা জাহাজে। ঠাঁই ওদের জাহাজের খোলে। সাদা-বোঝাই সে-জাহাজ দরিয়া পার হয়ে এক সময় পৌঁছাবে নিউ ইংল্যান্ডের বন্দরে। সেখান থেকে চালান হয়ে যাবে খেত-খামারে। সভ্যতার জন্য শ্রমিক চাই। সস্তা শ্রম। কার গায়ের রং কী, সেটা কোনও বিবেচ্য নয়,—উপনিবেশকে মজবুত ভিতে দাঁড় করাতে হলে, তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করতে হলে শ্রমিক চাই। চাই গায় গতরে জন্তুর মতো খাটতে পারে এমন মজুর। প্রভুদের জন্য ছলে বলে কৌশলে, যে-কোনও পন্থায় যারা তাদের সংগ্রহ করত তাদের বলা হত 'স্পিরিটস', ভূত বা প্রেতাত্মা। মন্ত্রবলে মানুষকে আপন ঠিকানা থেকে উধাও করে অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা তাদের। খাস ইংল্যান্ডে

তখন সক্রিয় শত শত 'স্পিরিটস', ওরফে ছেলেধরা।

আফ্রিকার উপকূলের মতোই জমজমাটি গোলামের হাট তখন ব্রিটিশ বন্দরগুলোতে। ১৬১৭ সালে জনৈক উইলিয়াম থিমে নিজেই কবুল করেছিল সে এক বছরে একাই ৮৪০ জন শ্বেতাঙ্গ দাস চালান দিয়েছিল আমেরিকায়। ১৬৮৮ সালে এই সাদা-দাস বোঝাই করে তিন-তিনটি জাহাজ নাকি টেমস বেয়ে বদর বদর করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেছিল।

শুধু চুরি করে বা ফুসলে জাহাজে তুলে দেওয়া নয়, চাহিদা মেটাবার অন্য উপায়ও ছিল। দেশে স্থানীয় বিদ্রোহীরা আছে, আছে নানা ছুতোয় বন্দিরা। তদুপরি দণ্ডিত অপরাধীরা। তাদের বেচে দিলেই বা দোষ কী? বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হল না, আবার নগদও পাওয়া গেল,—এক সঙ্গে দুই পাখি করতলগত। যুদ্ধবন্দিরাও ছিল খাসা পণ্য। হোক না তাদের দেহচর্ম সাদা এবং ধর্মে তারাও খ্রিস্টান, তাতে কী আসে যায়। দুনিয়ায় রজত বা স্বর্ণমুদ্রার তুল্য আর কী আছে? সুতরাং, ডানবার-এর যুদ্ধে ১৬৫২ সালে যখন কিছু স্কটম্যান বন্দি হন, তখন তাদের মধ্য থেকে ২৭০ জনকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বোস্টনে।

১৬৮৫ সালে বিখ্যাত মনমাউথ বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমনের পর কয়েক হাজার বন্দিকে দাস হিসাবে চালান দেওয়া হয় আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ। শুধু তা-ই নয় রাজকীয় বয়স্যরাও পারিতোষিক হিসাবে চেয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ দাস। কেউ একশো জন, কেউ দেড়শো। জেফারসন নামে একজন বড়মানুষ চেয়েছিলেন তিনশো। তিনি বিষয়ী লোক, মানুষগুলোকে আমেরিকায় চালান দিয়ে নগদে ভাঙিয়ে নিয়েছিলেন। দাম পাওয়া গিয়েছিল ৪১২৫ পাউন্ড। জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বাবদ খরচ—১৫০০ পাউন্ড। খরচ বাদ দিলে বাকিটুকু সবই লাভ! অবশ্য রাজপ্রাপ্যও মেটাতে হয়েছে তাঁকে। হৃদয়হীনতায় আফ্রিকার অরণ্যচারী সর্দার সেদিন পৃথিবীতে মোটেই নিঃসঙ্গ নন, স্বয়ং ইংল্যান্ডের রাজাও তাঁর রাজ্যে গোলাম হিসাবে বিক্রীত প্রজার উপর মাথাপিছু শুল্ক ধার্য করেছেন তখন ৪০ শিলিং বা ২ পাউন্ড। আফ্রিকার অতি লোভী গোষ্ঠীপতিদের লজ্জা অতএব অহেতুক। মা বাবা 'কুয়েকা'-র (Quakar) খ্রিস্টান হয়েও বিশেষ খ্রিস্টতন্ত্রে বিশ্বাসী শুধু এই অপরাধে শ্বেতাঙ্গের হাত দিয়ে শ্বেতাঙ্গ সন্তান দূর বিদেশে দিব্যি বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রেতাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন। কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই।

এই সাদা-দাস বহর আমেরিকায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হত যে-পথে, বলা নিষ্প্রয়োজন, দরিয়ায় আফ্রিকার রক্ত-রেখার মতোই সেই পথটিও রক্তাক্ত। 'মিডল প্যাসেজ', এদের জীবনেও ছিল সমান দুর্বিষহ। কখনও কখনও শ্বেতাঙ্গ দাসের ভাগ্যে হয়তো ব্যবস্থাটি আরও মন্দ। কেন-না, কালো মানুষরা, তৎকালে ইউরোপিয়ানরা যাদের তাচ্ছিল্য করে বলতেন 'নিগ্রো', 'নিগার', শ্রমিক হিসাবে তারা অতিশয় মূল্যবান সম্পদ, তুলনায় নামমাত্র মূল্যে শ্বেতাঙ্গ দাস পণ্য হিসাবে তুচ্ছ। ১৬৩৯ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে একজন গভর্নরের পত্নী বলেছিলেন, পথে দেখে এলাম মাঝ

দরিয়ায় ওরা সাদা মানুষের প্রাণহীন দেহ জলে ছুড়ে দিচ্ছে। একই দৃশ্য দেখেছে আফ্রিকার পথে নাবিকরা শতকের পর শতক। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম একটাই—শবগুলো স্বজনের। যারা এ ভাবে লোভী মানুষের আরও মুনাফার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য দেশান্তরের পথে প্রাণ দিল তাদের গায়ের রং ছিল সাদা। দেড়শো শ্বেতাঙ্গ দাস নিয়ে যাত্রা করেছিল যে-জাহাজ, শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত বন্দরে সেটি পৌঁছেছিল হয়তো মাত্র কুড়িজনকে নিয়ে। ডাচ জাহাজে বয়ে আনা সেই কুড়ি কৃষ্ণাঙ্গের মতো অতএব স্মরণযোগ্য এদের উপাখ্যানও।

অষ্টাদশ শতকেও আমেরিকায় কালোর পাশাপাশি রাশি রাশি শ্বেতাঙ্গ দাস। একটি তথ্য থেকেই তাঁদের সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ সাল, এই পাঁচ বছরে একমাত্র নিউইয়র্ক বন্দরেই নাকি জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার শ্বেতাঙ্গ দাসের মৃতদেহ! নিউইয়র্ক আজ পবিত্র শহর বটে! কত না সুখ-স্মৃতি তার ইতিহাসে! ওয়াল স্ট্রিট। বন্দরের জলের নীচে কঙ্কালের পাহাড়। নিউইয়র্কের দৌলতের পিছনে, সন্দেহ কী, রয়েছে মজবুত ভিত।

এক জীবন, একই ভাগ্য। আমরা সাদা, তোমরা কালো, এই যা। দাসত্বের এই পর্বে সাদা আর কালোর মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমরা ভাই-ভাই। আমাদের প্রথম পরিচয়, আমরা দাস, ক্রীতদাস। কেউ কেউ সেদিন ধর্মের প্রশ্ন তুলেছিলেন। 'ধর্মহী' কৃষ্ণাঙ্গ আর খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গ—দুই শ্রেণীর প্রতি অভিন্ন আচরণ কি সঙ্গত? এই ছিল তাঁদের জিজ্ঞাসা। উত্তর দিয়েছিলাম আমরা সাদা আর কালো দাসরা নিজেরাই। তৎকালের মার্কিন কাগজগুলো নাড়াচাড়া করলেই নিশ্চয় আজকের পাঠকের নজরে পড়বে সেই বিজ্ঞাপনগুলো।

> "পালিয়েছে। রিচার্ড মলসন নামে একজন মুলাতো দাস এপ্রিল থেকে পলাতক। তার বয়স চল্লিশ। তার সঙ্গে এখজন শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসীও নিরুদ্দিষ্ট। নাম তার—মারি। হয়তো এখন ওরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে কোথায়ও লুকিয়ে আছে।...ইত্যাদি।" (১৭২০)

কিংবা

> "নিরুদ্দেশ। আইজাক ক্রমওয়েল নামে একজন নিগ্রো দাস নিরুদ্দিষ্ট। সেই সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গিনীও। তার নাম—গ্রিনে। ওদের ধরে দিতে পারলে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার...ইত্যাদি।" (১৭৪৯)

প্রভুর দৃষ্টিতে ন্যায় (আসলে অন্যায়) যেমন পক্ষপাতহীন, আমাদের দাসদের মনে তেমনই একাত্মবোধ। আমাদের কাছে সাদা আর কালোর মধ্যে গায়ের চামড়াটুকু ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই। সে-চামড়া যখন প্রভুকুলের চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত তখন আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব অন্যের যন্ত্রণাকে লঘু করে দেখা! আমরা অচিরেই জেনে গিয়েছিলাম নিয়তি যে-অন্ধকার প্রেতলোকে আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে সেখানে দুটি মাত্র পক্ষ, একদিকে প্রভু, অন্যদিকে আমরা দাসরা। প্রভুর যেমন সমদৃষ্টি, আমাদেরও তেমনই দৃষ্টির ঐক্য। আমাদের সামনে লোভী, হিংস্র,

মূর্তিমান শয়তান। আমরা তার লালসার শিকার। ওরা যদি আমাদের দুই দলে ভাগ করার চেষ্টাও করে, তা হলেও কোনওদিন সফল হত না।

গোলামেরা পরস্পরকে চিনতে ভুল করে না। তাই কৃষ্ণাঙ্গ দাস আর শ্বেতচর্মের দাসীর একসঙ্গে পলায়নে আসলে কোনও চমক নেই। এই সহমর্মিতা, এই হৃদয় দেওয়া-নেওয়াই তো স্বাভাবিক। অপর পক্ষ তা জানত। খেয়াল করলে দেখতে পাবে বোস্টনের কাগজে এমন বিজ্ঞাপনও সরাসরি ছাপা হয়েছে যেখানে কালো আর সাদা মানুষ একসঙ্গে বিক্রি হচ্ছে নিলামে। ১৭১৪ সালের একটি বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য: জনাকয়েক আইরিশ দাসী ও চার পাঁচটি নিগ্রো বালক নিলামে বিক্রি হবে। অনুসন্ধান করুন...ইত্যাদি।

বিক্রি হওয়ার পর আফ্রিকার সন্তানদের যে-ভাগ্য, আমরা ইউরোপীয় আগন্তুকদের তা-ই। সেই স্বেদ আর অশ্রুর উপাখ্যান নতুন করে কী আর শোনাব। ঘটনা এই, নিগ্রহ যখন চরমে পৌঁছাত, আমরা কখনও কখনও আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের মতোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতাম। ক্রোধে অন্ধ হয়ে মালিককে আমরা খুন করতাম। কখনও কখনও ধর্মহীন প্রভুপত্নীকে আমরা যে বলাৎকার না করেছি এমন কথা হলপ করে বলতে পারব না। তবে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ হিসাবে আমরা সাধারণত যা করতাম তা হচ্ছে কাজে ফাঁকি দেওয়া, সুযোগ পেলেই কাজের বদলে অকাজ করে ফেলা, মালিকের যাতে অপচয় বা ক্ষতি হয় এমন কিছু করা। এ ভাবেই শেষ দিনটির জন্য কাঁদতে কাঁদতে অপেক্ষা করা। নয়তো বেপরোয়া হয়ে একদিন সকলের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া। কখনও একা, কখনও সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে নিয়ে। আফ্রিকার ভাই বন্ধুদের এই ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষে একটা সমস্যা ছিল তাদের গাত্রবর্ণ। আমরা সাদা দাসদের বেলায় সে-সমস্যা ছিল না। যেখানে ভিড় বেশি তেমন কোনও জনপদে গিয়ে ঝাঁকের কইয়ের মতো ঝাঁকে মিশে গেলেই হল। সুতরাং উদ্বিগ্ন পাঠক, তোমরা ধরে নিতে পারো, ওই সব বিজ্ঞাপন প্রায়শ বিফলে গেছে, প্রভুরা আর কোনওদিন আমাদের হাতে ফিরে পাননি।

একদিন অবশ্য চিরকালের মতো ওঁদের হাত ফস্কে পালিয়ে ছিলাম আমরা। তার কৃতিত্ব যত না আমাদের, তার চেয়ে বেশি পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির। অভিজ্ঞতায় ওঁরা বুঝতে পারলেন সাদা দাসদের নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। পালিয়ে গেলে খুঁজে বের করা তার মধ্যে একটি হলেও একমাত্র সমস্যা নয়। প্রভু এবং ক্রীতদাসের গাত্রবর্ণ এক, ভাষা এক। তার চেয়েও বড় কথা বিদ্যাবুদ্ধিতেও প্রভু আর দাসের মধ্যে প্রায়শ কোনও পার্থক্য নেই। নসিব ভাল তা-ই একজন প্রভু, নসিব মন্দ তা-ই অন্য জন তাঁর দাস। বিপরীতও ঘটতে পারত অনায়াসে। এ ধরনের বান্দাকে বশে রাখা কঠিন। প্রভুর মনে অতএব অস্বস্তি। এ দিকে কালের হাওয়াও পালটাচ্ছে। পাদ্রিরা প্রশ্ন তুলছেন, খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানরাই দাস করে রাখেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

প্রশ্নটা আগেও ছিল। শাস্ত্র থেকে তার উত্তরও সংগ্রহ করা হয়েছিল। তুলো খেতের মালিক দুর্বল মুহূর্তে মনে মনে সেইসব শাস্ত্রবচন আউরে কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

হয়তো কিছুটা স্বস্তিও। মূল শাখা থেকে 'কোয়েকার'দের মতো যেসব খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈষৎ বিচ্ছিন্ন, কিংবা যারা সদ্য সদ্য ওই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে সেই অপরিপক্ক খ্রিস্টানদের দাস করার ব্যাপারে কেউ বড় একটা বিবেকের দংশন অনুভব করতেন না। শাস্ত্র তা থেকে রেহাই দিয়েছিল বিষয়ী খ্রিস্টানকে। কিন্তু নতুন কালে শোনা যাচ্ছে অন্য কথা, সম্পূর্ণ নতুন এবং অভাবিত এক ন্যায়,—কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গ এক বস্তু নয়, নিগ্রো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক প্রাণী! সে জাত-দাস, আত্মার মুক্তিতে তার কোনও অধিকার নেই (ওঁরা দয়া করে যে বলেননি নিগ্রোর মোটে আত্মা নেই, সেই তাদের ভাগ্য!) আর, আত্মার মুক্তি যার পক্ষে অনাবশ্যক, স্বাধীনতাতেই-বা কী তার প্রয়োজন? দাসত্বই তো তার বিধিলিপি।

খেতখামার বাগিচা প্রসারিত হচ্ছে, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে, সুতরাং ভার্জিনিয়ার তামাক খেতের মালিক আর মারিল্যান্ডের তুলো খেতের ফেঁপে ওঠা জোতদারের জন্য ধনতন্ত্রের সেবায়েতরা রচনা করেছেন অভিনব ন্যায়-শাস্ত্র; সাদা দাসদের মায়া বরং এ বার ছাড়ো, মন প্রাণ সমর্পণ করো কালো দাস সংগ্রহের চেষ্টায়। কেন-না, ওদের আত্মার মুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই। তার চেয়েও জরুরি খবর—তাদের কোনও অভিভাবক নেই। তারা শুধু লুঠে আনার অপেক্ষায়।

আমরা সাদার দল শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলাম। কেন-না, নতুন পৃথিবীর দিকে দিকে যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড চলেছে তা সামাল দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা সভয়ে তাকিয়ে দেখলাম শত শত ডিঙি জলে ভেসেছে। অঢেল নিগ্রো আসছে। নিয়মিত কালো মানুষের বন্যা যেন। একেবারে আড়ত থেকে, যাকে বলে খাস মোকামের দরে সংগ্রহ করা হচ্ছে ওদের। তার মানে, প্রায় বিনামূল্যে কেনা। সুতরাং, এমন দিনে ওঁরা কালো মানুষগুলোর দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। শ্বেতাঙ্গ গিন্নিকে প্রতিবেশিনী প্রশ্ন করেন,—দাসদের তোমরা ব্যাপটাইজ করে নিয়েছ কি? গর্বিত শ্বেতাঙ্গিনী ঝটিতি জবাব দেন,—'ইউ মাইট অ্যাজওয়েল ব্যাপটাইজ মাই ব্ল্যাক বিচ!' এক পুরুষ আগে এমন উত্তর কোনও প্রভুর জিহ্বাগ্রে ছিল না। তাঁকে একই উত্তর দিতে আমতা আমতা করতে হত। কিন্ত এখন মুখে আর কিছুই তাঁদের আটকায় না। কারণ, জ্ঞানীরা নতুন তত্ত্ব প্রচার করছেন তাঁদের তরফে,—নিগ্রো জাত দাস। আত্মার মুক্তিতে তার কোনও অধিকার নেই।

লাল মানুষেরা বিফল। ব্যর্থ সাদাদের দিয়ে কাজ হাসিল করার উদ্যোগও। অতঃপর একমাত্র ভরসা—কালো। নিগ্রো তাঁর হাতে শেষ মূলধন। তাকে হারালে সব স্বপ্ন, সব সাধ মাটি চাপা পড়ে থাকবে। এই অহল্যা মৃত্তিকায় সোনা ফলবে না। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুকুল তা-ই গুটি গুটি ফিরে এসেছে জাহাজঘাটায়। একদা কোনও এক ডাচ অভিযাত্রী যেখানে কুড়িটি দাস সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নতুন ভোরে দেখা গেল শেকল হাতে শত সহস্র মার্কিন ক্রেতা দাসবাহী জাহাজের অপেক্ষায়। মুষ্টিমেয় সাদায় আর আগ্রহ নেই তাঁদের। তারা হঠাৎ 'খ্রিস্টান' তকমা পেয়ে গেছে। তারা এ বার কৃষ্ণাঙ্গ দাস চান। এমন দাস যাদের কোনও চাপরাশ নেই।

3

TO BE SOLD & LET

BY PUBLIC AUCTION,

On MONDAY the 18th of MAY, 1829,

UNDER THE TREES.

FOR SALE,

THE THREE FOLLOWING

SLAVES,

VIZ.

HANNIBAL, about 30 Years old, an excellent House Servant, of Good Character.
WILLIAM, about 35 Years old, a Labourer.
NANCY, an excellent House Servant and Nurse.

The MEN Belonging to "LEECH'S" Estate, and the WOMAN to Mrs. D. SMIT

TO BE LET,

On the usual conditions of the Hirer finding them in Food, Clo[illegible] in[illegible] and Medical [illegible]ance,

THE FOLLOWING

MALE and FEMALE

SLAVES,

OF GOOD CHARACTERS,

ROBERT BAGLEY, about 20 Years old, a good House Servant.
WILLIAM BAGLEY, about 18 Years old, a Labourer.
JOHN ARMS, about 18 Years old.
JACK ANTONIA, about 40 Years old, a Labourer.
PHILIP, an Excellent Fisherman.
HARRY, about 27 Years old, a good House Servant.
LUCY, a Young Woman of good Character, used to House Work and the Nursery.
ELIZA, an Excellent Washerwoman.
CLARA, an Excellent Washerwoman.
FANNY, about 14 Years old, House Servant.
SARAH, about 14 Years old, House Servant.

Also for Sale, at Eleven o'Clock,

Fine Rice, Gram, Paddy, Books, Muslins, Needles, Pins, Ribbons, &c. &c.

AT ONE O'CLOCK, THAT CELEBRATED ENGLISH HORSE

BLUCHER,

JACKDAW NO. 12 THE SLAVE TRADE AND ITS ABOLITION

ADDISON PRINTER GOVERNMENT OFFICE.

PRINTED IN GREAT BRITAIN

"সেল"। মানুষ বিক্রির একটি পোস্টার।

জাহাজে তোলার আগে দাসদাসীদের পরানো হত এইসব গহনা।
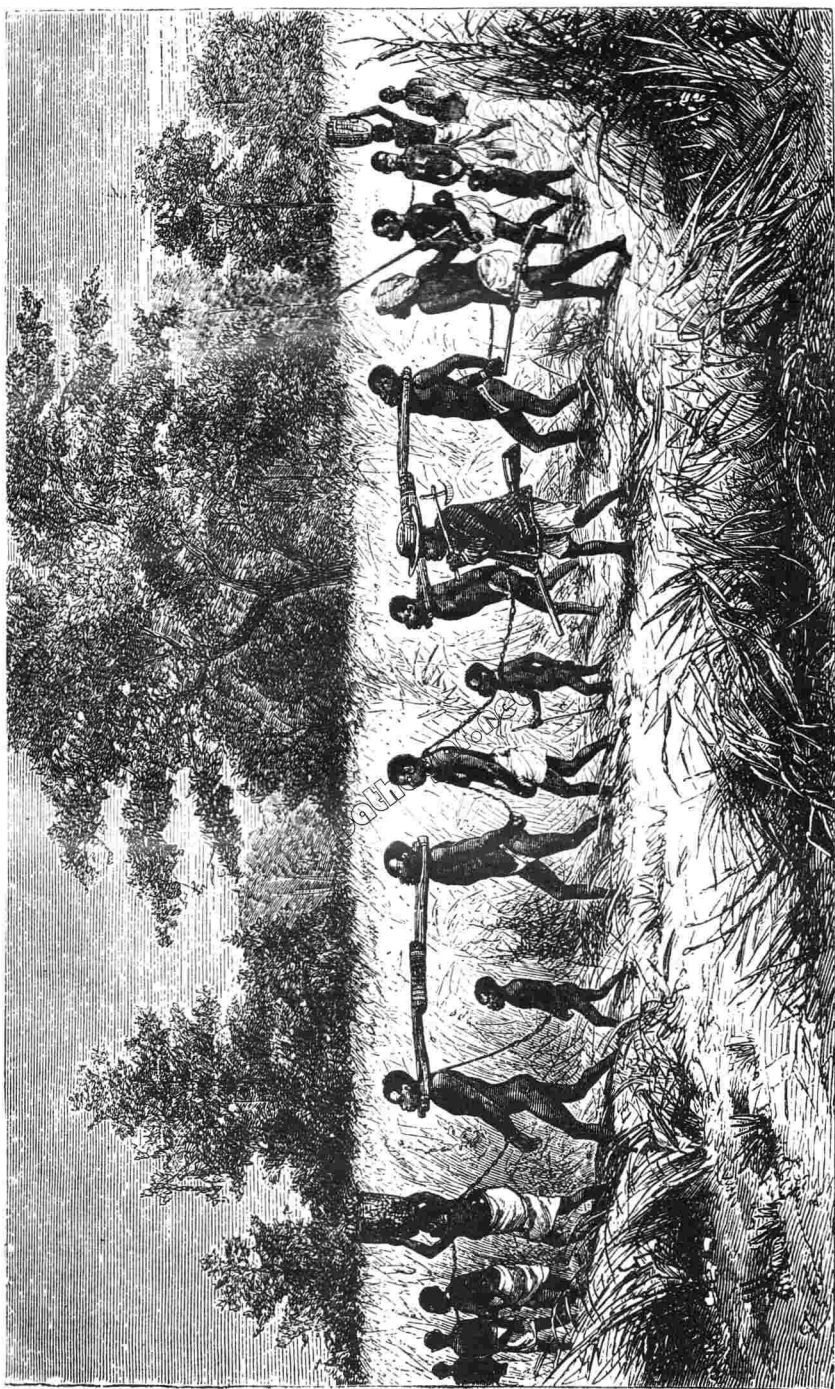
বন্দি কালো মানুষদের শিকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহাজঘাটায়।

Fig. 5

Fig. 1

Store Room

Store Room

নড়াচড়ার জায়গাটুকুও নেই। জাহাজের খোলে এভাবেই রাখা হত দাসদের।
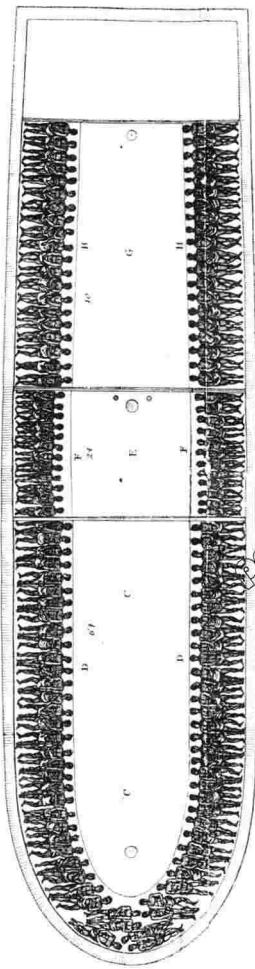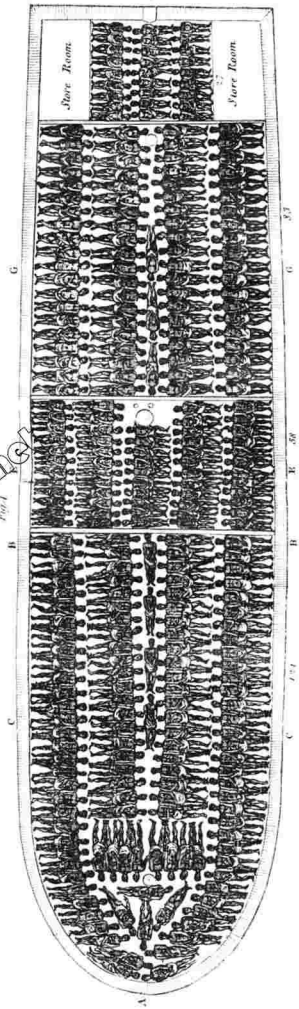
An Account of the Number of Negroes delivered in to the Islands of Barbadoes, Jamaica, *and* Antego, *from the Year* 1698 *to* 1708. *since the Trade was Opened, taken from the Accounts sent from the respective Governours of those Islands to the* Lords Commissioners of Trade, *whereby it appears the* African Trade *is encreas'd to four times more since its being laid Open, than it was under an Exclusive Company.*

Between what Years deliver'd.	N°. *of Negroes delivered into* Barbados.	*Number delivered into* Jamaica.	*Number delivered into* Antego.
Between the 8 *April*, 1698 To *April* 1699	3436		
To *April* 1700	3080		
To 5 ditto 1701	4311		
To 10 ditto 1702	9213		
To 31 *Mar.* 1703	4561		
To 5 *April* 1704	1876		
To 2d. ditto 1705	3319		
To 5 ditto 1706	1875		
To 12 *May* 1707	2720		
To 29 *April* 1708	1018		
Between 29 *Sept.* - - 1698 and 29 *Decemb.* 1698		1273	
Between 7 *April* - - 1699 and 28 *March* 1700		5766	
From 28 *Mar.* to 3 *Apr.* 1701		6068	
3 *Apr.* 1701. to 20 dit. 1702		8505	
20 dit. 1702 to 12 dit. 1703		2238	
12 dit. 1703 to 18 dit. 1704		2711	
18 dit. 1704 to 24 dit. 1705		3421	
24 dit. 1705 to 27 dit. 1706		5462	
27 dit. 1706 to 22 dit. 1707		2122	
22 dit. 1707 to 26 dit. 1708		6623	
To *June* 1708		187	
1698			18
June 1699			212
Between *June* - - 1700 and 24 *April* 1701			364
Between 24 *April* - 1701 and 30 *March* 1702			2395
To *April* 1703			1670
To *Nov.* 1704			1551
To 1705			269
To 1706			530
To 1707			114
	35409	44376	7123

Besides which there are 7 Separate Ships named in the foregoing List for *Antego*, but not the Number of Negroes, so we may well compute them at 1200 more, which arriv'd between 1699 and 1700.

হিসাবের খাতা থেকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সংবাদ।

. নিলাম চলছে। সাধারণ পণ্যের মতো বিক্রি হচ্ছে মানুষ।

কালো চামড়ায় টকটকে লাল লোহার দাস-চিহ্ন ছাপিয়ে দিলেই হল। মাঝখানে শতেক, দেড়শো বছর ধরে ওঁরা যে অন্য হাটে, শ্বেতাঙ্গ গোলামের বাজারেও আনাগোনা করেছেন, বেছে বেছে পছন্দ মতো সাদা চামড়ার দাস নিয়ে কুঠিতে ফিরেছেন, ইতিমধ্যে সে-সব কথা যেন তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন। আশ্চর্য সেই বিস্মৃতি।

আমাদের কালো ভাই আর বোনেরা, আমরা কিন্তু কোনও দিন ভুলতে পারব না সে-কাহিনী। কেন-না, আমরাই শুধু এই দুনিয়ায় একমাত্র সাদা দাস ছিলাম না। তোমাদের অনেক আগে থেকেই আমরা দাস। বস্তুত, এমনও হতে পারে হয়তো আমাদের দিয়েই এই ঘৃণ্য অমানবিক কারবারে তাঁদের হাতেখড়ি। তোমরা জানো, আমরা মানুষের এই অপমান, এই নিগ্রহ চিরকাল মুখ বুঁজে সহ্য করিনি। আমরা বিদ্রোহ করেছিলাম। তোমরা হয়তো স্পার্টাকাসের নাম শুনেছ। জন্মান্তরে, পূর্ব জন্মে আমাদেরই একজন ছিলেন স্পার্টাকাস। বিদ্রোহী স্পার্টাকাস কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। আর, তার লড়াই ছিল শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সব দাসের নামে।

যথা সময়ে, যথা স্থানে শোনা যাবে সেই অদমনীয় স্বাধীন আত্মার পুণ্য কাহিনী।

—তোমাদের পৃথিবীতে তবুও একদিন নিয়ম ছিল। আমার দুনিয়াতে তা ছিল না। যদি থাকত তা হলে সৈয়দের ঘরের মেয়ে আমি, আমাকে এই সুদূর লিসবনের শহরতলিতে রাতের পর রাত চোখ মুছতে হত না। কে আমি সে নাম শুনে লাভ নেই। দিয়াঙ্গার পাদ্রী ম্যানরিক সাহেবকে জিজ্ঞেস করো, সে আমাকে জানে। কী দুর্মতি হয়েছিল হার্মাদের পাদ্রী হঠাৎ করুণাময় হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো দোষটা আসমানের চাঁদের, হয়তো আমার এই রূপের। আজ বুঝতে পারছি, কর্ণফুলির জলে সেদিন ডুবে মরাই উচিত ছিল। নসিব মন্দ। তাই আমি আজ ঢাকার গাঁ থেকে সুদূর লিসবনের শহরতলিতে।

সে ১৬২৯ সনের কথা। আগের বছর বাদশাহ জাহাঙ্গীর বেহেস্তে গমন করেছেন। হিন্দুস্থানের তক্তে তখন তরুণ বাদশা শাজাহান। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ঢাকা শাসন করেন সুবাদার কাশিম খাঁ। কাশিম খাঁ খানদানি ঘরের সন্তান। তাঁর বাবা দিল্লিতে বাদশাদের অন্যতম প্রিয় অমাত্য। তা ছাড়া কাশিম খাঁর স্ত্রী ছিলেন নুরজাহানের বোন। আমি নুরজাহানের কেউ নই। আমার স্বামী ছিলেন মোগল বাহিনীর সেনাপতি। দুই হাজার ঘোড়া ছিল তাঁর অধীনে। আর ছিল একটি গোলাপ। স্বামী আমাকে তাই বলতেন। কাশিম খাঁ কবি ছিলেন। তিনিই নাকি কবে ঢাকায় আমাকে দেখে বন্ধুর কানে কানে নামটি শুনিয়েছিলেন।

সে-বার সেনাপতির অন্য এক রাজ্যে বদলি হওয়ার কথা। ঢাকায় তাঁর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। শহর থেকে মাত্র ক' মাইল দূরে তাঁর আপন বাড়ি। বাড়িতে বুড়ি মা আছেন। আমি স্থির করলাম, শহর ছাড়ার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ভাল। বুড়ো মানুষ, মনে শান্তি পাবে। সেদিনই বিকেলে পালকি

চড়ে আমি গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আর একটা পালকিতে আমার কিশোরী মেয়ে। স্বামী পনেরোজন ঘোড়সওয়ার দিলেন আমাদের সঙ্গে। সেটাই নিয়ম। আমরা যেখানেই যেতাম, বেহারা-বরকন্দাজ ছাড়া ঘোড়সওয়ারেরা সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

রাত্তিরে গাঁয়ে হইচই। একজন ছুটে এসে খবর দিল, গাঁয়ে হার্মাদ পড়েছে। আমি ভয়ে থর থর কাঁপতে লাগলাম। শাশুড়ি বললেন—গাড়ি বার করতে বলছি, এই বেলা রাতের অন্ধকারে সরে পড়াই ভাল। চোখের নিমেষে গাড়ি তৈরি হল। ঘোড়সওয়ারেরা তখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের ডেকে তোলা হল। দু'জন তৈরি হতে না হতে গোরুর গাড়ি আমাদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ির ভেতরে আমি, আমার শাশুড়ি আর মেয়ে।

কিন্তু নসিব মন্দ। হার্মাদের দল গাঁয়ের চার পাশ ঘিরে ফেলেছে। গাড়ি থামাতে হল। দু'জন ঘোড়-সওয়ার প্রাণপণ বাধা দিল। কিন্তু ওদের হাতে হাতে বন্দুক। আমাদের ঘোড়সওয়ার দু'জনের একজন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অন্যজন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ওরা আমাদের টানতে টানতে নৌকোয় নিয়ে তুলল। আমরা নৌকোয় পা দিতে না দিতে নৌকো পুব মুখে ছুটতে লাগল। অদ্ভুত নৌকো। তার চলন না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

নৌকোয় উঠে আমি কাঁদি, আমার মেয়ে কাঁদে, শাশুড়ি কাঁদে। ওরা খিলখিল করে হাসে। জীবনে এমন বীভৎস রাত আমি স্বপ্নেও কোনও দিন কল্পনা করিনি। চাঁদের আলোয় সার সার নৌকো জল কেটে চলেছে। ছইয়ের ওপরে বন্দুক কাঁধে হার্মাদের পাহারা দিচ্ছে। নীচে প্রতিটি নৌকোর খোলে মানুষ কাঁদছে। মরদেরা কাঁদছে, মেয়েরা কাঁদছে, শিশুরা কাঁদছে। পিছনে বাংলাদেশের তটভূমি ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমি চোখের জল মুছে শক্ত হয়ে বসলাম। নসিবে যা লেখা আছে, সে তো আর খন্ডানো যাবে না। তার আগে ওদের সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। সামনেই বন্দুক কাঁধে যে ছোকরাটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাকে বললাম—তোমাদের সর্দার কে, তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।

ছেলেটা প্রথমে এমন ভাব দেখাল যেন, আমার কথাটা শুনতেই পায়নি। সে কী একটা গালাগালি করে, পাটাতনে গটমট করে হাঁটতে লাগল। আমি বললাম—সে দস্যু যেই হোক, তাকে বলো বাদশার সেনাপতি অমুক খাঁ-র মা আর জেনানা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ছেলেটার এ বার বোধহয় হুঁস হল। সে থমকে দাঁড়াল। আমি আবার আগে যা বলেছিলাম তাই বললাম। সে মুখে হাত রেখে চেঁচিয়ে কী যেন বলল। তারপর কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমি ওড়নাটা আরও নীচের দিকে টেনে দিলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই কে যেন হঠাৎ নৌকোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। সুন্দর একটা পানসি পাশে এসে ভিড়ল। আমি দেখলাম, একটি জোয়ান ফিরিঙ্গি আমাদের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন কথাবার্তা বলছে। পোশাক এবং রকমসকম দেখে মনে হল, এই লোকটাই এই হার্মাদ দলের কাপ্তান।

কাপ্তান আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানিতে বলল— আমি ক্যাপ্টেন ডিগো ডাসা। এই নৌকোগুলো আমারই। তোমরা মোগল সেনাপতির ঘরের লোক যারা, তারা বেরিয়ে এসো।

আমরা বেরিয়ে এলাম। কাপ্তান ঘাড় হেঁট করে আমাদের সম্মান জানাল। তারপর বলল—আরাকানরাজ থিরি-থু-ধাম্মা ছাড়া আমি কোনও রাজা বাদশা মানি না। আমি গোয়া বা লিসবন কারও তোয়াক্কা রাখি না। দিয়াঙ্গায় আমাদের নিজস্ব ফৌজ আছে। ইচ্ছে করলে সেই 'মারুক-উ' তামাম হিন্দুস্থানের সঙ্গে লড়তে পারে। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। সাচ্চা ঘরানার জিনিস যখন হাতে পেয়েছি, আমি তখন আর পিছু হটছি না। তবে তোমাদের যাতে কষ্ট না হয়, পথে বেইজ্জতি না হয়, ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি তা অবশ্যই দেখব।

ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আমরা ভয়ে ভয়ে মাঝ নদীতেই নৌকো বদল করলাম। এই নৌকোটা সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত বড় বটে, কিন্তু এখানেও সেই কান্না। খোল বোঝাই মানুষ গলা ছেড়ে কাঁদছে।

কাপ্তান অবশ্য চেষ্টার কসুর করেনি। কিন্তু তিনদিন তিন রাত্তির আমরা তবুও কিছুই খেলাম না। স্বামীর কথা মনে পড়ছে, ঢাকার কথা মনে পড়ছে। তার চেয়েও ভয় লাগছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ওরা দিয়াঙ্গা পৌঁছাবার আগে মোগল নৌ-বহর কী ওদের ধরতে পারবে না?—আমরা কি আর কোনওদিন ঘরে ফিরতে পারব না?

সেদিন ভোরে হঠাৎ দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শুনে তন্দ্রা ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসে পড়লাম। চারদিকে বাদ্যি বাজছে—গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবে কি আমাদের বাহিনী হার্মাদদের ঘিরে ফেলেছে? বাইরে উঁকি দেওয়া মাত্র আমার ভুল ভেঙে গেল। ভোর হয়েছে। পুব আকাশে সূর্য উঠছে। সামনে অস্পষ্ট একটি শহর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মঠ আর গির্জার মিনারগুলো আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় মোগল নৌ-বহর? এ নিশ্চয় দিয়াঙ্গা, হার্মাদদের শহর।

আমার অনুমান ভুল হল না। একটু পরই ডিগো ডাসা এসে উঁকি দিল। তোমরা বেরিয়ে এসো, আমরা আরাকানরাজের শহর দিয়াঙ্গা পৌঁছে গেছি।

আমরা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলাম। এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলতে পারব না। প্রতিটি নৌকোর পাটাতনে একের পিছনে এক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার নারী-পুরুষ, আমার শ্বশুরের দেশের মানুষ। কি নারী, কি পুরুষ, তাদের সর্বাঙ্গে কারও একফালি কাপড় নেই। তা ছাড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—বেচারাদের কারও পেটে ক'দিনে এক মুঠি খাবারও পড়েনি। মায়ের শুকনো বুকে বাদুড়ের মতো শিশু ঝুলে আছে। হতভাগিনী জননী সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছে। জোয়ান মানুষগুলো হঠাৎ যেন প্রেতলোকের বাসিন্দা। তাদের শরীরের কাঠের মজবুত কাঠামোটা ছাড়া আর কিছু নেই। প্রত্যেকের বাঁ হাতটা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। যেন কোনও রোগে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে

পড়ল—ওদের প্রত্যেকের বাঁ হাতটি একটা কীসে যেন অন্যদের হাতের সঙ্গে বাঁধা। তাকিয়ে দেখলাম—বস্তুটি বেত। হাতের চেটো ফুটো করে তাই দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছে। হার্মাদ লোহার খরচ বাঁচিয়েছে!

তোমরা সাহিব-উদ্দীন-তালিশের লেখায় এ কাহিনী নিশ্চয় পড়েছ। তালিশ এই বেতের কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন—ওরা আসে, হিন্দু মুসলমান যাদেরই সামনে পায়, ধরে নিয়ে হাতের চেটোতে বেত ফুটিয়ে এক সঙ্গে বাঁধে, তারপর নৌকোর খোলে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রতিদিন সকালে ওরা পাটাতনের ওপর থেকেই ভেতরে ক'মুষ্টি শুকনো চাল ছিটিয়ে দেয়, ঠিক যেমন আমরা মুরগীদের খাওয়াই। ....কত ভদ্রঘরের সন্তান যে ওরা এ ভাবে ধরে নিয়ে গেছে তার হিসেব নেই। কত ভদ্রকন্যা যে ওদের হাতে পড়ে নিগ্রহের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে—সে কাহিনী কেউ জানে না। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীর দু'ধারের গ্রামগুলো আজ ওদের দৌরাত্ম্যে জনশূন্য। সর্বত্র হাহাকার।...... বাংলার জেলে-মাঝিরা আজ ওদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত। একশো নৌকোও যদি এক সঙ্গে থাকে, তা হলেও হার্মাদদের চারটি নৌকো দেখলে তারা তৎক্ষণাৎ পালাবে।

কেন ওরা পালাতে চাইত, তার কারণ সশরীরী হয়ে আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না। ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অসহায় নরনারী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে হাতে ক্ষত। তারই মধ্যে বিজয়বাদ্য বাজছে, নিশান উড়ছে, ডিগো-ডাসার পল্টনেরা রং-বেরঙের পোশাক পরে নাচছে,—সমবেত জনতাকে লুঠের মাল দেখাচ্ছে। এ বার ওরা আরও গর্বিত। কারণ, এ বার ওরা যেখান থেকে সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এল সে মোগলদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ঢাকা। ডাসা সগর্বে ঘোষণা করল, জায়গাটা ঢাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল। তা ছাড়া খাস ঢাকা শহরে পা না দিলেও আরাকানের জন্যে সে ঢাকার সেরা ঘরের জিনিস নিয়ে এসেছে—সেটাই কি কম গৌরবের? ডাসা বক্তৃতা করতে করতেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর নাটকের কায়দায় হঠাৎ আমার মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বলল—এই সেই জেনানা! উল্লাসে ডাঙার দর্শকেরা জয়ধ্বনি করে উঠল! পল্টনের একটা ছোকরা দুম দুম করে আকাশ লক্ষ্য করে দুটি গুলি ছুঁড়ল।

তারপর আমার শাশুড়িকে দেখান হল। এবং তারপর আমার মেয়েকে। আমরা তিনজনেই কাঁদতে লাগলাম। শত শত লোক আমাদের দেখছে। হাসছে, টিটকারি দিচ্ছে। হারেমের মেয়ে আমরা। এ দৃশ্য আমাদের স্বপ্নের অতীত। মনে মনে বলতে লাগলাম—হা ঈশ্বর, চার চেয়ে আমাদের মাথায় বাজ ফেলো!

ঈশ্বর যেন কথা শুনলেন। জনতার ভিড় থেকে একজন ফিরিঙ্গি এগিয়ে এল। ডাসার সঙ্গে করমর্দন করে সে যেন কী বলল। তারপর আমাকে অভিবাদন করে বলল—তোমরা কষ্ট পাচ্ছো দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যদি তোমাদের অমত না থাকে, তবে তোমরা আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারো। ডাসার মত আছে, আশা করি তোমরাও অমত করবে না।

অমত করার আর প্রশ্ন উঠে না। এখানে এই হাটে দাঁড়িয়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে সেটা তবুও মন্দের ভাল। অন্তত লোকটার কথা যদি মিথ্যে না হয়, তবে চারটে দেওয়ালের আবরণ পাওয়া যাবে নিশ্চয়। মানুষ, এমনকী আমাদের মতো পতিতের পক্ষেও সেটা কম নয়। আমরা ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু নৌকো থেকে নেমে এলাম।

বাড়িটা ভাল। বাড়ির মালিক যে ফিরিঙ্গিটি তাকেও মন্দ বলে মনে হল না। সে আমাদের অভিবাদন করে একটা ঘরে বসতে দিল। তারপর বলল—আপাতত এইটেই তোমাদের ঘর। এখানটায়ই তোমরা থাকবে। চাকর এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার দিয়ে যাবে। আমার শাশুড়ি আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন—সাহেব তুমি দয়ালু, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমরা তোমার ঘরে খেতে পারব না। আমরা সৈয়দের ঘরের মেয়ে—ফিরিঙ্গির ঘরে আমরা খাই কী করে।

সাহেব কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বলল—বেশ, আমি তোমাদের ওপর জবরদস্তি করব না। ফলমূল পাঠিয়ে দিচ্ছি, এ বেলা তাই খাও। রাত্রে না হয় নিজেরা আপন হাতে কিছু পাকিয়ে খাবে। সাহেব এই বলে তার কাজে চলে গেল। যে কাপ্তান আমাদের নিয়ে এসেছিল, সেও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল—কোনও ভয় নেই তোমাদের, আমিও কাছেই থাকি।

রাত্তিরে সাহেব চাল ডাল পাঠিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কে তা রান্না করবে! জীবনে কোনওদিন হেঁসেলে পা দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া কপালের ফেরে বাড়িঘর ছেড়ে মগের মুল্লুকে এসে পড়েছি,—যখনই কথাটা ভাবি, তখনই চোখ ছাপিয়ে জল আসে,—খাওয়ার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না! শাশুড়ি এক কোণে মড়ার মতো পড়ে আছেন, মেয়েটার জ্বর এসেছে,—অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি ঢাকার কথা ভাবছি। কাশিম খাঁ-র কথা, আমার স্বামীর কথা, অন্যদের কথা। ভাবতে ভাবতে আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে সকালের সেই ক্যাপ্টেন। তার চোখ দুটি লাল, শরীরটা টলছে। ক্যাপ্টেন হাতছানি দিয়ে ইশারায় আমাকে কাছে ডাকল। আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর নিঃশব্দে উঠে বসলাম। এখানে মেয়ে আর শাশুড়ির সামনে মান সম্ভ্রম বিসর্জন দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। ইজ্জত যদি দিতেই হয়,—তা হলে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

ধীরে ধীরে আমি ক্যাপ্টেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ইঙ্গিতে বললাম—চুপ, দেখছ না ঘরে দু'জন মানুষ রয়েছে! ওর যেন হুঁস হল। আমাকে হাতে ধরে টানতে টানতে সে পাশের ঘরে ঢুকল।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সে ঘটনা জানে সে-বাড়ির মালিক, আর দিয়াঙ্গা গির্জার পাদ্রি ম্যানরিক। আমার শুধু মনে আছে, শয়তানকে নাগালে পেয়ে আমি দাঁতে ওর জিভটা কেটে নিয়েছিলাম, এবং একটা আর্তনাদ করে দস্যু আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। গোটা ঘর রক্তে ভেসে গিয়েছিল। বাড়ির মালিক ছুটে এসেছিল, আমার শাশুড়ি, মেয়ে—যে যেখানে ছিল সবাই আমাকে ঘিরে

দাঁড়িয়েছিল। ফিরিঙ্গি মালিক আমার সেই রণরঙ্গিনী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কী বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল, তার চাকরদের ডেকে হুকুম দিয়েছিল—এই জেনানা দেখতে পরি হলেও আসলে সে খুনি। ওর হাত-পা বেঁধে এক্ষুনি ওকে কর্ণফুলির জলে ফেলে দিয়ে আয়। মেয়েটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি চাকরদের বাঁধবার সুবিধের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিলাম—কাঁদিস না মা, আজ মরতে পারলে জানবি তোর মা বেহেস্তে গেল। এবং গেল তার ইজ্জত এক ফোঁটা না খুইয়ে।

দু'জন ভৃত্য আমাকে নিয়ে নদীর দিকে বেরিয়ে পড়ল। আর একজন ছুটল গির্জার দিকে। কেন-না, ক্যাপ্টেনের লালসা তখনও রক্ত হয়ে জিভ থেকে ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে, রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। শয়তান বোধহয় বাঁচবে না। মরবার আগে তাকে দুটো ধর্মকথা শোনান দরকার। পাদ্রি ছাড়া এ তল্লাটে আর কারও সে ক্ষমতা নেই।

ওরা আমাকে নিয়ে কর্ণফুলির চড়ায় এসে যখন কী করে ডোবান যায় ভাবছে, তখন দেখা গেল নদীর ধার দিয়ে হনহন করে একটি মানুষ এই দিকেই আসছে। লোকটি কাছাকাছি হতেই—চাকর দুটি ধীরে ধীরে সরে পড়ল। বোধহয় মাঝরাত্তিরে নদীর ঘাটে তৃতীয় মানুষকে দেখে মনে মনে ভূত দেখছে বলে ভয় পেল। লোকটি কী মনে করে সত্যি সত্যিই আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখলাম—মানুষটি সেই যাজক। সকালেও নদীর ঘাটে তাকে আমি দেখেছি। অভুক্ত উলঙ্গ মানুষগুলোকে সে অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের ধর্মের কথা বোঝাচ্ছিল। বলছিল—এই যে তোমরা ফিরিঙ্গির হাতে পড়লে, সে আমার ঈশ্বরের অভিলাষ। নয়তো আরও কত মানুষ আছে তোমাদের দেশে, তোমরাই ধরা পড়বে কেন?—সুতরাং বৎসগণ, তোমরা আমার কথা শোনো। তোমরা অন্ধকারে থেকো না।

হঠাৎ সেই লোকটিকে সামনে দেখে আমি ঘৃণায় দু'পা পিছিয়ে গেলাম। আশ্চর্য, পাদ্রি কিন্তু ছুটে আমাকে ধরতে এল না। সে শান্ত স্বরে বলল—কে তুমি? তোমার হাত-ই বা বাঁধা কেন? যে লোকগুলি পালিয়ে গিয়েছে তারাই-বা এই মধ্যরাত্রে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন?

নির্জন নদীতীরে, চাঁদের আলোয় দণ্ডায়মান সেই বিশাল মানুষটির শান্ত কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। আমি মুহূর্তে ভেঙে পড়লাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মৃত্যু যেন সেই ভৃত্য দুটির মতোই ধীরে ধীরে আমার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কর্ণফুলি হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠেছে, আমাকে গ্রহণে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। পাদ্রির কাছে আমি সব খুলে বললাম। সে বলল—বাছা, তোমার আর কোনও ভয় নেই। আমি সেই ক্যাপ্টেনকেই শেষ প্রার্থনা শোনাতে চলেছি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না। আমি তোমাকে আমার পরিচিত অন্য এক আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। তুমি সেখানে বিশ্রাম করো,—কিছুক্ষণ বাদেই আমি সেখানে ফিরে আসছি। পাদ্রি নিজের হাতে আমার হাতের বাঁধন আলগা করে দিল। তারপর বলল—ভয় কী? এসো, আমিই তো রয়েছি।

এই পাদ্রি সম্পর্কে আমি পরে অনেক কথা শুনেছি। দাসদের সম্পর্কে তার হৃদয়-হীনতার কাহিনীও আমার অজানা ছিল না। শুনেছিলাম দিয়াঙ্গা থেকে কটকের পথে মেদিনীপুরের গাঁয়ের মানুষেরা তাকে হার্মাদ ভেবে ধরে নিয়ে যাহা তাহা অপমান করেছিল। শুনে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, এমন কথা বলতে পারব না। এমনকী এই লিসবনে বসে যেদিন লন্ডনে দস্যুর হাতে তার হত্যা কাহিনী শুনেছিলাম, সেদিনও আমি মোটেই দুঃখিত হইনি। ওরা বলেছিল, রোমের পদস্থ ধর্মীয় ব্যক্তি প্রবীণ ম্যানরিকের মৃতদেহটা একটা কাঠের বাক্সে টেমস নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শুনে আমার বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা আর কর্ণফুলির জলে ভাসমান বাংলাদেশের চাষি গেরস্থ মানুষগুলোর বিকৃত শবগুলোর কথা মনে পড়ছিল, ফিরিঙ্গি পল্টনেরা যা খোল থেকে, বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

দিয়াঙ্গার যাজক ইচ্ছে করলে হয়তো অনেক প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেই জ্ঞান ছিল না। দাসদের ধর্মান্তরিত করা ছাড়া সেই যাজক অন্য কোনও ধর্ম জানতেন না। তবুও সেদিনের ম্যানরিককে আমি অবহেলা করতে পারিনি। কেন-না, সে রাত্তিরে ম্যানরিক সত্যিই অন্য মানুষ। নির্জনতা, চাঁদের আলো, অথবা আমার এই চাঁদ-বদন—হেতু যাই হোক, ম্যানরিক সে রাত্তিরে, সম্ভবত সেই একটি রাত্তিরেই সত্য এবং স্বাভাবিক মানুষ।

নতুন গৃহপতি বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত এবং আগের জীবনে পেশা তার যাই থাক, এখন সে পরিপূর্ণ গৃহস্থ। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছাড়া বাড়িতে তার অনেক মানুষ। ম্যানরিক আমাকে তার স্ত্রীর হেফাজতে রেখে তার যাজকের কর্তব্য পালন করতে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে ফিরে এল। এসে বলল, না, দরকার হল না,—রক্তটা বন্ধ হয়েছে, লোকটা হয়তো বেঁচে যাবে।

খবরটা শুনে আমি মুষড়ে গেলাম। গৃহপতি অভয় দিলেন,—আর তোমার ভয়ের কিছু নেই বোন, একবার এখানে যখন এসে পড়েছ, তখন দিয়াঙ্গার আর কোনও ক্যাপ্টেন তোমার নাগাল পাবে না। আমি বললাম—কিন্তু আমার শাশুড়ি?—আমার মেয়ে?

ম্যানরিক জবাব দিল—তাদের জন্যেও আর ভাববার কিছু নেই। আমি ডাসার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তোমাদের সকলের দায়িত্বই সে আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কাল সকালেই তারা এখানে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এ বার থেকে তোমরা এখানেই থাকবে।

পরদিন সকালে সত্যি সত্যিই শাশুড়ি আর মেয়ে ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে শুরু হল নতুন উৎপাত। তবে এ বার তা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ অন্য।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ম্যানরিক আমাদের ঘরে হানা দেয়। আমার মেয়েটিকে আদর করে, শাশুড়ির সঙ্গে ধর্মকথা আলোচনা করে। তার একমাত্র কথা তোমরা প্রভুকে আশ্রয় করো, বিশ্বাসী হও। আমরা যত বলি—আমরা বিশ্বাসীই আছি, ম্যানরিক ততই বলে, তা হলে আর তার কথায় সায় দিতে দোষ কী! একদিন সে কথাটা ভেঙেই

বলল। বলল—দেখো, ঈশ্বরের কৃপায় দিয়াঙ্গায় বিশ্বাসীর কোনও অভাব নেই। আমি হিসেব রেখেছি, প্রতি বছর তোমাদের বাংলা মুল্লুক থেকে ওরা গড়ে তিন হাজার চারশো মানুষকে ধরে আনে। অবশ্য অর্ধেক তার আরাকান রাজের প্রাপ্য। কিন্তু রাজা সদাশয় ব্যক্তি। সে দাস পেলেই খুশি। কার কী ধর্ম তা নিয়ে তার কোনও ভাবনা নেই। আমি তাই এখানে বছরে গড়ে কমপক্ষে দু'হাজার বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে থাকি। অধিকাংশ ঘাটেই এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। দেখলে না, সেদিন তোমার সামনেই কতজন মাথা পেতে আমার আশীর্বাদ নিল। তবুও যে আমি তোমাদের পীড়াপীড়ি করছি, তার কারণ আমি জানি তোমরা বংশে সৈয়দ। তোমাদের একজনকেও যদি আমি আমাদের পথে আনতে পারি, তবে সে হবে আমার পক্ষে পরম গৌরবের ঘটনা। শুনে আমার শাশুড়ি বলল—আর আমাদের পক্ষে সেটা কী ঘটনা হবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ সাহেব? পাদ্রি চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটল। দিয়াঙ্গায় নামার পর থেকেই মেয়েটি আমার অসুস্থ। জ্বরটা ক'দিন কম ছিল। আবার তা বেড়ে উঠল। ম্যানরিক মেয়েটিকে স্নেহ করত। সে গির্জার কাজের অবসরে এসে তার সেবা করতে লাগল। কিন্তু মেয়ের অসুখ কমবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ক্রমেই তা আরও বেড়ে চলল। ম্যানরিক বলল—কোনও কিছুতেই যখন রোগ সারবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তোমরা যদি অনুমতি করো, তবে আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু সে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, তার আগে ওকে আমি ইশু মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারি কি?

কন্যা মৃত্যুশয্যায়। মা হয়ে তার আরোগ্য কামনার পথে বাধা দেওয়া যায় না। আমি মাথা নাড়লাম। ম্যানরিক ওকে দীক্ষা দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—কী মা, একটু ভাল লাগছে? মেয়ে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। আমি চিৎকার করে বললাম—বাছা, তুই কি আরাম পাচ্ছিস? এ বারও উত্তর হল—হ্যাঁ। সেই তার শেষ উত্তর। মেয়ে চোখ বুঁজল। সে চোখ আর কোনওদিন খোলেনি।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মেয়ে যার চোখের সামনে খ্রিস্টান হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে, তার পক্ষে আর সৈয়দ পরিচয় দেওয়ার অর্থ হয় না। আমরা শাশুড়ি-বউ দু'জনেই খ্রিস্টান হয়ে গেলাম। আমাকে একটা ফিরিঙ্গি নামও দেওয়া হল। কিছুদিন পরে আমার শাশুড়িও মারা গেলেন। দিয়াঙ্গায় ফিরিঙ্গিদের মুখে আমার খ্রিস্টান হওয়ার কাহিনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। অভিজাত ফিরিঙ্গিরা আমাকে দেখতে ভিড় জমাতে লাগল। নানাজন ফিরিঙ্গি কায়দায় আমাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, নতুন করে ঘর বাঁধতেই যদি হয়, তবে এই মগের মুল্লুকে নয়—সৈয়দের কন্যা আমি, খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা সৈয়দ তাদের কারও ঘরে ঠাঁই পেলে তবেই আমি রাজি।

অবশেষে সে মানুষও এল। ম্যানরিক বলল—তুমি ওর সঙ্গে যেতে পারো। ওরা খাস লিসবনের বনেদী ঘর। এ দেশে ব্যবসায়ের কারণে এসেছে, অচিরেই ঘরে ফিরে যাবে।—কি তুমি রাজি?

আবার সেই দেশ, সেই সংসার; ঢাকার কথা মনে পড়ছে, আমার স্বামী, আমার মেয়ে, বুড়িগঙ্গা, ধানক্ষেত, ধানক্ষেতে চখাচখী ডাকছে, বকেরা সার বেঁধে উড়ছে—বাংলাদেশ মেঘ হয়ে আমার মনের আশমান ঘিরে আসছে। আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। লিসবন পারবে আমার সেই স্মৃতি মুছে দিতে? যদি পারে, তবে কোথায় তুমি ভিনদেশি সওদাগর, তুমি এক্ষুনি ডিঙ্গি ভাসাও, যে মাটিতে আমার মেয়ের কবর, আমার শাশুড়ির কবর, যেখানে আমার জীবনের সব সাধ, সব আকাঙ্ক্ষা মাটি চাপা আছে, সেখান থেকে আমাকে নিয়ে এক্ষুনি তুমি পালিয়ে যাও।

আশ্চর্য, লিসবনও ব্যর্থ হল। পেড্রোর ধারণা, আমি সুখী। আমাকে নিয়ে তার কত গর্ব! অন্ধ জানে না, আমার বুকে কী জ্বালা! জানে না, জীবনে একদিনই আমি খুশি হয়েছিলাম, গোটা লিসবন যেদিন হুগলির খবর শুনে শুকনো মুখে কাঁদছিল। সেটা ১৬৩২ সনের কথা। অর্থাৎ ঢাকা থেকে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার তিন বছর পরের ঘটনা।

ওরা বলছিল—শাজাহানকে কাশিম খাঁ হুগলি আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল যে কারণে, সে নাকি একটি রূপসী মেয়ে। মেয়েটি ছিল সম্রাটের প্রিয় সেনাপতিদের একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। পল্টনেরা ঢাকা থেকে তাকে রাতের অন্ধকারে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে কাশিম খাঁ-র ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। কারণ ঘটনাটা শুধু বোম্বেটেদের ক্রমবর্ধমান দুঃসাহসেরই পরিচায়ক নয়,—সেই মেয়েটির স্বামী ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধব। কবি কাশিম খাঁ তাই এ বার ক্ষমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে, সে হুগলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় পর্তুগিজরা এখন আশ্রয়ের আশায় গঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের পিছনে পিছনে মোগলেরা তাড়িয়ে ফিরছে।

শুনে সেদিন আমার যে কী আনন্দ, সে আমি বলতে পারব না। ইচ্ছে করছিল লিসবনের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি—হে লিসবনবাসী, আমিই সেই রূপসী। আমাকে দুঃখী করেছিলে বলেই তোমরা আজ হুগলিতে নিরাশ্রয় বিদেশি। পরের দিন আরও একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর এল। মোগলেরা হুগলিতে ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাচ্ছে, তারা অনেক ফিরিঙ্গি রমণীর ইজ্জত নষ্ট করেছে, বহু ক্রীতদাসী তাদের হাতে পড়েছে। তার চেয়েও উত্তেজনাপূর্ণ খবর, বিখ্যাত রূপসী লুক্রেশিয়া টেভারেস তাদের হাতে ধরা পড়েছে। তৎকালে সুখ্যাত এই ফিরিঙ্গি রূপসীটি প্রথম জীবনে নাকি ছিল সন্দীপের দস্যু নায়ক তিধাও তনয় সেবাস্তিয়ান তিবাও-এর সহচরী! মোগলেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সে এখন কোনও মোগল সেনানায়কের শিবিরে আছে। ওরা জানত না, হুগলি তছনছ করে কাশিম খাঁ কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওরা জানত না—লুক্রেশিয়া কেন ধরা পড়ল। লিসবন জানে না, তাদের প্রবাসের সুন্দরী আজ কার শিবিরে। আমি তা জানি। অশ্বারোহীদের পুরোভাগে সে মানুষটির চোখ কাকে খুঁজতে খুঁজতে তোমাকে ধরেছে, লুক্রেশিয়া, আমি তা জানি। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, সেই মোগল সেনাপতিই আমার স্বামী। আজ আমি সুখী! আজ আমি সুখী!

মিথ্যে কথা। ওরা কেউ সুখী নয়। বিয়াফ্রা আর বঙ্গোপসাগর, বেঙ্গুয়ালা আর বাংলা তোমাদের কথা আমরা জানি। ক্রীতদাস কোনও যুগে সুখী নয়। তোমরা ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকের পৃথিবীতে যারা জন্মে ছিলে, তারা সম্ভবত সবচেয়ে দুঃখী। এ জন্যে নয়, তোমরা দাসদের 'স্বাভাবিক' পথে পায়ে শেকল পরোনি, এ জন্যে নয়, তোমরা দস্যুতার কবলে পড়ে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী,—আসল কারণ সেদিনের পৃথিবী। প্রথম যেদিন সভ্যতা পৃথিবীতে দাস দেখেছিল, সেদিনের সঙ্গে তোমাদের পৃথিবীর অনেক গরমিল। সেখানে দুঃখের সংজ্ঞা ছিল সংকীর্ণ। মানুষের, এমনকী স্বাধীন মানুষের কামনা ছিল পরিমিত। কিন্তু তোমাদের পৃথিবীতে দুঃখ সুন্দরবনের নালাগুলোর মতোই বহু স্রোতা, মানুষের কামনা অতলান্তিকের মতোই তলহীন। তোমরা সে-পৃথিবীর মানুষ। সুতরাং, তোমরা যখন বলো—আমরা সুখী, তখন আমরা, সিন্ধু আর নীল, ইউফ্রেটিস আর জর্ডন তীরে কবরের তলায় পড়ে আছি যারা, সেই নামহীন পরিচয়হীন দাসদাসীরা তা বিশ্বাস করি না। কেন-না, আমরা সেই অন্ধকার পৃথিবীতেও সুখী মানুষ ছিলাম না।

কোথায় বুদ্ধ, কোথায় যিশু? আমরা যখন হাতে শেকল পরি—পৃথিবীতে তখনও ব্যবসায়ীরা আবির্ভূত হয়নি। মানুষ তখনও এক ভ্রাম্যমাণ অস্থির অস্তিত্ব। শিকারের পর্ব শেষ করে সবে সে পশুপালকের যাযাবর জীবনে দীক্ষা নিয়েছে। সেকালেই সভ্যতার প্রথম স্মারক হয়ে আমাদের জন্ম। এতকাল মানুষ পুরোপুরি বর্বর ছিল। কারণ পরাজিত শত্রুকে সে করুণা করতে জানত না। কিন্তু এ বার পরাজিতের বুক লক্ষ্য করে তার উদ্যত তির জ্যা মুক্ত হওয়ার আগে তার কপালে চিন্তার জ্যা ফুটল। তিরটা পিঠের তূণে রেখে সে প্রসারিত হাতে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল। তার কাছে আজ পরাজিত মানুষ শব মাত্র নয়, তার মূল্য আছে। কেন-না, যাযাবরের যৌথ জীবনে বাড়তি মানুষ দরকারি বস্তু। বিশেষ মেয়েরা। তারা সন্তান ধারণ করতে পারে,—তারা গৃহকর্ম জানে, তারা পশু চরাতে পারে। সম্ভবত, তাই এ পৃথিবীর প্রথম ক্রীতদাস যে, সে মানব নয়, মানবী,—ক্রীতদাস নয়, ক্রীতদাসী! এবং তাকে যারা দলে তুলে নিয়েছিল তারা দস্যু নয়, মানবতার আলোকে উদ্ভাসিত প্রথম মানব গোষ্ঠী।

ক্রমে ভ্রাম্যমাণ যাযাবরেরা কেউ কেউ ঘর পাতল। ক্রীতদাস সেখানে সহচর হল। এ কালে তারা যতখানি দাস, তার চেয়ে বেশি যেন বান্ধব। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মিশর কোথাও তারা ভয়াবহ অস্তিত্ব নয়। আমাদের আর্তনাদ সেখানেই প্রবল, সমাজ যেখানে বীরবৃন্দের সমষ্টি, মানুষ যেখানে যোদ্ধৃ দল, বিজয় অভিলাষী।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন (খ্রিঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ) তাঁরা সবিস্ময়ে লিখে গেছেন—ভারতে ক্রীতদাস নেই। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। কেন-না, গ্রিকরা গোটা ভারত চোখে দেখেনি। স্ট্রাবো, অ্যারিয়ান—ওঁরা যে হিন্দুস্থান দেখেছেন, তা প্রধানত সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম ভারত। বিশাল আর্যাবর্তের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। যদি তা থাকত তা হলে আমরা হয়তো তাঁদের চোখ এড়াতে পারতাম না। কেন-না, পরবর্তীকালের ভারতের

মতোই সেদিনের হিন্দুস্থানে অনেক দাস। এমনকী বৈদিক যুগেও (খ্রি: পূ: ২০০০-১০০০ অব্দ) এ দেশে দাসের অভাব ছিল না।

ঋগ্বেদের পাতা ওল্টালে, দেখতে পাবে সেখানে কে একজন রাজা পঞ্চাশটি ক্রীতদাসী উপহার পেয়ে মনের খুশিতে বন্ধুর গুণগান করছেন। মনুর বিধান (খ্রি: পূ: ৫০০ অব্দ) খোলো, সেখানেও আমরা সপ্ত শ্রেণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক যুগেও আমরা ভারতে এক বিশাল সম্প্রদায়। তবুও সেদিন আমরা সহসা বাইরের মানুষের চোখে ধরা পড়তাম না, কারণ আর্যভারত তখন সংসারী মানবগোষ্ঠী—সিন্ধু আর গঙ্গার উপত্যকায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবী। আদি যুগের যোদ্ধ পরিচয়ের দিন চলে গেছে,—যারা দাস হয়েছিল তারা নতুন সমাজ বিন্যাসে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সামাজিক অধিকারে আমরা তখন প্রভুকুলের সমান না হলেও, আমরা গ্রিস দেশের ক্রীতদাস নই। আমাদের কারও হাতে পায়ে সেদিন শেকল নেই।

একদিন সেকেন্দর সাহের আপন দেশেও তাই ছিল। হোমারের গ্রিসেও আমরা ছিলাম। কিন্তু সেদিনের গ্রিস, সামন্ততান্ত্রিক, কৃষিনির্ভর দেশ। আমরা ক্রীতদাসরা সেখানে অনেকটা স্পার্টার ভূমিদাস হিলটদেরই মতো। ওরা বিজিত জাতি। আমরাও কেউ কেউ তাই। "ওডেসি"র ইউমাউস ভূতপূর্ব রাজতনয়, ভাগ্য বিভ্রাটে সে ক্রীতদাস। অন্যরা কেউ জন্ম সূত্রে, কেউ সামাজিক প্রথাসূত্রে, কেউ-বা স্বেচ্ছায়। সামাজিক প্রথার মধ্যে দুটি বিশেষ করে শোনবার মতো। একটি তার দুর্বল এবং অসহায় সন্তানদের পরিত্যাগ, অন্যটি হিন্দুস্থানের মতো দেব-মন্দিরে মন্দিরে "লাইরোদুলি" বা দেবদাসীর ব্যবহার। আমরা অনেকে সেই পথে স্বাভাবিক মানুষ থেকে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। যারা স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করত তারা আমাদের চেয়েও দুর্ভাগা। কেন-না—তার পিছনে কারণ ছিল ঋণ অথবা দু'মুষ্টি অন্ন। এই অন্নহীন ঋণভার জর্জরিত মানুষ প্রতিটি সভ্যতায় এক অসহ্য বিভীষিকা। টোলেমিদের মিশরে, মনুর ভারতবর্ষে, ফারাওদের প্রাসাদের বাইরে, গণতন্ত্রী গ্রিসের পথে প্রান্তরে সর্বত্র তারা ছিল। মিশরে সম্পন্ন কৃষিজীবী পুরোহিতদের কাছে তার ভবিষ্যত জানবার বাসনায় যে প্রশ্নপত্রগুলো পাঠাত তাতে—বহু প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন থাকত—আমি কি ঋণী হব?—আমাকে কি নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে? হোমারের গ্রিসেও সেই এক খবর—মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু ক্রীতদাস হয়েও সেদিনের গ্রিসে আমরা কেবলই বিলাসের উপকরণ নই। আমরা গ্রিকজীবনের শরিক। আমরা বিশেষ অনুষ্ঠান অন্তে পরিবারে ছাড়পত্র পেতাম, প্রভুর সঙ্গে মানুষের মর্যাদা নিয়ে কথা বলতাম। আমাদের তখন ভিন্ন পোশাক নেই, অর্থ সঞ্চয়ে অসুবিধে নেই, বিয়েতে কোনও প্রভুর আপত্তি নেই। যদিও মন্দিরে, জনসভায় বা তরুণ তরুণীরা যেখানে বিবস্ত্র হয়ে দেহচর্চা করে সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না—তা হলেও বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে আমরা মুক্ত মানুষ ছিলাম। আমাদের নিজেদেরও কিছু কিছু পরব ছিল। সমাজে আমাদের তখন অনেক বান্ধব। হোমার আমাদের কথা গেয়েছেন, ইউরিপিডিস আমাদের জীবন বর্ণনা

করেছেন,—জেনোফেন আমাদের "ফেলোওয়ার্কার" বলেছেন।

আমরা তখন সভ্য গ্রিকের সহযোগী, প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে আমরা নিজেদের মুক্তি কিনতে পারি, নগরের রেজিস্ট্রারে নাম লিখিয়ে আমরা স্বাধীন হতে পারি। তা ছাড়াও কোনও কোনও প্রভু আমাদের মন্দিরের নামে উৎসর্গ করে, আমাদের মুক্তি দিয়ে দিতেন, কেউ কেউ থিয়েটারে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতেন। যারা দাস হয়েই শেষ নিশ্বাস ফেলতাম, তাদের জীবনও পরবর্তীকালের মতো কান্নাময় ছিল না। হতভাগিনী ক্যাসেন্ড্রা রাজকুমারী ছিল। তার কান্নার শেষ ছিল না। কিন্তু অজাক্স-সহচরী টেকমেসা কি ভাগ্যবতী ছিল না? ক্রীতদাসী হয়েও সে নারীর সবচেয়ে কামনার ধন ভালবাসা পেয়েছিল। ব্রাইসেইস আরও ভাগ্যবতী। সে একিলিসের ভালবাসা পেয়েছিল। তাকে যখন ওরা নিয়ে গেল, একিলিস তখন বলেছিল—আশ্চর্য, সব ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্রজনই আপন সহচরীকে ভালবাসে। হোক না মেয়েটি আমারই বর্শার বন্দিনী, আমি ওকে ভালবেসেছিলাম।

পরবর্তীকালের গ্রিসে এই উদারতার কোনও অবশেষ ছিল না—এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু সে গ্রিস অন্য। দ্বীপপুঞ্জ তখন লুব্ধ, সম্প্রসারণশীল, গর্বিত, উন্নত। সমুদ্রে তার কাজ বেড়েছে, সীমান্তেও। ঘরে বাইরে তার তখন অনেক দায়িত্ব। বিরাট সৈন্যদলের রসদ চাই, অস্ত্র চাই, সেবায়েত চাই। তা ছাড়া গ্রিস ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, তার নাগরিকেরা শুধু সুরা নয়, সাকি চায়, কেবলই—দার্শনিকতা নয়, শৌখিনতা চায়। সুতরাং, মাননীয় সেনানায়ক এবং সমাজপতিদের মনে মনে দাবি উঠল—গোলাম চাই, বাঁদি চাই। স্বভাবতই এত কালের চলতি পথে সে দাবি মেটানো সম্ভব হল না। শুরু হল যুদ্ধ, লুণ্ঠন, দস্যুতা; প্রকাশ্য হাটে কেনাবেচা। প্রধান সরবরাহ সূত্র দাঁড়াল অবশ্য যুদ্ধ। কেন-না পরাজিত দেশে যে হারে অঢেল মানুষ পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও না। আলেকজান্ডার একদিনেই থিবস-এ তিরিশ হাজার নারী আর শিশু হাতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই রাজকীয় পন্থাই একমাত্র পথ ছিল না। চিরকালের মতো দস্যুতা এবং অপহরণ সেদিনও এই ক্লেদাক্ত বাণিজ্যের স্বাভাবিক সূত্র। এমনকী গ্রিকরা গ্রিকদের ধরে এনে পর্যন্ত হাটে হাটে পসরা সাজাতে লাগল।

তবে আসল মৃগয়াক্ষেত্র ছিল—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, লিডিয়া, থেরেস, ইথিওপিয়া, এবং মিশর। প্রধান বাজার ছিল—এথেন্স। কিওস, সাইপ্রাস এবং ইফেসাস। সেদিনের এথেন্সে একজন বলবান তরুণ বা তরুণীর দাম আধ মিনাস থেকে দশ মিনাস। আজকের মুদ্রায় পঞ্চাশ থেকে হাজার ডলার! বাণিজ্য বলেই শুধু আমদানি নয়, রপ্তানির দিকও ছিল একটি। গ্রিক আর আইওনিয়ান সুন্দরীদের তখন পুবের পৃথিবীতে তেজি বাজার। তাদের বয়ে নিয়ে ব্যবসায়ীর বাণিজ্যতরী সেদিকে ছুটছে, কোথায় কায়রো, কোথায় বোগদাদ—হারেম সাজাতে হবে। তবে যাচ্ছে যত আসছে তার চেয়ে বেশি। শুধু চাষি আর শ্রমিক নয়, নর্তকীরা আসছে, বংশীবাদকেরা আসছে, নৌবাহিনীর জন্যে দাঁড়ি আসছে, সৈন্য দলের জন্যে কারিগর, ভারবাহী আর

রাঁধুনির দল। গ্রিস তখন যেন আমাদেরই দেশ—দাসদের রাষ্ট্র। আমরা মন্দির গড়ছি, থিয়েটার গড়ছি, পথ তৈরি করছি, নগরে জলধারা বয়ে আনছি, আমরা লাউরিয়নে রুপোর খনিতে কাজ করছি, মাঠে চাষ করছি, আমরাই জিমনাসিয়ামে দেহচর্চা শেখাচ্ছি, শহরে শহরে পুলিশের কাজ করছি। ১২০০ সিদিয়ান তিরন্দাজ তখন এথেন্সে পুলিশ। ৩০৯ অব্দে অ্যাটিকায় আমাদের সংখ্যা চার লক্ষ। গরিবের ঘরেও তখন কম করে একজন ক্রীতদাস, সম্পন্নের ঘরে পঞ্চাশ—একশো। নিকিয়াসের খনি ছিল—তার ছিল—এক হাজার! স্বভাবতই খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে এথেন্সে আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। এ হিসেব সত্য হলে আমরা ক্রীতদাসেরা সেদিন এথেন্সে স্বাধীন মানুষের চারগুণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রহসনকে আড়াল করা সেদিনের দুনিয়াতেও সহজ ঘটনা ছিল না। বৈপরীত্য সেদিন প্রভুকুলের নিজেদের চোখেও স্পষ্ট। খনিতে আমাদের জীবন তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। অজ্ঞাত ছিল না আমাদের নগর জীবনও। লাইকারগাস গ্রিসে সাম্য এনেছিলেন। নাগরিকেরা ধনী গরিব নির্বিশেষে এক টেবিলে ভোজন করতে পারত। কিন্তু সেই টেবিলের চার পাশ ঘিরে যারা পরিচারকের কাজ করত তারা? অর্ধভুক্ত, উলঙ্গ, সাম্যের সেই সেবায়েত দল আমরা, সেদিনের ক্রীতদাস।

আমাদের জন্য ধর্ম সেদিন মানবতা নয়, অন্য; দর্শন বক্র,—প্লেটো অ্যারিস্টটলের মতো জ্ঞানীরা ছলনাময়। প্লেটো বলতেন—"ন্যাচারেল স্লেভ।" আমরা নাকি দাস হয়েই জন্মেছি, গ্রিসের সেবা করে সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে এসেছি। "যে মানুষ তাড়াতাড়ি হাঁটে সে সভ্য নয়,"—গ্রিসে আমাদের নাম করে সভ্যতার সংজ্ঞা অন্য। একদল আরাম করবে, রুটি রুজির চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে—অন্য দল তার সেবা করবে, তবেই না এই বর্বর জগৎ অশ্বের বেগে এগিয়ে যাবে! অ্যারিস্টটল বলতেন—আমরা প্রাণযুক্ত যন্ত্র, "এনিমেটেড টুলস"—আমাদের ছেড়ে দিলে সভ্যতার বেগতি। সুতরাং, হে ক্রীতদাস, হে ক্রীতদাসী, তোমরা প্রকৃতিকে অমান্য কোরো না, তোমরা লালসা মুক্ত থাকো,—কান্না কেন, তোমরা আনন্দ করো,—হাসো!

রোমে এই দার্শনিকতাটুকুই ছিল না। কেন-না, রোম গ্রিস নয়, রোম হিন্দুস্থান নয়। রোম ইউরোপের ইতিহাসে এক অমাবস্যার রাত্রে জাত রক্তস্নাত নবীন পশ্চিম। তার পৃথিবীতে বর্বরেরাই প্রথম প্রতিবেশী, পরাজিত দাস-দল দ্বিতীয় মানব গোষ্ঠী। ওরা দেখেছে টিউটনরা স্লাভদের দাস করেছে, ওরা বলল—স্লাভরা স্লেভ হয়েছে। টিউটন হোক, গ্রিক হোক, মিশরীয়, সুমেরীয় যে রক্তের মানুষ হোক—রোমানের কাছে সবাই স্লেভ। কেন-না, গর্বিত রোম বলে—স্লেভ মানে স্লাভ নয়, স্লেভ মানে গৌরব, গ্লোরি।

সুতরাং, আমরা কাছের এবং দূরের প্রতিবেশীরা দাস হলাম,—ক্রীতদাস। অগস্টাস অনেক পরের মানুষ। জাস্টিনিয়ান, লিও, ট্রাজান প্রভৃতি যে হৃদয়বান মানুষগুলোর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় কোথায় তখন তাঁরা? সিজার গল্ দেশে পা দিয়েই তেষট্টি

হাজার নরনারীকে ক্রীতদাস করলেন। হাতে হাতে তাদের শেকল পড়ল। বিজয়ী বীর তাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। পাউলাস ইপিরাসে এসে পেলেন দেড়লক্ষ। ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পাওয়া গেল সাতান্নব্বুই হাজার! পারস্য, পার্থিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রিস, মিশর—যেখানেই রোমান সৈন্য সেখানেই হাজার হাজার ক্রীতদাস। কেউ তাদের নির্বিচারে হত্যা করছে, কেউ সোনার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে,—কেউ শৃঙ্খলিত লক্ষ ক্রীতদাসে শোভাযাত্রা সাজিয়ে নগরে প্রবেশ করছে, তাদের শৃঙ্খলধ্বনিতে রোমের গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যের প্রথম জীবনে নিয়ম ছিল—রুগ্ন বা অন্য কোনও দৈহিক কারণে পরিত্যক্ত শিশু যদি কেউ উদ্ধার করে বেচে দেয় তবে সে দাস হবে। বুভুক্ষু বা ঋণগ্রস্ত প্রজা যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে বেচে দেয় তবে সে দাস হবে। বিচারে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে—তারাও দাস হবে,—দাসের সন্তান দাস হবে। অগস্টাস একজন রোমান নাইটকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ সে স্নেহাতুর পিতা ছিল। ছেলেদের যুদ্ধে যেতে দিতে হবে ভয়ে সে তাদের পঙ্গু করেছিল। টিটাস—ডেলাটোরিদের হাতে পেলেই বেচে দিত। কারণ ওরা গুপ্তচর! এদের বাদ দিলেও রোমে ক্রীতদাস ছিল। কারণ, আমরা ক্রীতদাসেরা রোমুলাসের জন্মের আগে থেকেই এ পৃথিবীতে আছি। শুধু প্রতিবেশীদের ঘর থেকে সওদাগরের পিঠে চড়ে আমরা ততদিনে সুদূর হিন্দুস্থান থেকেও সেখানে পৌঁছে গেছি। কিন্তু এ বার রোমের বিজয়বার্তার সঙ্গে সঙ্গে যা শুরু হল সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

দাম সেকালের নগণ্য মানুষের জীবনমূল্য হিসেবে সস্তা ছিল না। সিজারের আমলে যে কোনও ক্রীতদাসের দাম কমপক্ষে দশ পাউন্ড! একটি রূপসী গ্রিস তরুণীর দাম—একশো পাউন্ড। কিন্তু তা হলেও সেদিনের রোমে অভিজাত ঘরে ঘরে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। কারও ঘরে একশো, কারও ঘরে দুশো, কারও বা চারশো। একজন শৌখিন রোমানের ছিল—চার হাজার একশো ষোল জন। রোম যেন সেদিন ক্রীতদাসেরই শহর, রোমান সাম্রাজ্য দাসদের রাজ্য। বিশুদ্ধ লাতিন ভাষার চর্চা কেন্দ্রে সেদিন নানা ভাষার কান্না, কোলাহল। জুলিয়াস সিজারের দেহরক্ষী বাহিনী স্পেনিয়ার্ডদের নিয়ে তৈরি, অগস্টাসের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা জার্মান। উৎসবের রাত্রিতে এ নগরের পথে লিডিয়ান সুন্দরী তালি বাজায়, ভারতীয় নর্তকী নাচে, স্পেনিস তরুণ বাদ্য বাজায়। কেউ গ্ল্যাডিয়েটার হয়ে জীবনমরণ লড়ছে, কেউ সার্কাস দেখাচ্ছে, কেউ রান্না করছে, কোনও রূপসী হয়তো স্নানাগারে আপন মাথার চুলে প্রভুর হাত মুছে দিচ্ছে। চারদিকে সেদিন দাস আর দাস। মাঠে, খনিতে, কারখানায়, হাটে—সর্বত্র আমরা। ইতালিতে সেদিন প্রতিটি স্বাধীন মানুষের পিছু পিছু তিনজন দাস। অতি অল্পজনই তাদের মধ্যে "সোলিউটি",—বন্ধন হীন, অধিকাংশই "ভিঙ্কটি"—হাতে পায়ে তাদের শেকল।

ক্লডিয়াসের আমলে স্বাধীন মানুষ ঊনসত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, দাস—দুই কোটি তিরাশি হাজার! অগস্টাসের আমলে রাজধানীতে সংখ্যায় আমরা দুই লক্ষ আশি

হাজার। অথচ আশ্চর্য এই, কেউ সেদিন আমাদের নিয়ে ভাবে না। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল—আমাদের পোশাক ভিন্ন করা দরকার। নয়তো সাচ্চা রোমানেরা গোলমালে পড়ে যাচ্ছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন না—কারা স্বাধীন মানুষ, কারা দাস। সেনেট শোনা মাত্র প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছিল, কারণ—এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে দাসরা জেনে যাবে, এ শহরে তারাই প্রধান! মাননীয় সদস্যরা সে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না। কারণ—ক্রীতদাসরাই তাদের জীবনে সব। তাদের শক্তি, তাদের অর্থ, তাদের আমোদ, তাদের গৌরব।

সেনেকা দার্শনিক ছিলেন। ম্যাক্সিমাসও তাই। তাঁরা এই বিলাস থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। যথার্থ জীবনের সন্ধানে সুখশয্যা ছেড়ে মাটিতে শয়ন করতেন। তাতেও তৃপ্তি মিলল না। শান্তির সন্ধানে শহর ছেড়ে ওরা খালি পায়ে গ্রামের পথ ধরে অরণ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। সমগ্র রোমান দুনিয়া ধন্য ধন্য করে উঠল। কিন্তু তাকিয়ে দেখো, ওদের পেছনে পেছনে সন্ন্যাসীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা, ক্রীতদাসরা! এই সেদিনের রোম। সিসেরো সেখানে ক'জন? কি রিপারলিকান রোম, কি রাজকীয় রোম—সাম্রাজ্যে সেদিন ভেডিয়াস পোল্লিও আর নিরোরাই প্রবল। নিরো ভোজের আসরে বসে দু'হাতে দাস-দাসী বিলোতেন, পোল্লিওর ক্রীড়া ছিল নিজের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের পোষা হাঙ্গর কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া! ক্যাসিয়াস ছ'শো ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশনামা মঞ্জুর করেছিলেন—কারণ আমরা বাড়িতে থাকাকালেই কে বা কারা জনৈক রোমান গৃহপতিকে হত্যা করেছিল। এমন যে মানুষ কনস্টেনটাইন তিনিও খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগের বছর কয়েক হাজার ক্রীতদাসকে সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে অবসর যাপন করেছিলেন।—তারপরও কি বলা চলে, আমরা এই বিশ্বের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা সুখী ছিলাম!

আমি সুখী ছিলাম। আমি টেরেনস—ক্রীতদাস হয়েও সেদিনের পৃথিবীতে আমি বিখ্যাত কবি হয়েছিলাম।

আমি এপিকটেটাস, দাস হয়েও আমি দার্শনিকের গৌরব লাভ করেছিলাম।

আমি নামহীন অখ্যাত দাস। ইতিহাসের বিখ্যাত মানব হোরেস আমার তনয়।

আমি......। আমি রোমের যাজক হয়েছিলাম।

আমি খোজা নারসেস,—দাস হয়েও আমি পারস্যের বিখ্যাত সেনানায়ক হয়েছিলাম।

আমি টেলিফাস। দাস হয়েও আমি স্বপ্ন দেখতে জানতাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম বিশ্বের আমি ভবিষ্যত অধীশ্বর। অবশ্য সে-স্বপ্নের মূল্য হিসেবে আমাকে ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তবুও আমি সুখী ছিলাম, কারণ আমি স্বপ্ন দেখতে পারতাম।

আমি পন্টাসের অখ্যাত দাস ওথো। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—রোম আমার। নিরো মারা গেলে আমি রটিয়ে ছিলাম সম্রাট মরেনি। ওরা আমাকে হত্যা করেছিল। তবুও

আমি সুখী, আমি নিরোর রোমে স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলাম।

আমি কুতুবুদ্দিন। স্বপ্ন নয়, দাস থেকে আমি হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছিলাম।

আমি ইলতুতমিস।

আমি নাসির খাঁ হাবসি। আহম্মদ শাহ গণেশীকে হত্যা করে আমি গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলাম।

আমি নামহীন ক্রীতদাসী। অক্টাভিয়া আমাকে ভালবেসেছিল।

আমি এক আরব ক্রীতদাস। আমার বুদ্ধি ছিল। পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্ষণিকের জন্যে নগরের অন্যতম সম্ভ্রান্ত মানুষের অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। একটি অভিজাত রূপসীকে কাছে পেয়েছিলাম। শেখের পায়ের শব্দ শুনে পালাতে গিয়ে বাঁদির হাতের পানপাত্রটি ভেঙে দিয়েছিলাম। শেখ বলেছিল—তুমি এখানে কেন? উত্তরে বলেছিলাম—এই বাঁদি রাস্তা দিয়ে সুরা নিয়ে আসছিল, ধাক্কা দিয়ে তার হাতের পাত্রটি ভেঙে দিয়েছি, তাইতেই বেগমসাহেবা আমাকে ধরিয়ে এনে জরিমানা করেছেন। শয্যায় তখনও আমার খুলে রাখা পোশাকটা পড়ে রয়েছে, তাই দেখিয়ে বলেছিলাম—জরিমানা ওই আমার পোশাক।

আমি গ্রিক রূপসী। রোমানরা আমাকে উপহার করে পাঠিয়েছিল। ইরানের বাদশা পঞ্চম ফারাটেস ভালবেসে আমাকে রানি করেছিল।

আমি ইলতুতমিস-কন্যা রাজিয়া। আমি হিন্দুস্থানের রাজ্ঞী হয়েছিলাম।.....

হ্যাঁ আমি রাজিয়া। একদিন সত্যিই আমি সুলতান হয়েছিলাম। সুলতানা নয়, সুলতান। দিল্লির তখ্‌তে প্রথম মহিলা। ১২৩৬ সালে আমি যখন সিংহাসনে বসি তখন আমার নাম—"সুলতান রাজিয়াতউদ্দিন।" আমার পিতা ইলতুতমিস একজন দাস ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরি কুতুবুদ্দিন আইবাকও ছিলেন মহম্মদ ঘুরির একজন ক্রীতদাস। কুতুবউদ্দিন ছিলেন তুর্কিস্থানের মানুষ। মহম্মদ ঘুরি গজনির। তরাইয়ের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মহম্মদ ঘুরি খোরাসানে ফিরে যান। হিন্দুস্থানে অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে দিল্লিতে দাস বংশের বনিয়াদ গড়েন কুতুবউদ্দিন। ১২০৬ সাল থেকে তিনি দিল্লির সুলতান। সে বছরই লাহোরে তাঁর অভিষেক। চার বছরের সামান্য কিছু বেশি দিন তিনি দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন। ১২১০ সালে পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি জখম হন। তাতেই তাঁর মৃত্যু। দিল্লির বিখ্যাত কুতুবমিনার রাজধানীতে তাঁর অনেক স্থাপত্যকীর্তির একটি।

মিনারটি অবশ্য তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। সে কাজ সম্পূর্ণ করেন আমার বাবা ইলতুতমিস ওরফে আলতামাস। তিনি ছিলেন কুতুবউদ্দিনের সবচেয়ে প্রিয় দাস। কুতুবউদ্দিন তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক কন্যাকে। আমি ওঁদেরই সন্তান। একমাত্র সন্তান নই, অনেক সন্তানের একজন। আমার বাবাকে সিংহাসন রক্ষার জন্য ক্রমাগত লড়াই চালাতে হয়েছে কুতুবউদ্দিনের অন্য বিদ্রোহী দাসদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁরই তলোয়ারের জয় হয়। ১২২৯ সালে বাগদাদের খলিফা

তাঁকে উপাধি দেন "সুলতান-ই-আজম।" তিনিও দিল্লিতে তাঁর বেশ কিছু স্থাপত্যকীর্তি রেখে গেছেন। তার সমাধিটি কি এখনও দর্শনীয় নয়? আজমের-এর মসজিদটিও সমান সুখ্যাত। যুদ্ধে যুদ্ধে ক্লান্ত ইলতুতমিস দীর্ঘজীবি ছিলেন না। ১২৩৬ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর আমির ওমরাহদের তাজ্জব করে দিয়ে ঘোষণা করেন, কোনও পুত্র সন্তান নয়, তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসবে প্রিয় কন্যা—রাজিয়া। উনিশ জন পুত্র প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে শয্যার চারপাশে অধীর অপেক্ষায়। তাঁদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী পিতা সিংহাসনে বসাতে চান আমাকে। ওমরাহদের মতো চমকে উঠেছিলাম আমিও।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। সেদিন ১২৩৬ সালের ২৯ এপ্রিল। আবেগে উত্তেজনায় আমি কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েছিলাম বাবার বুকে। কামিজ ভেদ করে আমার চোখের জলের স্পর্শ হয়তো পৌঁছেছিল তাঁর বুকে। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—শাহজাদাগণ, তোমাদের এই বোনকে আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। দেখো, তার যেন কখনও বেইজ্জত না হয়। আমির-ওমরাহদের দিকে ফিরে একই কথা বললেন পিতা,—সুলতানকন্যার মান-ইজ্জত আপনাদের হেফাজতে রইল। আল্লা আপনাদের সহায় হোন। আমার চোখে জল। পরিচারিকারা আমাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু সুলতান চোখ বোঁজার পর উপরওয়ালাও বুঝি দিল্লির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। শুরু হল দরবারকক্ষ ঘিরে ষড়যন্ত্র। এপ্রিলের তপ্ত রাত্রি আরও তপ্ত সেদিন। সুলতানের শেষ ইচ্ছার কোনও সম্মান রক্ষার চেষ্টা করলেন না অমাত্যরা। কারণ, সুলতান যখন শেষ শয্যায় তখনই অতিশয় তৎপর হয়ে ওঠেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী। তাঁর নাম—শাহ তুর্কান। তিনিও ছিলেন পিতার মতোই একজন ক্রীতদাসী। তাঁর গর্ভে জন্মেছিল পিতার অনেক পুত্রসন্তানের মধ্যে একটি, রুকনউদ্দিন ফিরোজ। তাঁকে ঘিরে এই সন্তানের কৈশোর থেকেই স্বপ্নের জাল বুনে চলেছিলেন তিনি। দাস-দাসীদের সে-দিন স্বপ্ন দেখার অধিকার ছিল। চোখের সামনে স্বপ্ন পূরণের দৃষ্টান্তেরও খুব অভাব ছিল না। সুতরাং, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে শাহ তুর্কান জয়ী হলেন। পরদিন সকালে দেখা গেল ইলতুতমিসের সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসে আছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজ। চিকের আড়ালে শাহ তুর্কানের চোখে মুখে তৃপ্তির স্মিত হাসি। আর আমি? আমি অবাক হয়ে ভাবি, শেষ পর্যন্ত এই অপদার্থকে গদিতে বসালেন ওঁরা?—হায় আল্লা!

ওঁরা নন, ফিরোজকে গদিতে বসিয়েছিলেন আসলে ধূর্ত, ক্ষুধার্ত, লোভাতুর শাহ তুর্কান। ছেলের বেনামিতে নিজের হাতে ক্ষমতার বল্গা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, প্রথম চালে তিনি সফল।

আমার দুঃখ নেই। সিংহাসন না পেলেও আমি ইতিমধ্যে এমন একজনকে পেয়েছি যে আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। নাম তার—ইয়াকুত। সে একজন হাবসি ক্রীতদাস। পিতার নির্দেশেই সে দায়িত্ব নিয়েছিল আমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবার।

আজ যদি আমি একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়ে থাকি তবে সে ওরই জন্য। বয়স তার আমারই মতো, পনেরো-ষোলো। নিশ্চিত কুড়ির নীচে। পাকা আবলুস কাঠে গড়া যেন তার শরীর। দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, চওড়া কাঁধ, লম্বা লম্বা হাত, ছেনি কাটা নাক, পুষ্ট ঠোঁট, মাথায় ঘন কালো কুঁকড়ানো চুল, নরম মুখে টলটলে আয়ত দুটি চোখ। তার চলার ভঙ্গিতে দাসদের মতো কোনও জড়তা নেই, সে যখন হাঁটে তখন মনে হয় যেন হাবসিদের কোনও রাজতনয়। কিন্তু অন্য সময়, বিশেষ করে সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনত মূর্তিটি যেন ভীরু এক দাসের। আমি, ইলতুতমিস-কন্যা রাজিয়া নিজের অজান্তেই একদিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম তার কাছে।

এখন বুঝি সেটাই হয়েছিল আমার কাল। শাহ তুর্কানের কাছে এক সন্ধ্যায় প্রাসাদের বাগানে আমরা ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। দূরে প্রাসাদের এক গবাক্ষ থেকে সর্পিণী দেখেছিল আমাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্তি। তাঁর খোলা জানালা, এবং ছায়া-শরীর আমার চোখ এড়ায়নি। কিন্তু আমি ছিলাম বেপরোয়া। ঈর্ষাকাতর ওই নারীকে আমি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলাম। গদি পাই বা না পাই, ইয়াকুতকে চাই, এই ছিল সেই সন্ধ্যায় আমার পণ। ইয়াকুতের হাত ভয়ে শিথিল হয়ে আসছিল। আমি তাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলেছিলাম—ভয় কি ইয়াকুত, মৃত্যু তো একবারই হয়। দরকার হয়, আমরা দু'জন একসঙ্গে মরব। আমাদের খুন না করে শাহ তুর্কান আমাকে গদিহারা করেছিল এই যা।

একটা বছরও ঘুরল না। এপ্রিলে দিল্লির তখ্‌তে বসেছিল অপদার্থ ফিরোজ। শুধু অপদার্থ নয়, অত্যাচারী, ব্যাভিচারী, ন্যায়নীতিহীন ফিরোজ। নভেম্বরের শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল দিল্লি। কারণ, শাহ তুর্কান কথা রাখতে পারছেন না। ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে পুত্রকে সিংহাসনে বসানোই তাঁর একমাত্র সাধ ছিল না, তিনি পুরো রাজত্বটাই হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিষ-নজর ক'জন বেগমের প্রাণ হরণ করেছে, ইলতুতমিসের কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁর চোখ হারিয়েছেন। শাহ তুর্কানের সন্দিগ্ধ চোখ প্রতিদিনই নব নব শিকার খুঁজে নিচ্ছে। কারও আর জানতে বাকি নেই যে, ফিরোজ উপলক্ষ মাত্র, আসলে রাজত্ব চালাচ্ছে তার মা শাহ তুর্কান। তিনি ওমরাহদেরও পায়ের তলায় রাখতে চান। আর, তা করতে গিয়েই বিপত্তি। কারণ, ওমরাহ একজন নন, অনেক। এবং শাহ তুর্কান মাত্র একজন।

সুতরাং যা হওয়ার তাই হল। উষ্ণ দিল্লি দেখতে দেখতে তপ্ত হয়ে উঠল। রাজধানী যদি ধূমায়িত, বাইরে তবে দাউ দাউ বিদ্রোহের আগুন। আমির ওমরাহদের অতএব অবশেষে ইলতুতমিসের শেষ ইচ্ছার কথা মনে পড়ল। তাঁরা ফিরোজকে সিংহাসন থেকে টেনে নামালেন। তাঁর মাকে বন্দি করলেন। এবং আমাকে দরবারে আহ্বান করলেন। আমার তরফে দ্বিধা বা জড়তার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, আমি পিতৃইচ্ছা পূরণ করছি মাত্র। দ্বিতীয়ত, আমি জানি, আমি ফিরোজ নই। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার আত্মবিশ্বাস দিল্লির ওই মিনারের মতোই মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পিতা আমাকে রাজ্য শাসনে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, শিক্ষিত করেও তুলেছিলেন। সুতরাং, অন্দর থেকে পর্দা সরিয়ে আমি ধীর পায়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলাম। ওঁদের নির্দেশে প্রচলিত রীতিনীতি মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসলাম। আমার মাথায়, মুখে ওড়না নেই। অঙ্গে পুরুষের সাজ। মাথায় সুলতানি তাজ। কোমরে বাহারি নক্সাদার মণি-মানিক্যখচিত খাপে ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার। ওমরাহরা বিস্ময়ে হতবাক। তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলেন পিতা আমার ভুল করেননি। আপন কন্যাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তিনি ঠিকই করেছিলেন। তাঁদের সামনে বসা মেয়েটি প্রতি ইঙ্গিতে একজন প্রকৃত সুলতান। সুলতান রাজিয়াৎ-উদ-দিনের নামের সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি উপাধি—"জালাল-উ-দ্দিন।" দরবার শেষে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। কুর্নিশ করলেন ওঁদের নতুন সুলতানকে।

আজ থেকে আমি দিল্লির সুলতান। হিন্দুস্থানের অধিকর্তা। আজ আমার জীবনে দিনের মতো একটি দিন। রাতের মতো রাত। রাত্রে অলিন্দে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানের সুলতান আমি ইয়াকুতের হাত ধরে বললাম—এ বার তোমার ভয় ভাঙল তো জোয়ান?—ভয় আরও বেড়ে গেল সুলতান, মেঝেতে চোখ রেখে বলল ইয়াকুত। সে এখনও জানে না, আমাকে কী বলে সম্বোধন করা উচিত তার। আমি খিলখিল করে হেসে উঠি।—সুলতান?—বাদশা? আমি কি ইয়া দাড়িগোঁফওয়ালা মরদ যে আমাকে সুলতান বলে সম্বোধন করছ তুমি?—বাঁদি, আমি তোমার বাঁদি ইয়াকুত!—দূর, তা কি কখনও হয়?—আলবৎ হয়। হিন্দুস্থানের সুলতান যা করেন, তাই হয়। ইয়াকুবের দুটি হাত ধরে আমি তাকে কাছে টানলাম। সারাদিন আমি ছিলাম সুলতান, একবার, দিনমানে এই একবার বাঁদি সাজার নিশ্চয় অধিকার আছে আমার।

কিন্তু সে-অধিকার স্বীকার করতে রাজি হলেন না তুর্কি ওমরাহরা। তাঁরা একদিন সোজাসুজি বললেন,—না সুলতান যা খুশি তা-ই করার অধিকার নেই আপনার। প্রথমত, ইয়াকুত বান্দা, সে কেনা গোলাম। দ্বিতীয়ত, সে ভিন্ন জাত। ইয়াকুত তুর্কি নয়, সে আবিসিয়ান।—কেন, তুর্কিদের মধ্যে কি কোনও ইয়াকুত ছিল না সুলতান?—আমরা কি এতই অপদার্থ?—আমরা কি ইলতুতমিসের দরবারের কেউ নই?—তবে কেন এই অনাচার? মনে মনে ভাবলাম, সময়ে জবাব দিতে হবে ওঁদের। মুখের মতো জবাব।

ক্ষোভ। ঈর্ষা। প্রতিহিংসা। ষড়যন্ত্র শুরু হল। দিল্লির ওপরতলায় ঘরে ঘরে ষড়যন্ত্র। আকাশে চাঁদ, আর গরাক্ষে ঈর্ষাকাতর চোখকে সাক্ষী রেখে হিন্দুস্থানের সুলতান আমি যখন বাঁদি সেজে নিজেকে দু'হাতে তুলে দিচ্ছি এক বান্দার হাতে, হিন্দুস্থানের ভূত-পূর্ব ক্রীতদাসরা তখন ঘরে ঘরে দরজা এঁটে তাদের সুলতানকে রক্ষা করার নামে ষড়যন্ত্র আটছেন। ফলাফল হিসাবে প্রথমে দেখা গেল রাজধানীতে আচমকা এক ধর্মীয় বিদ্রোহ। এক হাজার মানুষ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একদিন হানা দিল দিল্লির বড় মসজিদে। ওরা নাকি—কিয়ামিৎ নামে একটি ইসলামি গোষ্ঠী। ওদের সঙ্গে যোগ

দিয়েছে মুলাহিদ নামে আর এক গোষ্ঠী। জানা গেল তাদের নায়ক নুরউদ্দিন নামে একটি লোক। আর তাকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন রাজ্যের উজির মোহম্মদ জুনাদি এবং তাঁর অনুচরেরা।

কিন্তু আমি রাজিয়া। আমি রাজকর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আমার হুকুমে বাদশাহী ফৌজ যাত্রা করল মসজিদের উদ্দেশ্যে। নুরউদ্দিন পরাজিত হলেন। অন্য নায়কেরা কেউ কেউ মারা গেলেন, কেউ কেউ বন্দি হলেন। যথারীতি দরবার বসিয়ে আমি বিচার করলাম বিদ্রোহীদের। কেউ কেউ ক্ষমা ভিক্ষা করে মুক্তি পেল, প্রকৃত অপরাধীরা মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হল। কেউ কেউ নির্বাসনে গেল। আমি রাজিয়া। আমি রাজধর্ম পালনে অবিচল।

কিছুদিন চারদিক নিস্তব্ধ। সবাই চুপচাপ। উজির নাজিররা স্বীকার করলেন, ইলতুতমিসের রাজত্বেও বিদ্রোহ ছিল। কিন্তু রাজিয়ার রাজত্বে সবাই বশ। তারই মধ্যে একদিন জরুরি বার্তা পাঠালাম আমি ইয়াকুতকে। কাল সকালে দরবারে হাজির দেখতে চাই আমি। অবশ্য একবার পরখ করে দেখতে চাই আমি। রাজত্বে এই শান্তি কতখানি স্থায়ী। আপাত শান্ত দিল্লিতে কোনও সুপ্ত অসন্তোষ আছে কি নেই।

পরদিন দরবারে আমি ঘোষণা করলাম,—এ বার থেকে জালালুদ্দিন ইয়াকুত সুলতানি অশ্বশালার প্রধান। আমি ওই পদে তাঁকে নিযুক্ত করলাম। আমার হয়ে নবাব ওয়াজির নিয়োগপত্র অর্পণ করলেন ইয়াকুতের হাতে। ইয়াকুত মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে সুলতানকে। আমি রাজিয়া মাথা নুইয়ে গ্রহণ করলাম সেই অভিবাদন। কিন্তু চোখ আমার ইয়াকুতের দিকে নয়, ওয়াজির সাহেবের দিকে। বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, সেখানে তখন চাপা আগুন। অন্য নাজির উজিররাও যেন বন্ধ কোনও ঘরে অসহায়ের মতো ঈর্ষার আগুনে পুড়ছেন। আমি মনে মনে হাসলাম। তবে আমার রাজত্বে না কি কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই!

দরবার ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই ক্রোধে ফেটে পড়ল গোটা সভাকক্ষ,—এ ভাবে আমাদের অপমান করার অর্থ কী? অচিরেই জানতে চাইলেন একদল। তাঁদের হাত তলোয়ারের বাঁটে। অন্য দল সওয়াল করলেন, এ ভাবে অবাধ্য হওয়া ঠিক নয়।—হাজার হোক, তিনি সুলতান এবং আমরা তাঁর নফর।—রাজিয়া বিবির নফর যাঁরা তাঁদের আমরা চিনি, বলেই তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন প্রথম দল। —রাজিয়ার রূপ তোমাদের বশ করতে পারে, আমাদের নয়।

ছোটখাটো বিদ্রোহ। আমি রাজিয়া। আমি সুলতান। আমার হাতে যেমন ইলতুতমিসের দেওয়া অধিকার, দেহে তেমনই যৌবন, মুখেও আমার দিগ্বিজয়ী হাসি। আমার মনে বল, মাথায় বুদ্ধি। ফলে আমির-ওমরাহরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল সুলতানের পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে। অলিন্দে দাঁড়িয়ে খাস দিল্লিতে, বলতে গেলে আপন অঙ্গনে সেই গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলাম আমি নিশ্চিত রাজিয়া। আমার পাশে তখনও উদ্বিগ্ন ইয়াকুত। সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে ফলাফলের অপেক্ষায়।

পরদিন পরাজিতের দলকে বন্দি করে হাজির করা হল দরবারে। আমি চিরকালের

রীতিমাফিক বিচার করলাম। কেউ ছাড়া পেলেন, কেউ মারা গেলেন, কেউ দেশান্তরী হলেন। অবকাশে ইয়াকুতকে আমি কাছে ডাকলাম—কি, রাজসরকারের অশ্ববাহিনীর প্রধান রক্ষক মহোদয়, এ বার নিশ্চিন্ত তো!—হ্যাঁ, সুলতান। আবছা অন্ধকারেও আমি যেন ইয়াকুতের ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসির ছোঁয়া দেখতে পেলাম।

ইলতুতমিসের অন্দরে, রাজিয়ার আন মহলে, হে পাঠক, রাত্রি সেদিন চপল ছিল। বিন্দুমাত্র রাজকীয় গাম্ভীর্য ছিল না এই বাঁদির কথাবার্তায়। ইয়াকুতের ওই হাসির ঝলকানি আমাকে পাগল করে তুলেছিল। আমি যেভাবে পারি, যতভাবে পারি, ওকে হাসাতে চেয়েছিলাম। কেন-না, শিশুর মতো সরল এই মুখটি হাসলে বড়ই সুন্দর দেখায়।

কিন্তু পরদিন সকালেই আমাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সুখের রাত শেষ। আবার দুঃসংবাদ। রাজ্যে আবার বিদ্রোহ। আমি উজিরকে ডেকে বললাম সেনাবাহিনীর ভার আমি নিজেই নিতে চাই উজির সাহেব। আমাদের সেনাপতি ছিলেন আমার এক বোনের, অর্থাৎ ইলতুতমিসের এক জামাতা জালালউদ্দিন। তিনি বললেন, সুলতান, তবে বেহস্তবাসী সুলতানের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে এই বান্দা? আমি বললাম—বেশ। আপনি রণসজ্জার আয়োজন করুন। দিল্লির বাহিনীর সঙ্গে অনুগমন করবেন দিল্লিশ্বর,—আমি।

সেটা ১২৪০ সালের অক্টোবরের কথা। বিরাট বাহিনী নিয়ে জালালউদ্দিন এগিয়ে চললেন সরহিন্দের দিকে। ইখতিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে সেখানে। সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে হাতির পিঠে আমি। আমার অঙ্গে যোদ্ধার বেশ। হাতির গা ঘেঁষে আমার পাশাপাশি চলেছে একটি সাদা তুর্কি ঘোড়া। জোয়ান ইয়াকুত যেন আজ ঘোড়ার চেয়ে টগবগে। মাঝে মাঝে আমার দিকভ্রম হয়। সামনের দিকে না তাকিয়ে থেকে থেকেই আমার চোখ চলে যায় ডাইনে, ওই সাদা ঘোড়াটির দিকে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে তার পিঠে সওয়ারের দিকে। কিন্তু কোথায় চলেছে ইয়াকুত? কোথায়ই-বা চলেছি আমি নিজে? লড়াইয়ের ময়দান। চারিদিকে উন্মত্ত সৈন্য। আমি সেই ভিড়ে দিকহারা। পলকে সাদা ঘোড়াটা হারিয়ে গেল আমার চোখ থেকে। উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করে আমি হাঁক দিলাম সৈন্যদের এগিয়ে যেতে। সহসা শত্রু-মিত্র যেন একাকার। কে আমার সৈন্য, কে আমাদের মিত্র, কারা অপর পক্ষ আমাদের দুশমন বুঝে উঠতে পারি না। আমি হাতির মাথায় অঙ্কুশে ঘা বসালাম। উদ্দাম মাতঙ্গের গলায়ও যেন রণধ্বনি। সহসা আমার চোখে পড়ল শত শত ঘোড়ার ক্ষুরে পিষ্ট হচ্ছে মাটিতে লুটিয়ে-পড়া ইয়াকুতের সাদা ঘোড়া। আমি লাফিয়ে হাতির পিঠ থেকে নেমে এলাম মাটিতে। আমার হাতে খোলা তলোয়ার।—ইয়াকুত!—ইয়াকুত! ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ইয়াকুতের মাথা কোলে তুলে নিয়ে ওর বুকে কান রাখলাম। কোনও সাড়া নেই। ওর মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস খুঁজলাম আমি পাগলিনী প্রায়। কোনও সাড়া নেই।—কিন্তু মনে আমার প্রশ্ন চিহ্ন,—কারা এ ভাবে কেড়ে নিল আমার ইয়াকুতকে। আমার হাতে খোলা তলোয়ার, চোখে জল।

সেই জল মুহূর্তে বাষ্প হয়ে উবে গেল। সেখানে আগুন। ইলতুতমিস-দুহিতার সেই মূর্তির সামনে দাঁড়ায় কোনও বিদ্রোহীর সেই সাধ্য নেই। আমি সৈন্যদের আদেশ দিলাম,—এগিয়ে চলো! কিন্তু কোথায় সুলতানি ফৌজ! চারদিকে শত্রুসৈন্য।

একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সৈনিক এগিয়ে এসে বললেন,—সেলাম সুলতানা। আপনার সৈন্যরা আপনাকে ত্যাগ করে দিল্লির পথ ধরেছে। আপনি কি এ বার এই মহাশ্মশান পরিত্যাগ করবেন না?—না। উত্তর দিলাম আমি। আমি এখনও দিল্লির সুলতান। তবে আমাদের বেয়াদপি মাপ করবেন সুলতান।—আপনি আমাদের হাতে বন্দি হলেন। ওরা আমাকে ইয়াকুতের কাছ থেকে জোর করে সরিয়ে দিল। তারপর রীতিমতো মর্যাদা দেখিয়ে নিয়ে গেল শত্রুশিবিরে। আলতুনিয়ার দুর্গে। আলতুনিয়া বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই বান্দা যতদিন জীবিত ততদিন আপনার অসম্মান হবে না এখানে। বাধ্য হয়েই তার কথায় আস্থা রাখতে হয় আমাকে। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার চিন্তায় একদিকে ইয়াকুত, অন্যদিকে রাজধানী দিল্লি। ইয়াকুতকে আর ফিরে পাব না আমি, কিন্তু দিল্লি? তাও কি চিরকালের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল আমার? ভাবি। আর ভাবি।

ও দিকে ষড়যন্ত্র করে যাঁরা আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেছেন তাঁরা নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পাকাপাকিভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে। তাঁদের কাছে আলতুনিয়া তখন অবান্তর, এ খেলায় তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। অচিরেই সে সংবাদ ভেসে আসে আলতুনিয়ার কাছে। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে, যার জন্য এই ষড়যন্ত্র, এই যুদ্ধ সেই গদিই যদি দখলে না আসে তবে কেন এই রক্তক্ষয়? রাজত্বহীন, মসনদহীন ইলতুতমিস কন্যাকে নিয়ে কী করবে এই ক্রীতদাস! তবে কি ওঁরা ভেবেছেন, রাজিয়াই তাঁর এই সফল ষড়যন্ত্রের একমাত্র পুরস্কার? আলতুনিয়া ভাবে। আর ভাবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক ইতস্তত করে একদিন সে বলেই ফেলল কথাটা। বলল, বান্দার অপরাধ নেবেন না সুলতানা। আপনিও একজন বান্দার কন্যা। এখনও আপনি অবিবাহিত। আসুন আমরা, শত্রুতা ভুলে গিয়ে দু'জনের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আপনার অসম্মতি না থাকলে আমি আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে রাজি। কথা দিচ্ছি, আপনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা আবার দিল্লি দখল করব। এবং দিল্লির তখতে বসাব, হ্যাঁ, ইলতুতমিস কন্যা, আপনাকেই। আমার সামনে সেদিন এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইয়াকুত, আমার ইয়াকুত আর ফিরবে না। দিল্লিকে হাতে ফিরে পাওয়া যায় কিনা দেখাই যাক না একবার সে-চেষ্টা করে!

সিরহিন্দের সেই দুর্গে আলতুনিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আমার। আমরা দিল্লি উদ্ধারের জন্য কাজে লেগে গেলাম। আলতুনিয়ার এক কথা,—সিংহাসন উদ্ধার করে তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া, এটাই হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। —সুলতানা রাজিয়াই আমার কাছে দিল্লিশ্বরী, আমি তার দাসমাত্র।

সুলতানার নতুন বাহিনী সাজিয়ে আলতুনিয়া একদিন দিল্লির পথ ধরল। পাশে

তার যোদ্ধৃবেশে রাজিয়া। স্বল্পকালের মধ্যে সে কী অবিশ্বাস্য দৃশ্যান্তর! ইয়াকুত উধাও। সাদা ঘোড়ায় এখন অন্য সওয়ার। সাদা ঘোড়ায় চড়েই পরম বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করল দুর্ধর্ষ আলতুনিয়া। তার তরবারির বিদ্যুত-ঝলকে ইয়াকুতকেই যেন দেখতে পান রাজিয়া। দু'জনের মধ্যে তফাৎ একটাই, আলতুনিয়া তুর্কি দাস, ইয়াকুত ছিল আবিসিনিয়ান। দ্বিতীয় আরও একটি তফাৎ আছে বটে, আমি মনে মনে ভাবি, কথায় কথায় নিজেকে এ ভাবে বান্দা বলত না ইয়াকুত। তার বশ্যতা ছিল আনত চোখে।

এ বারও শেষ রক্ষা হল না। সৈন্যদের একাংশ এবারও বিশ্বাসঘাতকতা করল। দিল্লি হাতে পেয়েও মুঠি শিথিল করতে হল হতভাগ্য আলতুনিয়াকে। আলতুনিয়া বন্দি হল। সঙ্গে আমিও। ফলে মধ্যযুগের সেই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে যা ঘটা সম্ভব তাই হল। ওরা প্রথমে দুই বন্দিকে ঘিরে উল্লাসে মাতল। তারপর তিলতিল করে হত্যা করল আমাদের দু'জনকে। চার বছরের মধ্যে খতম হয়ে গেল ইলতুতমিস-কন্যার রাজত্ব।

তাতে কিছু যায় আসে না। হে এ কালের পাঠক, তোমরা জানো দিল্লিতে নানা বংশের নানা মানুষ সিংহাসনে বসলেও আমি ছিলাম একমাত্র নারী। মাত্র উনিশ বছরের একটি তরুণী। মধ্যযুগের সেই আলো-আঁধারি দিনগুলোতে চরাচর যখন অস্থির, মানুষ যখন রক্তাক্ত তলোয়ার আর শেকল ছাড়া কিছু জানে না, চারদিকে যখন দুর্বলের সমাধিতে পত পত করে উঠছে সবলের রক্তাক্ত পতাকা, ন্যায়-অন্যায় বোধ যখন অস্পষ্ট, মাৎস্যন্যায় যখন বলতে গেলে একমাত্র ন্যায়শাস্ত্র, উদ্ধত পুরুষতন্ত্র আর রূঢ় কর্কশ পরুষ বাক্য যখন বীরত্বের গরিমা হিসাবে বন্দিত আমি সেই পূর্ব-পৃথিবীর এক কন্যা। আমার গর্ব এই বিপরীত পরিবেশেও আমি ছিলাম সম্পূর্ণ হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত। তথাকথিত পুরুষালি ভ্রূকুটি কোনওদিন বিচলিত বা বিড়ম্বিত করতে পারেনি আমাকে। পোশাকে আশাকে, চাল-চলনে, কথোপকথনে কোনওদিন কোনও জড়তা ছিল না আমার। নারীসুলভ নমনীয়তা অবশ্যই আমার ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল রাজকীয় গাম্ভীর্য ও কাঠিন্য।

তোমরা সমকালের একমাত্র ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের তাবাকাত-ই-নাসিরির পাতা খোলো। দেখবে, সেখানে তিনি আমাকে আখ্যা দিয়েছেন—মহান সুলতানা। আমার বুদ্ধি, বিবেচনা, বিদ্যোৎসাহিতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাহিতৈষণা সব কিছুরই মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছেন তিনি। বলেছেন, আমি যোদ্ধা হিসাবেও ছিলাম সাহসী। এক কথায় রাজা-বাদশার প্রয়োজনীয় সব গুণই নাকি ছিল আমার। কিন্তু তিনি খেদ করেছেন, এই সব গুণাবলী থাকলেই-বা কী হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি জন্মেছিলেন নারী হয়ে। আমার গর্ব কিন্তু বিশেষ করে এই নারীত্বের জন্যই।

পুরানো দিল্লির বুলবুলিখানায় আমার কবরে দুটো সাধারণ পাথর দিয়ে যাঁরা ভেবেছিলেন দুঃসাহসী সেই যুবতীকে যুবতী-ধর্ম ভুলে রাজদণ্ড হাতে তুলে নেওয়ার

অপরাধে চরম শাস্তি দেওয়া হল তাঁরা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি, এতকাল পরেও বেঁচে থাকবে ক্রীতদাস ইলতুতমিসের কন্যা এই রাজিয়া।

কান পাতলে এখনও শোনা যায় গুঞ্জন। কেউ বলেন—রাজিয়া সুলতানের মতো সুলতান ছিলেন। কেউ বলেন, রাজিয়ার একমাত্র ক্রটি তিনি নারী ছিলেন। কেউ বা আবার বলেন—বান্দার মেয়ে রাজিয়া নিজেও ছিলেন বাঁদি। ইয়াকুতের বাঁদি। হ্যাঁ, শাহজাদী আমি সুলতান এবং বাঁদি দুই-ই ছিলাম। আমি একদিকে ছিলাম হিন্দুস্থানের সুলতান, অন্যদিকে এক বাঁদি। ইয়াকুতের ভালবাসার বাঁদি।

"রাজিয়া, আমিও একজন দাস। তবে কোনও দাসের ঘরে আমার জন্ম হয়নি। জন্মেছিলাম একজন সাধারণ মানুষের সংসারে। সাধারণ, কিন্তু স্বাধীন। শুনবে আমার জবানবন্দি? তবে শোনো।

আমার পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল তুরস্কে। সেখানে বায়াজিদ নামে এক শহর ছিল। শহর থেকে আট ক্রোশ দূরে আরজাত নামে গ্রাম। সেই গ্রামেই ছিল আমাদের ঘর। সেখানেই আমার জন্ম। ছেলেবেলায় আমার নাম কী ছিল আজ আর তা মনে নেই। মা-বাবার নামও ভুলে গেছি।

দিল্লির উজির নবাব জুলফিকারউদ্দৌলার সঙ্গে এখন আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফলে পারস্যের অনেক খানদানি মানুষের সঙ্গেও আমার পরিচয়। মাঝে মাঝে গণ্যমান্য তুর্কিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। ওঁদের দেখলে আমার নিজেদের ঘরের কথা মনে পড়ে যায়। নবাবও কখনও কখনও আমার দেশের কথা, জাতের কথা জানতে চান। কেউ কেউ বলেন, আমি আর্মেনিয়ান হতে পারি। কারও কারও ধারণা আমি খারজি। কেউ-বা মনে করেন আমি খুর্দ। আবার অনেকের অভিমত, আমি ইসমালু। সন্দেহ নেই, এই সব উপজাতির বাস যে এলাকায় আমি সেখান থেকেই এসেছি। লোকেরা তাই মনে করেন আমি ওদেরই কেউ। মা-বাবা থেকে আমি বিচ্ছিন্ন সেই ছেলেবেলা থেকে। কতটুকুই-বা বয়স তখন আমার? ফলে জাতি-পাতি-আদি কিছুই মনে নেই। নবাব এবং অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, যেহেতু ইসলাম ধর্মে আমার আসক্তি গভীর, তাই মনে হয় আমি বোধহয় জন্মেছিলাম কোনও মুসলমানের ঘরে।

পারস্যরাজ নাদির শাহ আর তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে যখন লড়াই বাঁধে সেই সময়কার কথা। নাদিরের বাহিনী আমাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে কান্নার রোল। হাহাকার। লুটতরাজ, আর আগুন। আমার মা এবং আমার বড় ভাই আমাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। গোটা গ্রামের উপর তখন সৈন্যদের জুলুমবাজি চলছে। আমাকে নিয়ে মা আর ভাই যখন ভয়ে ছুটোছুটি করছেন তখন হঠাৎ একজন ঘোড়সওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। ভাইয়ের কোল থেকে সে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মা আর ভাই বিলাপ করতে করতে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলেন। ভয়ে আমিও চিৎকার করে কাঁদছি। তাই দেখে আর একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে তলোয়ারের এক ঘা বসিয়ে দিল আমার ভাইয়ের

ঘাড়ে। মা ছুটলেন তাঁর দিকে। সেই সুযোগে ঘোড়সওয়ার আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে পালিয়ে গেল। এরপর আমার মায়ের কী হল, কী হল আমার ভাইয়ের কিছুই আমি জানি না।....."

জবানবন্দি বন্ধ করে এ বার মানুষটির পরবর্তী কাহিনী শোনা যাক। তাঁর নিজের জবানির বদলে শ্রোতাদের বয়ানে, এই যা।

অসহায় মা আর ভাইয়ের কাছ থেকে তলোয়ারের বলে কেড়ে আনা সেই শিশু সেদিনের পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতের অসংখ্য দাসের একজন। মাত্র এক ঘণ্টা আগে তাকে লুঠ করে আনা হয়েছে, সুতরাং বালকের কান্না কিছুতেই থামে না। তাকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না। কিন্তু স্বল্পকালের জন্যে। কেন-না, শিশু দাসের কান্নার সময় অল্প, তার চোখের সামনে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। অবাক-করা নানা দৃশ্য।

তিনদিন পরে ওরা নাদিরের শিবিরে পৌঁছল। নাদির শাহ হুকুম দিলেন বন্দিদের তাঁর সামনে নিয়ে আসতে। তা-ই করা হল। নাদির অনেককে মুক্তি দিয়ে দিলেন। আমাকে যে ধরে এনেছিল সে-লোকটি কিন্তু আমাকে লুকিয়ে রাখল। নাদির শাহের সামনে আমাকে হাজির করা হল না। ওই লোকটি ছিল খারোনজি বেগের ভাই। খারোনজি ছিলেন একশো ঘোড়সওয়ারের অধিপতি। তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে নিলেন। বললেন, আমি পুত্র হিসাবে ওকে লালন-পালন করব। মানুষটি আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। দু'জন শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য। আমার নাম রাখলেন তিনি—জাকির। মাস কয়েক পরে তিনি ফের লড়াই করতে চলে যান। ফিরে এসে বিয়ে করেন। এতদিন তিনি ছিলেন অবিবাহিত। বিয়ের পরও খারোনজির আমার প্রতি ভালবাসায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি। আমার কাছে তিনি বিয়ের আগে যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন। সত্যি বলতে কী, তাঁর ভালবাসা আমাকে বাপ-মা'র কথা বিলকুল ভুলিয়ে দিল।

অতৃপ্ত শিশু-দাস তৃপ্তির স্বাদ পেল। বোখারার জনৈক উজবেকের ঘরে নতুন করে স্নেহের কোল পেয়েছে সে। দুঃখী মানবশিশুর সামনে যে সুখের সড়ক। কিন্তু দু'বছর পরেই আবার ভাগ্যবিপর্যয়। নাদির শাহ খুন হলেন (৯ জুন, ১৭৪৭)। তাব্রিজ শহরে সাম নামে এক ফৌজি নায়ক নিজেকে ঘোষণা করে বসলেন "পারস্যরাজ"। খারোনজি তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেন। নিজের দাসদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সাম-এর দাসত্ব বরণ করে নিলেন। ও দিকে আরসালান খাজ নামে এক আমির যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সাম-এর বিরুদ্ধে। আমির জাতে উজবেক। ফলে লড়াই শুরু হওয়া মাত্র দেখা গেল খারোনজির উজবেক সেনারা হাত মিলিয়েছে নিজেদের জাতিভাইদের সঙ্গে। সেই অপরাধে খারোনজির মাথা কাটা পড়ল। সাম-এর অনুচরেরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল তাঁর স্ত্রীকেও। বেঁচে রইল শুধু ওঁদের পালিতপুত্র সেই দাসবালক জাকির। মৃত্যর আগে খারোনজি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাম-এর লোকেদের,—এই বাচ্চাটিকে তোমরা বাঁচিয়ে রেখো। সে আমার ছেলে নয়, বায়াজিদের যুদ্ধে আমি ওকে পেয়েছিলাম।

ওরা কথা দিয়েছিল—তা-ই হবে। জাকির তাই মরতে মরতে বেঁচে যায়। পরক্ষণেই আবশ্য বাঁচতে বাঁচতে আবার মরার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত সাম হেরে গেলেন। জয়ী হলেন আরসালান খান। সুতরাং, জাকিরকে নিয়ে সাম-এর অনুচরেরা সমস্যায় পড়ল। স্থির হল ওকে মেরে ফেলাই সঙ্গত। জাকির তার আগেই সুযোগ বুঝে পালাল। কিন্তু পালিয়ে সে যাবে কোথায়? এ বার যাঁদের হাতে পড়ল বালক তাঁরা বন্ধু বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। তাঁদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে জাকির হাজির হল এক অচেনা মুলুকে। সামনে ছিল সমুদ্র, এটুকুই মনে আছে তার। সেখান থেকে মুলতানে। মুলতান থেকে তুর্কি বাহিনী চলল লাহোরের দিকে। সঙ্গে বালক জাকির। পথে ঘোড়ার অভাব দেখা দিল। পথের বোঝা কমাবার জন্য ওর প্রভু হাসাজ বেগ জাকিরকে দান করে দিলেন সহযাত্রী আউরেজ বেগ নামে এক ফৌজিকে। এই মানুষটি ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর। একটা গাধার পিঠে চড়ে জাকির চলল তাঁর সঙ্গে। সবারই গন্তব্য নাকি লাহোর। কিন্তু কোথায় লাহোর? কে আছেন সেখানে? সেখানে জীবনই-বা কেমন? এ সব প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই।

অবশেষে স্বপ্নের লাহোর। দীর্ঘ দুর্গম পথ পেরিয়ে তুর্কি ফৌজিদের এই দল লাহোর পৌঁছেছে লড়াই করতে নয়, কাজের সন্ধানে। লাহোরে তখন মইনুলমুলুক-এর রাজত্ব। তাঁর আর এক নাম মীরমন্নু। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা। ওরা ঠিক করল সুযোগ দিলে পঞ্জাবের এই শাসনকর্তার বাহিনীতেই যোগ দেবে। কিন্তু কেমন করে মিলবে সেই সুযোগ? শহরে পৌঁছেই ওরা একজন দরকারি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তিনি পরামর্শ দিলেন, তোমরা স্বয়ম মীরের সঙ্গে দেখা করে তোমাদের আর্জি জানাও। তবে হ্যাঁ, দরবারে যাওয়ার সময় সঙ্গে কিছু উপহার নিয়ে যাবে। খবরদার, শূন্য হাতে নয়। ওরা ভেবে পায় না কী উপহার দেওয়া চলে পঞ্জাবের অধিপতিকে। সঙ্গে তো ধনদৌলত কিছু নেই। সুতরাং, অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক হল, এই ছোকরাটিকেই বরং উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে দেওয়া যাক। দলে আর দুটি বালক ছিল। স্থির হল, জাকিরের সঙ্গে ওদেরও দেওয়া হবে উপহারের ডালিতে। পরদিন ওরা নিবেদিত হল মইনুলমুলুকের পদযুগলে। তুরস্কের বালক ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছাল পঞ্জাবে। শুরু হল নতুন কাহিনী।

সে-কাহিনী শোনার আগে একটি দরকারি কথা। মধ্যযুগের কোনও ক্রীতদাসের জবানবন্দি দৈবাৎ শোনা যায়। ভারতের এই দাস-কাহিনী সেদিক থেকে বোধহয় অনন্য। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু কিছু দাসের আত্ম-কাহিনী শোনা গিয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় তা গোনাগুনতি। আর সব কাহিনী বলতে গেলে পরের মুখে ঝাল খাওয়া। আঠারো-উনিশ শতকে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান লুঠ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'-একজনই মাত্র দুনিয়াকে শুনিয়ে যেতে পেরেছেন নিজেদের কাহিনী। একজনের কথা মনে পড়ে। তাঁর নাম জোরবেন সোলোমন। সেনেগলের উপত্যকায় এক মুসলিম দলপতির ঘরে তাঁর জন্ম। ১৭৩০ সালে সাহেবদের কাছে দাস বিক্রি করতে গিয়ে তিনি নিজেই চালান হয়ে যান দূর ম্যারিল্যান্ডে। সেখান থেকে পালাতে গিয়ে বন্দি

হয়েছিলেন কারাগারে। জেলখানায় বসে হিজিহিজি অক্ষরে নিজের যন্ত্রণার কথা লিখতে গিয়ে রক্ষীদের কাছে ধরা পড়ে যান সোলোমন। জানাজানি হয়ে যায় লোকটি লেখাপড়া জানে। সেই আরবি হরফই মুক্তিদূত হয়ে উদ্ধার করেছিল তাঁকে। এক ইংরেজ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাঁকে ছাড়িয়ে এনে তুলে দিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে পণ্ডিতদের হাতে। বিদ্যার জন্য দাসের সেদিন সেখানে বড়ই সমাদর। বিদেশে খ্যাতি, সম্মান, বন্ধু সব লাভ করার পরও কিন্তু সোলোমন অতৃপ্ত। তাঁর একমাত্র অনুরোধ—একবার তোমরা আমাকে আমার নিজের গাঁয়ে নিয়ে চলো। সোলোমন শেষ পর্যন্ত বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় ফিরে এসেছিল নিজের দেশে, আপন গাঁয়ে। কিন্তু ক'জনের আর সেই ভাগ্য হয়? আর এক দাসের আত্মকথায়ও পাতায় পাতায় অন্তর্জ্বালার কথা। তাঁর নাম—ওলাউদ ইকুউথানো, ওরফে গোস্তাভাস ভাসা। জীবনের প্রথম সমুদ্র, প্রথম জাহাজ দেখার পর তাঁর মন্তব্য: আমার হাতে যদি দশ হাজার পৃথিবী থাকত, তবে তার বিনিময়ে আমি আমার দীনহীন দুঃখময় গ্রামের জীবনেই ফিরে যেতাম। দশ পৃথিবীর বিনিময়ে বেছে নিতাম একটি গ্রাম। কিন্তু তা আর সম্ভব হল কই!

আশ্চর্য এই, প্রায় সমকালের দাস জাকিরের আত্মকথায় অতৃপ্তির কথা নেই বললেই চলে। জাকির নামটি অবশ্য বেশিদিন ছিল না তার। মইনুলমুলুক তার নাম রেখেছিলেন—তৈসুরা—তৈমুররাস। সে-নামটিও রক্ষা করতে পারেনি বেচারা। আহমেদ শাহ আবদালির পুত্র তৈমুরশাহ যখন পরবর্তীকালে গদিতে বসেন তখন দাস তৈমুরের নতুন নাম জোটে—তামাস খান। এই নামেই অতঃপর পরিচিত সে। তার আত্মজীবনীর নামও—"তামাসনামা।" অবশ্য কখনও কখনও ছদ্মনাম নিয়েছে সে— "তামাস মিসকিন।" বালক দাস এখন যুবক। এবং তাকে আর দাস বলে চেনাই যায় না। সুতরাং, সে সম্ভ্রমের দাবি করে। অতঃপর তাঁকে মান্য ব্যক্তি হিসাবেই সম্বোধন করা সঙ্গত। তিনি এখন না দীন, না হীন। তাঁর পুরো নাম এখন—"মুখামউদ্দৌলা ইতেকাদ জং তামাস বেগ খান বাহাদুর।"

মইনুলমুলুক দৈনিক এক তঙ্কা করে মাহিনা দিতেন ওঁকে। তা ছাড়া তিনি ভালবেসে তামাসখানকে দিয়েছিলেন একটি তলোয়ার ও কোমর বন্ধনী আর একটি সোনার আংটি। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন তামাস খানের কোনও অসুবিধা ছিল না। হঠাৎ, ১৭৫৩ সালে মারা গেলেন তিনি। তামাস তাঁর বেগমের প্রিয় দাস হলেন। বেগমের নাম—মুঘলানি বেগম। ভারতের ইতিহাসে তিনি পরিচিত রমণী। বেগমের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর বান্দা তামাস খান। আহমদ শাহ আবদালির ভারত আক্রমণ। লাহোর ও দিল্লিতে নানা উত্থান-পতন। বেগমের ভাগ্য বিপর্যয়। ১৭৫৮ সালে মারাঠারা যখন লাহোর দখল করে তখন এই তামাস বেগই তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল শহরের চাবি। ১৭৬১ সালে পানিপথে যখন যুদ্ধ চলছে তামাস খান তখন জম্মুতে। মুঘলানি বেগমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তাঁর পরের বছর ১৭৬২ সালে। কিছুকাল পঞ্জাবে কাটিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিয়ে অবশেষে পৌঁছালেন তিনি রাজধানী দিল্লিতে।

সেখানে তিনি দিল্লির উজিরের অধীনে চাকুরি নিলেন। ১৭৭২ সালে সম্রাট শাহ আলম ফিরে এলেন রাজধানী দিল্লিতে। তামাস খান তখন তাঁর প্রধান উজির নাফজ খানের অধীনে একজন সেনাপতি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধনদৌলত সবই এখন তাঁর করায়ত্ত। ১৮০০ সালে ভাগ্যবিড়ম্বিত এই মানুষটি যখন দেহরক্ষা করেন তখন ছোটবড় সব দরবারি; এমনকী শহরের গন্যমান্য নাগরিকরা সবাই জানেন, তামাস খান কে। কিন্তু আদিতে কী ছিলেন তিনি সে কাহিনী জানতেন তাঁর আত্মকাহিনীর পাঠকেরাই। সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা ব্যাপী সেই পারসিক গদ্যের সার কথা,—আমি একজন দাস ছিলাম। তৃপ্ত দাস।

অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাজনৈতির পটভূমিতে এই বইটির গুরুত্ব যদুনাথ সরকার থেকে শুরু করে অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। "আ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ"-এর বিখ্যাত লেখক হালেদ বইটির ইংরেজি সারানুবাদ করেছিলেন। মারাঠী ভাষায়ও বইটির সারানুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। এ কালে ইংরেজি অনুবাদও লভ্য। আমাদের এই কাহিনীতে সেসব তথ্য খুব প্রাসঙ্গিক নয়। তার চেয়ে দর্শনীয় বোধহয় তামাস খানের বর্ণাঢ্য জীবন। পাঠকের মন চলে যায় দূর অতীতে—গ্রাম থেকে লুঠ করে আনা একটি শিশু যখন নিজেই কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক নগর থেকে অন্য নগরে। কখনও সে মৃত্যুর মুখোমুখি। কখনও-বা ভেসে চলেছে সুখের দরিয়ায়। ভারতে সময় তখন বড়ই অস্থির। সবই এখানে অনিশ্চিত। তামাস খানের কাছেও নিশ্চয় আগামীকালের পৃথিবী ছিল হিন্দুস্থানের বর্ষার আকাশের মতো। রোদ উঠবে না কালো মেঘে ছেয়ে থাকবে আকাশ, কে বলতে পারেন? তারই মধ্যে এ দেশের নরম জমিতে ধীরে ধীরে শিকড় বিস্তারের সাধনা চালিয় গেছেন আগন্তুক। বিস্ময়কর তাঁর জীবনের অভিযাত্রা। এ বার তাঁর মুখেই বরং শোনা যাক তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

"লাহোর থাকা কালেই আমি উড়তে শিখেছিলাম। মইনুলমুলুকের মৃত্যুর পর আমাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিলেন না। দলের কেউ কেউ নিজেদের ঢাল তলোয়ার আর ঘোড়া বেচে দিল। আমি অবশ্য তাতে রাজি হইনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমারও পতন হল। আমি বাইজিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মোতি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ভালবাসা হল। ফলে আমার যা কিছু ছিল কয়দিনের মধ্যেই তা উড়ে গেল।

মুঘলানি বেগম লাহোরেই বলতে গেলে একরকম জোর করেই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিবিকে নিয়েই কোনও মতে সংসারে ধর্ম পালন করছিলাম আমি। কিন্তু আমার প্রভুপত্নীর চাল চলন যেন অন্যরকম ঠেকে আমার কাছে। একদিন তিনি আমাকে তাঁর মহলে ডেকে পাঠালেন, বললেন, ভেতরে এসো। আমি বিনতভাবে উত্তর দিলাম আপনার মহল অতিশয় পবিত্র স্থান। এই গোঁফদাড়ি নিয়ে আমার কি সেখানে প্রবেশ সঙ্গত হবে। তাঁকে আমি বোঝাতে চাইলাম,—আমি জোয়ান মরদ।

এ ভাবে নিজের ঘরে তাকে ডাকতে নেই। আর একদিন পরিস্থিতি আরও গুরুতর। আমাকে তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেগমকে সেলাম জানিয়ে আসতে হয়। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে বেগম এমন ভাবভঙ্গি করতে লাগলেন এককথায় যা অশালীন। কথাচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়ে কোনও মতে আমি পালিয়ে আসতাম। যখন জানতে পেলাম মুঘলানি বেগম শাহবাজ নামে একটি লোকের সঙ্গে গোপনে ঘর করছেন, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে প্রভুপত্নীকে ভর্ৎসনা করতে হয়। বেগম পরে নিজেই কবুল করেছেন—আমার সামনে নিজেকে কখনও কখনও মনে হয় তাঁর—একজন বাঁদি তিনি। —তোবা!—তোবা!"

বেগমের সঙ্গে যুগপৎ ভালবাসা এবং ঘৃণার সম্পর্ক তাঁর দাসের। ক্রুদ্ধ বেগম বহুবার ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার সঙ্কটকালে কাছে ডেকে এনেছেন। ওঁদের দু'জনের শেষ দেখা দিল্লিতে। তামাস তখন সেখানে একজন মস্ত লোক। আর বেগম সমাজহীন, সহায়হীন একজন সাধারণ মহিলা মাত্র। তাঁর এই দুরবস্থার খবর শুনে তামাস খান তাঁর জন্য বেগমোচিত বন্দোবস্ত করে তাঁকে আশ্রয় দেন। সেখানে কিছুকাল পুরানো দাসের সেবা ভোগ করে বেগম চলে যান জম্মু। সেখানেই তাঁর মৃত্যু।

তামাস খানের দীর্ঘ আত্মজীবনী শেষ হয়েছে ১৭৮২ সালে পৌঁছে। তার এগারো বছর পরে ১৮০৩ সালে তাঁর প্রয়াণ। কিন্তু বলার মতো যা কথা ছিল তাঁর তহবিলে সবই ফুরিয়ে গেছে বইয়ের শেষ পাতায়। সেখানে "তামাম শোধ।" সক্রিয় জীবনেও। তৃপ্ত দাস লিখছেন,—

> চৌত্রিশ বছর বয়স হল আমার। তখন প্রথম বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে আমার বারোটি ছেলেমেয়ে জন্মেছিল। তার মধ্যে বেঁচে আছে চারটি পুত্র আর তিনটি কন্যা। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল দুটি পুত্র সন্তান। তাদের মধ্যে বেঁচে আছে একজন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। সেটা ১৭৭০ সালের কথা। লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে আসছি আমি। পরিবার পরিজনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই। বাধ্য হয়েই প্রবাসে বিয়ে করে ফেললাম এক কাবুলি মুঘলের কন্যাকে। দিল্লিতে আমি একটি বাড়ি কিনেছিলাম। সেই বাড়িটি ছিল খুবই ছোট। সুতরাং, আশপাশের কয়টি বাড়ি কিনে সেখানে গড়ে তুললাম মস্ত একটি বাড়ি। তখন শহরের বাইরেও অনেক জমিজমা আমার। সেখানে ফুল-ফলের বাগিচা। জীবৎকালেই ছেলেমেয়েদের জন্য সুবন্দোবস্ত করে ফেললাম আমি। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে বিয়ে দিয়েছি আমি খানদানি ঘরে। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছি বাড়ি আর নগদ টাকা পয়সা। সেই সঙ্গে কারও কারও জন্যে ব্যবস্থা করেছি দরবারে চাকুরি। সকলেরই আছে ঘোড়া এবং নফরের বহর। দাস দাসী।

বাবার দেওয়া ওই ঘোড়ায় চড়ে সেই এলোমেলো দিনগুলোতে কেউ কেউ হয়তো

সৈনিকের বেশে হানা দিয়েছিল হিন্দুস্থানের কোনও গাঁয়ে। কিংবা গঞ্জে। কে জানে, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো মা-বাবার কোল থেকে কেড়ে এনেছিল কোনও মানবশিশু। ঠিক যেমন করে একদিন কেড়ে আনা হয়েছিল শিশু তামাসকে। সেদিনের পৃথিবীতে সবই সম্ভব।—তাই না? তবে তামাস খানের একটি পুত্র যে সে-পথে যাননি, সেটা আমরা নিশ্চিত জানি। তাঁর নাম সাদাত ইয়ার খান রঙিন (১৭৬৩-১৮৩৫)। তাঁর কালে উর্দু ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তিনি।

আমি আনারকলি। তামাস খান ছিলেন ক্রীতদাস। আমি ক্রীতদাসী। আমরা সমকালের মানুষ নই। আমাদের দু'জনের কালের মধ্যে প্রায় দুই শতকের ফারাক। আমি তাঁর অনেক আগেকার মানবকন্যা। তাঁর মতো সুখ আমার কপালের লিখন ছিল না। আমি এক অসহায় দুঃখী ক্রীতদাসী। শুনতে পাই, হিন্দুস্থানের মানুষ এখনও নাকি চোখের জল ফেলেন এই দুঃখী বাঁদিটির জন্য। তোমরা অনেকেই হয়তো আমার কাহিনী জানো। জানলেও আর একবার শুনলে ক্ষতি নেই। মানুষ যে মানুষের প্রতি কতখানি নির্দয়, নিষ্ঠুর হতে পারে তার এক নিদর্শন আমি। আমি এই আনারকলি।

লাহোরে একটি বাজার ছিল। নাম—আনারকলি বাজার। একটি সাজানো বাগান ছিল। তার নাম—আনারকলি বাগ। যুগ যুগ ধরে মানুষ সে-বাজারে কেনাকাটা করেছে। কিন্তু কেউ জানতেন না, কেন এই নাম? কে এই আনারকলি—ডালিমের কুঁড়ি? শাজাহানের তনয় দারাসিকো তাঁর "শাকিনাতুল আউলিয়ায়" লিখে গেছেন শাহানশা আকবরের বাগ-বাগিচার শখ ছিল। লাহোরের চারপাশে তিনি অনেক বাগবাগিচা সাজিয়েছিলেন। কে জানে, তারই একটি হয়তো আনারকলি বাগ। আর তার কাছাকাছি বলেই এই বাজারই আনারকলি বাজার।

এই লাহোরেই ইরাবতী তীরে আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের শিলাপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে এখনও রয়েছে একটি স্মৃতিসৌধ। কোনও নাম-না-জানা বাদশাজাদির সমাধি হিসাবেই হয়তো লোকেরা এক সময় দেখতে আসত সেটি। পরবর্তীকালের সম্রাট জাহাঙ্গীরের গৌরব নিশ্চয় তাতে বেড়েই যেত।

কেউ কেউ বলেন ইরাবতী তীরে যাঁর দেহ ধারণ করে এই সুদৃশ্য সৌধ, তাঁর আসল নাম সরিফুন্নিসা। তিনি আফগান সুলতানদের ঘরের কন্যা। বাদশাহ আকবর একবার আফগানিস্তান সফর করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর যুবরাজ সেলিম। সরিফুন্নিসার রূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। বাদশাহ অমত করলেন না। স্থানীয় শাসক, সরিফুন্নিসার পিতাও সানন্দে সম্মতি জানালেন। কাবুলেই বিয়ে হয়ে গেল ওঁদের। সেলিম নববধূ নিয়ে সাড়ম্বরে লাহোর ফিরলেন। অচিরেই সরিফুন্নিসার যৌবন কবি করে তুলল বাদশাজাদাকে। পত্নীর নাম দিলেন তিনি—আনারকলি। ডালিম ফুল বা ডালিম ফুলের কুঁড়ি।

কিন্তু নূরজাহানের মতো কোনওদিনই প্রস্ফুটিত পুষ্পের গৌরব লাভ করতে পারেনি সেই আফগান কন্যা। ১৫৯৮ সালে বিয়ের পর যুবরাজকে একটি মাত্র সন্তান

উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন আনারকলি। যুবরাজ অঝোরে কাঁদলেন। তারপর গড়ে তুললেন এই স্মৃতিসৌধ। কেউ কেউ বলেন কাহিনীটি সত্য, কিন্তু শাহজাদির পরিচয়টি নয়। তাঁরা বলেন, লাহোরে যে-সুন্দরীর মরদেহ বুকে ধারণ করে এই আশ্চর্য স্মৃতিসৌধ তিনি আফগানদের দেশের কেউ নন। তাঁর নাম—সাহিব-ই-জামাল। তিনি আগ্রার কোনও অমাত্য-দুহিতা। এক সন্ধ্যায় মীনা বাজারে সেলিমের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন মেয়েটি। নওরোজে আয়োজিত সেই সুন্দরীর হাটেই তিনি মনে মনে নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন তাঁকে। যুবরাজ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন সাহিব-ই-জামালের পিতার কাছে। তাঁর তরফে অসম্মতির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দুই তরফেরই জানা ছিল সম্রাটের অনুমোদন মেলা ভার। কেন-না, সেই ওমরাহটির প্রতি তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং, গোপনেই সাদি হয়ে যায় যুবতী সাহিব-ই-জামাল আর যুবরাজ সেলিমের। এই কন্যাই লাহোরের এই স্মৃতিসৌধের তলায় শায়িত। নাম তাঁর আনারকলি নয়। পরবর্তীকালে সিংহাসনে বসে গোপন বিবাহকে আইনসম্মত করে নিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর। সাহিব-ই-জামালের দরবারি নাম তখন—মালিকা-ই-আলিয়া-সাহিব-ই-জামাল। কোনও আনারকলি নয়, ইনিই এই কবরে অধিষ্ঠিত নারী।

তবে কোথা থেকে শতশত বছর পরেও হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে নিশাচর পাখির কর্কশ ধ্বনির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে এই প্রশ্ন—কে ও—কে ও? কোথা থেকে পরক্ষণেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—আনারকলি! আনারকলি! মধ্যযুগের অন্ধকারে সে-এক বীভৎস রজনীর উপাখ্যান। কি পুবে, কি পশ্চিমে, মধ্যযুগে আলো কম, অন্ধকার ঘন। মানুষের প্রতি মানুষের উদারতা ও সহনশীলতার কাহিনীর যেমন সেখানে অভাব নেই, তেমনই নিষ্ঠুরতার কাহিনীও রাশি রাশি। এক গির্জার বিচার ও শাস্তির ঘটনাবলী যাকে বলা হয় "ইনকুইজেশন"—শুনলে এ কালে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি শিউরে না উঠবেন। স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কত না প্রস্তুতি, যান্ত্রিক ও মানবিক পীড়নের বন্দোবস্ত! সে-সব উপাখ্যান এখানে অবান্তর। অবান্তর সুলতানি ও মুঘল আমলে পীড়ন, দমন, ও অপরাধমূলক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। চোখ অন্ধ করে দেওয়া, পিতাকে প্রিয় পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড উপহার পাঠানো, হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করা, রাজকীয় গরিমা মহিমার পাশাপাশি তথাকথিত রাজধর্মের নামে কত না ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, লোভ, লালসা, দম্ভ ও হিংস্রতার রাজতরঙ্গিণী!

পশ্চিমে অভিযাত্রীদের একজন মুঘলদের একটি আশ্চর্য বিলাসিতার কাহিনী শুনিয়ে গেছেন। বলা হয় ভারত দাবা খেলার আদিভূমি। ওঁরা বলেছেন, এমন রাজকীয় খেলা মুঘল প্রভুদের মতো কেউ আর কোনওদিন খেলেননি। বিশাল ক্রীড়াকক্ষের চকচকে মেঝেটি আসলে মর্মরে রচিত একটি বিশাল দাবার ছক। দুই রাজকীয় সেনাপতি বা প্রতিদ্বন্দ্বী রণনায়কের ঘুঁটি হচ্ছে সুসজ্জিত দাস-দাসীরা। হ্যাঁ, জীবন্ত ঘুঁটি। আজকের পৃথিবীতেও যে রক্তাক্ত যুদ্ধ নামক খেলা তারও ঘুঁটি কি আসলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ মানুষই নন? আজকের পাঠক প্রশ্ন তুলতে

পারেন। নিশ্চয়ই আমরা সবাই এক অর্থে রাজনীতির ঘুঁটি, অর্থনীতির পণ্য এবং রণনীতির প্রবাদোক্ত উলোখড় বটে। কিন্তু সে-সব অন্য প্রসঙ্গ। আমরা আপাতত মুঘলদের দাবা খেলাটাই দেখি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কী সুন্দর প্রতি ঘুঁটির সাজ। একঘর থেকে খেলোয়াড়ের ইঙ্গিতে ঘুঁটি যখন অন্য ঘরে সরে যায়, সেই সামান্য চলার ভঙ্গিতে কত না ছন্দ! কিন্তু অজানা দর্শক জানেন না, কী মর্মান্তিক এই সব জীবন্ত ঘুঁটির জীবন। খেলায় যে মারা গেল প্রাসাদের অন্য কক্ষে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তলোয়ার হাতে মৃত্যুদূত! এ বার তার সত্যকারের মৃত্যু!

অবিশ্বাস্য? না, আগেই বলা হয়েছে কি পুবে, কি পশ্চিমে মধ্যযুগের পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। তবু আমরা পাঠকদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের ক্লান্ত বা বিষাদাচ্ছন্ন করতে চাই না। রোমে যখন গ্ল্যাডিয়েটারের মৃত্যুপণ লড়াই এক প্রিয় ক্রীড়া তখন একজন সংবেদনশীল দর্শক রক্ত আর রক্ত দেখে পীড়িত বোধ করে পাশে বসা স্ত্রীকে বললেন—এ সব দৃশ্য দেখছ কী করে?—এসো আমরা উঠে পড়ি। ভদ্রমহিলা বললেন, ওরা তো সব দাগী অপরাধী। ওদের এ ভাবে মরতে দেখে আমরা দুঃখ করব কেন? ভদ্রজন উত্তরে বলেছিলেন, ওরা না হয় অপরাধী, কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি যে এই হিংস্র রক্তাক্ত মৃত্যু আমাকে দেখতে হবে! তিনি আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। আমরাও তাই মুঘল নিষ্ঠুরতার কাহিনী নিয়ে ধারাবিবরণী দিতে চাই না। এটুকু বলতে বাধ্য হচ্ছি, শুধু বেচারা আনারকলি নামক সেই দুঃখী বাঁদিটির জন্য। তাঁর কাহিনী কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

কোথায়ও ইরাবতী-তীরে সেই বীভৎস রাত্রিটির কথা নেই। কোনও দরবারি ইতিহাসে নেই সেই কালো রাত্রি কিংবা রাতের অন্ধকারেও সে বৃষ্টিস্নাত প্রস্ফুটিত ফুলের মতো কান্না ভেজা মুখটির ছায়া মাত্র। পরবর্তীকালের ওয়াকিয়ানবিশদের কলমে কোথায়ও কোনও বেদনাতুর জিজ্ঞাসা উঁকি দেয়নি। সেখানে পুনঃপুন তাজমহলের কাহিনী, মুঘলদের সুখী অন্তঃপুরের বর্ণাঢ্য বিবরণের পুনরুক্তি। তা ছাড়া সমকালের সাক্ষীদের বলার কিছু নেই। সবাই সেদিন নীরব। কেন-না, শান্ত কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষের মতো যিনি সেই ভয়াবহ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন—তিনি বাদশাহ আকবর। মুঘলদের গৌরব, ভারতের প্রিয় সম্রাট মহামতী আকবর। সম্রাটের পাশে বসা দরবারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল অতএব পরদিন আর তাঁর বিশাল ঘটনাপঞ্জিতে সেই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তাঁর "আইন-ই-আকবরি"-তে সেই নিষ্ঠুর দণ্ডের উল্লেখ নেই।

আবুল ফজল নীরব। জাহাঙ্গীর মৌন। তাঁর একটি আত্মজীবনী আছে। সেখানে তিনি অকপট। নিজের নেশা, বিলাসিতা, কোনও কিছু নিয়েই কোনও গোপনীয়তা নেই। যথারীতি প্রিয় রাজ্ঞী নূরজাহানও সেখানে সগৌরবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু নেই কোনও ডালিমকন্যার উল্লেখ পর্যন্ত। লাহোরে, পঞ্জাবের রাজধানী শহর লাহোরে এ কালে আজ দেশভাগের পর সেই স্মৃতিসৌধটি একটি রেকর্ড অফিসে পরিণত। যেখানে রাজা-প্রজা, যুদ্ধ, দেশ বিভাগ ইত্যাদি ঘটনাবলির ফাইল থরে থরে সাজানো।

পরদেশি বিনোদিনী। তুর্কি হারেমে এই সুন্দরী কেনা, অথবা কেড়ে আনা।
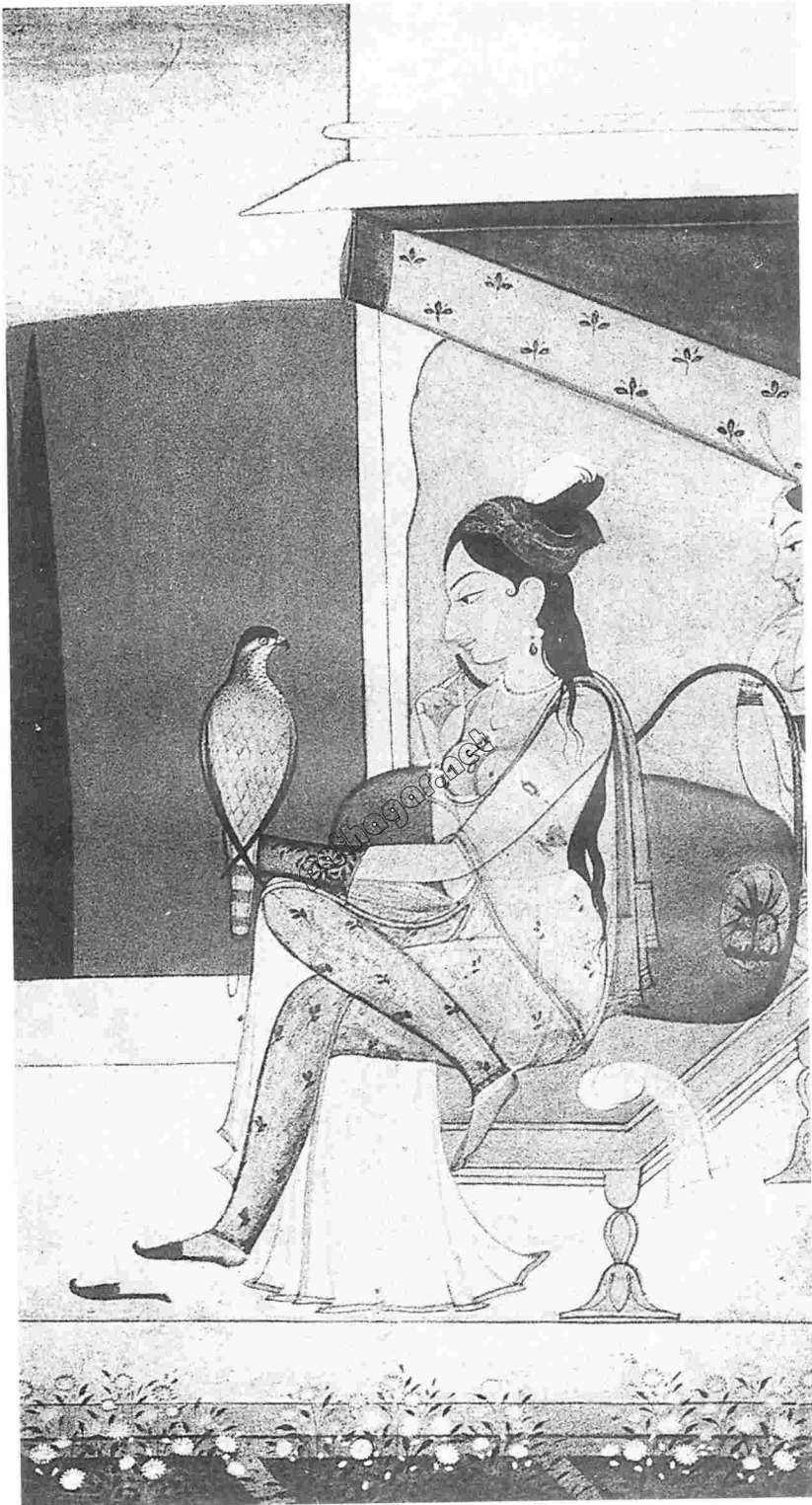
হারেম-কন্যা। মুঘল-অন্তঃপুরের অনেক সুন্দরীর একজন।

হুমায়ুন-কন্যা গুলবদন। তিনি অবশ্য বাদশাজাদি। কিন্তু তাঁর মা?

আনারকলি। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র "মুঘল-ই-আজম"-এর একটি দৃশ্য।

সেই ফাইলের পাহাড়ের আড়ালে চাপা পড়ে আছে দেওয়ালে শ্বেত পাথরের একটি ফলক। কোনও বয়স্ক কর্মী হয়তো কখনও-বা আরবি হরফে লেখা সেই ফলকটি মনে মনে পড়েন। বাংলায় তর্জমা করলে যার বক্তব্য: "আর একবার যদি প্রিয়তমার মুখটি দেখতে পেতাম আমি, তা হলে হে আমার সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুদিন পর্যন্ত তোমার প্রশংসা করতাম আমি।" এই "আমি" কে, তাও গোপন নেই। ফলকটিতে তার পরেই লেখা আর্ত এক যুবরাজের নাম—"সেলিম (যিনি) আকবর তনয়, (যিনি) মাজনুর।"

অর্থাৎ প্রেম পাগল। কিন্তু হায়, কোনও প্রিয়তমার নাম নেই তাতে। কিন্তু আজ সবাই জানেন, কার স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্য এই সৌধ; কার জন্য প্রেম-পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বাদশাহ-তনয় সেলিম। আজ যাঁরা জানবার তাঁরা সবাই জানেন, কোনও পরদেশি সুলতানকন্যা, বা স্বদেশি ওমরাহ দুহিতা নন, হিন্দুস্থানের বাদশা সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সুন্দরী তরুণীটিকে যিনি এমন এক গরিব ঘরের কন্যা, অসহায় পিতা যাঁকে কোলে রাখতে পারেননি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বাঁদির হাটে। গরিবের মেয়ে আনারকলি বাঁদি ছিল—ক্রীতদাসী। বাদশাহের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে, লিখিত ইতিহাসের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে লাহোরের গরিব জনতাই তাই এগিয়ে এসেছিলেন সেই গরিবের মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে। আড়ালে ডেকে ইতিহাসের কানে ওঁরাই সেদিন তুলে দিয়েছিলেন সেই সংবাদ,—আনারকলি আমাদেরই মতো গরিব ঘরের মেয়ে। সে ক্রীতদাসী ছিল।—বাঁদি।

১৬১১ সালের কথা। যমুনাতীরে তখনও তাজমহল উঁকি দেয়নি। শাহাজাদা সেলিম সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছেন। তিনি তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর। ইরাবতীর বাঁ তীর ধরে লাহোরের পথে উত্তরে চলেছেন বিদেশি অভিযাত্রী উইলিয়াম ফিঞ্চ। পথে সহসা তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার ধারে রাশি রাশি ইঁট কাঠ পাথর, শতশত ব্যস্ত কারিগর। সাহেব ওদের কাছে জানতে চাইলেন—এখানে এ সব দিয়ে কী হচ্ছে? উত্তর হল—স্মৃতিসৌধ।—কার? কে তিনি। শ্রমিকদের বৃদ্ধ দলপতি বললেন,—তিনি আমাদেরই মতো কোনও গরিবের মেয়ে ছিলেন। নাম ছিল তাঁর—আনারকলি। তিনি এক কেনা বাঁদি ছিলেন।

বাঁদি শুনেই ফিঞ্চ বসে পড়েছিলেন। তিনি পশ্চিমের মানুষ। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন। ইউরোপে নানা যুগের "স্লেভ"-দের সম্পর্কে তিনি নানা কথা শুনেছেন। গ্রিস, রোম—সবই তাঁর ভাসা ভাসা জানা। কিন্তু কোনও বাঁদির জন্য এমন স্মৃতিসৌধ ইউরোপের কোথাও কোনওদিন গড়ে তোলা হয়েছে বলে তো তিনি শোনেননি। আনারকলির এই সৌভাগ্যের কাহিনী তিনি শুনতে চান। ওঁরা যে যেমন জানেন, যাঁরা যা নানা মুখে শুনেছেন তাই বলে গেলেন। উইলিয়াম ফিঞ্চ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখে গেলেন:

সেবার বাদশাহ আকবর এসেছেন আফগানিস্তান পরিদর্শন করতে। কাবুলে তাঁর বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন হল। সেখানে এক সান্ধ্য মজলিসে অনেক নর্তকী আর

গায়িকার সমাবেশ। অনেক হুরির উপস্থিতিতে যেন রীতিমতো বেহস্ত। সেই ভিড়েই বাদশাহের চোখে পড়েছিল ফুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়েকে। চোখ দুটি তার হরিণীর মতো চঞ্চল। ইশারায় মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন—কী নাম তোমার? ভীরু চোখ দুটি শাহানশার পায়ে রেখে মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল—নাদিরা বেগম। —তোবা! —তোবা! বাদশাহ কপট অপছন্দে নাসিকা কুঞ্চন করলেন। বললেন, আমি তোমার নাম রাখলাম—সরিফুন্নিসা। এ নামের অর্থ—গর্বিত রমণী। মেয়েদের মধ্যে যে সবচেয়ে সেরা রূপবতী সে-ই সরিফুন্নিসা! বাদশাহকে কুর্নিশ করে তেমনই তাঁর পায়ে চোখ রেখে ধীরে ধীরে আবার নিজের সারিতে সঙ্গীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নাদিরা। সে তখনও জানে না, এই সৌভাগ্য তার জন্য কী বহন করে আনতে চলেছে।

কাবুলের সেই আনন্দ-সন্ধ্যায় বাদশাহের পাশেই বসেছিলেন আফগানিস্তানের শাসনকর্তা। দিল্লিশ্বরের অধীন তিনি একজন সামন্ত মাত্র। প্রভুর চোখে কামনার আগুন তাঁর দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। লাহোরে ফিরে আসার দিন আকবর সবিস্ময়ে দেখলেন সামন্তের উপঢৌকনের ডালিতে আরও অনেক বহুমূল্য সম্ভারের সঙ্গে রয়েছে সেই অনাঘ্রাত আফগান পুষ্পটিও, আদর করে তিনি যার নাম রেখেছিলেন—সরিফুন্নিসা। পুরস্কার হিসাবে প্রীত বাদশাহ আফগানিস্তানের আমিরের রাজত্ব কত শত বর্গমাইল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কি না তা জানা যায়নি বটে, কিন্তু সরিফুন্নিসাকে পেয়ে তিনি যে আফগানিস্তান থেকে অন্য মানুষ হয়ে ফিরেছিলেন লাহোর দরবারে কারও তা আর অজানা নেই। প্রৌঢ় বাদশাহের জীবন সরিফুন্নিসা যেন নতুন করে রঙিন করে তুলেছেন। সোহাগ করে আকবর নতুন নামকরণ করেছেন তাঁর। আফগানিস্তানের মেওয়া প্রসিদ্ধ। আনার নামক মেওয়াটির হিন্দুস্থানে বড়ই খাতির। সরিফুন্নিসার চিবুক ধরে মুখটিকে সকৌতুকে নাড়িয়ে দিয়ে এক সন্ধ্যায় আকবর বললেন,—সুন্দরী, তুমি মিষ্ট আফগান মেওয়া। তুমি—আনার—আনারকলি। অর্থাৎ, টুকটুকে লাল ডালিম ফুল। কিংবা ডালিম কুঁড়ি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ডালিম কুঁড়ির ডাক পড়ে বাদশাহি মজলিশে। আনারকলি নাচেন, গান গান। হিন্দুস্থানের সবচেয়ে খ্যাতিমান বাদশা নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে রাজত্ব চালান।

সেই শান্ত জীবন-ছন্দে হঠাৎ একদিন তালভঙ্গ হয়। নেপথ্যে ডালিম কুঁড়ির জীবনে আবির্ভূত হন দ্বিতীয় নায়ক। তিনি যুবরাজ সেলিম। হিন্দুস্থানের পরবর্তী বাদশা। বাদশাহি সুরসভা শেষে আপন মহলে ফেরার পথে পায়ের ঘুঙুর খুলে হাতে নেন আনারকলি। তারপর ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে মর্ত্যের ধুলোয় নেমে আসেন রাজ-নর্তকী। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যান রাজকীয় উদ্যানের সেই কোণটির দিকে, তরুপল্লব যেখানে সবচেয়ে ঘন। সেখানে নীল আকাশের নীচে, মুক্ত হাওয়ার পৃথিবীতে সবুজ ঘাসের কার্পেটে তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকেন যুবরাজ সেলিম। আনারকলি কাছে আসেন, নবীন প্রেমিক দু'হাতে তাঁকে টেনে নেন বুকে। কোনও নৃত্যের ভনিতা নয়, প্রেম-সঙ্গীতের ছলনা নয়, আফগান ক্রীতদাসী তখন

বাদশাজাদা-র মতোই মুক্ত মানব-মানবী। তাঁদের রক্তে আদিমতার ঢেউ। ওঁরা যখন এখানে একসঙ্গে ভালবাসার যুগল-প্রতিমা, লাহোর কেল্লার লাল তখন আরও রক্তিম হয়ে ওঠে, পত্রচ্ছায়া আরও নিবিড় হয়,—বাগানের এই কোণটি রাত্রির তারাখচিত আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন ফুলে ফুলে ফুলময়।

দৃশ্যটা প্রথম যিনি দেখেছিলেন তিনি আর একজন বাঁদি। শাহজাদা-র হৃদয়ের দরবারে তাঁর আর্জি ছিল। আশা ছিল সে-কামনা হয়তো একদিন পূর্ণ হবে। তাঁর রূপযৌবন পুরোপুরি বিফলে যাবে না। যুবরাজ একদিনের জন্য হলেও আকণ্ঠ সুধা পান করবেন এই পানপাত্র থেকে। সে-স্বপ্ন ব্যর্থ হতে চলেছে। আনারকলি তাঁর সব কেড়ে নিতে চলেছেন। সুতরাং, মোহিনী সর্পিণী হলেন। তাঁর জানা ছিল প্রাসাদে যুবরাজ সেলিমের আসল শত্রু মন্ত্রী আবুল ফজল। সুকৌশলে খবরটা তাঁর কানে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন সেই বিষাক্ত সরীসৃপ। আবুল ফজল নিজেও একদিন দুর্গ-কন্দরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন আনারকলির ব্যাভিচার। সম্রাটের সোহাগ তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। আফগান-সুন্দরী প্রেমিক হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন তরুণ সেলিমকে। দুঃসাহসিক এই ছলনা। আবুল ফজল সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

অচিরেই মিলে গেল সেই সুযোগ। কেল্লার শিশমহলে সে-দিন নৃত্য-সভা। কোনও এক সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়ণ করছেন বাদশা। বাদশা স্বয়ং হাজির। হাজির যুবরাজ সেলিমও। তাঁদের ঘিরে আমিরওমরাহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। নাচগান চলছে। একসময় পরির মতো আসরে হাজির হলেন আনারকলি। রূপ এবং গুণের খ্যাতিতে ইতিমধ্যেই তিনি পরিণত প্রবাদে। সম্রাট নিজে করধ্বনিতে স্বাগত জানালেন তাঁকে। কিন্তু আনারকলি যেন সেই সন্ধ্যায় কোনও উন্মনা নায়িকা, সম্রাটের প্রতি সেই বরাবরের সৌজন্য এবং কৃতজ্ঞতাবোধ যেন পরিণত তাচ্ছিল্য নয়, উদাসীনতায়। তিনি নাচছেন। সেখানে অবশ্য কোনও ফাঁক বা ফাঁকি নেই। কিন্তু আবুল ফজল স্পষ্ট দেখতে পেলেন তাঁর বিলোল কটাক্ষ অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে সেই আসনটি লক্ষ্য করে যেখানে বসে আছেন যুবরাজ সেলিম। নাচের ছন্দে ঘুরতে ঘুরতে সুরের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে আনারকলি স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল মুখ আর লাস্যময় চোখ থেকে থেকে মিলিত হচ্ছে সেলিমের চোখের সঙ্গে। উল্লাসে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুর ঝংকারে ঝংকারে বুঝি-বা ঝড় তোলে।

প্রিয় বয়স্য আবুল ফজল সম্রাটের দিকে তাকালেন। আকবর ইঙ্গিতটা ঠিক ধরে নিলেন। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। তারপর সকলের অলক্ষ্যে আসর থেকে চোখ তুলে তাকালেন শিশমহলের দেওয়ালে, যেখানে আয়না আর আয়না। কাচে প্রতি মুহূর্তেই জীবন্ত হয়ে উঠছে ব্যাভিচারিণী আনারকলির প্রতিচ্ছবি। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরেই সে তাকাচ্ছে বাদশাহের বদলে তাঁর পুত্র সেলিমের মুখের দিকে। কামনায় হরিণীর ভেজা ভেজা ভীত চোখদুটিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সেলিমের নবীন মুখমণ্ডল। কামনার আগুন তার চোখেও।

সম্রাট যৌবন চেনেন, তিনি জানেন এই আগুনের উৎস—ভালবাসা। তা এক্ষেত্রে

রীতিবিরুদ্ধ, ব্যাভিচার তুল্য এবং গোপন বলেই আগুনের শিখা আরও উজ্জ্বল, অকম্প্র, আরও তপ্ত। হঠাৎ হাত তুলে নাচ থামাতে ইঙ্গিত করলেন শাহানশা আকবর। তারপর আদেশ করলেন—এই নর্তকীকে বন্দি করে কারাগারে নিয়ে যাও। আমি যথাসময়ে ওর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। আনারকলির বদলে অন্য এক নর্তকী আসরে এলেন। সভা সেই রাত্রির মতো শেষ করার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাল। কিন্তু সে শুধু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা। সভার মেজাজ মর্জি আগেই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। কোন তালভঙ্গের দায়ে আচমকা নির্বাসিত হলেন আনারকলি নামে ওই হুরি কেউ তা জানেন না। কেন হঠাৎ এ ভাবে দপ্ করে জ্বলে উঠল আকবরের মতো মহামতি সম্রাটের পবিত্র ক্রোধ, কেউ তা ভেবে পান না।

দরবারে উপস্থিত গণ্যমান্যদের মধ্যে দু'জন মাত্র জানতেন বাদশার ভ্রূজোড়া কেন এ ভাবে জ্যা-রচনা করেছে। অতঃপর বিষাক্ত তির বিদ্ধ করবে কাকে। সেলিম ভেবে পান না এখন কী উপায়। কেমন করে ফাঁদে পড়া হরিণীকে রক্ষা করবেন এই নিষ্ঠুর ব্যাধের হাত থেকে। তাঁর হয়ে পরদিন সম্রাটের কাছে দরবার করলেন তাঁর জননী, স্বয়ং যোধবাই। তিনি বললেন, হিন্দুস্থানের বাদশা যিনি তাঁর পক্ষে এই ক্রোধ শোভা পায় না। সম্রাট আপনি ক্ষমাশীল হোন। অন্তত আপনার পুত্রের মনের অবস্থার কথা ভেবে এই অসহায় মেয়েটিকে ক্ষমা করুন। কিন্তু বাদশাহ কারও কোনও আবেদন কানে তুলতে সম্মত হলেন না।

যথাকালে হাতে শেকল বাঁধা আনারকলিকে হাজির করা হল সম্রাটের সামনে। তিনি শান্ত গলায় উচ্চারণ করলেন তাঁর দণ্ডাজ্ঞা।—ব্যাভিচারিণীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ওকে জীবিত অবস্থায় কবর দাও।—এবং আজই। একটি মাত্র বাক্য। সরল, সংক্ষিপ্ত, সহজ।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ইট, কাঠ, পাথর এল। এলেন রাজকীয় মিস্ত্রির দল। আনারকলির সংজ্ঞাহীন দেহ টানতে টানতে নিয়ে হাজির করা হল বধ্যভূমিতে। রাত্রি তখন গভীর। এবং গম্ভীর। মশালের আলোয় ওঁরা রাতভর কাজ করলেন। কেউ চোখের জলে ইমারতের মশলা মাখলেন, কেউ মৃতপথযাত্রীর ক্ষীণ আর্তনাদকে মনে মনে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে মনে আতঙ্কিত হলেন। তবু বাদশাহের আদেশ অগ্রাহ্য করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রহরীদের চোখে পর্যন্ত জল। কিন্তু শেষটুকু না দেখা অবধি তাঁদের ছুটি নেই। সপ্তদশী আনারকলির জীবন্ত শরীরটা ঘিরে যখন নিশ্ছিদ্র চার দেওয়ালের অন্ধকার, অপরিসর, মৃত্যুপুরী গড়ার কাজ শেষ, লাহোরের আকাশে তখন ভোরের আলো ফুটছে। মসজিদে মসজিদে ধ্বনিত হচ্ছে আজান। সে কি নিজেদের অজান্তে বাঁদির বন্দনা? তা না হওয়াই সম্ভব। ক্রীতদাস, ক্রীতদাসীর জন্য মানুষ তখনও কাঁদতে শেখেনি। পৃথিবী সেদিন বড়ই নিষ্ঠুর। তা না হলে এমন মহানুভব বাদশাহ আকবর, তিনি একজন অসহায় বাঁদিকে এ ভাবে খুন করবেন কেন?

নিছক কিংবদন্তী? লাহোরের ওই বাজার, ওই স্মৃতিসৌধ, সে কি শুধুই কিংবদন্তী? প্রেম-পাগল সেলিম কর্তৃক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, আততায়ীর হাতে শত্রু আবুল ফজলের

খুন হওয়া, শত শত বছর পরেও হিন্দুস্থানের মানুষের কাছে আনারকলির বিয়োগান্ত কাহিনীর বেঁচে থাকা—সবই কি নিছক কাল্পনিক গল্প, উপকথা? শুধু ফিঞ্চ লিখে গেছেন বলেই কি সব সত্য? ফিঞ্চ আসলে লোককথাই শুনিয়েছেন আমাদের। তাঁর সংগ্রহ করা তথ্যই কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছি মাত্র আমরা এতক্ষণ। কেন-না, কিংবদন্তীও ইতিহাসেরই অন্তর্গত। কিংবদন্তীও ইতিহাসের প্রাণভোমরা কখনও কখনও। সুতরাং, ডালিমকন্যা, আমরা তোমার জবানবন্দির অপেক্ষায় থাকতে রাজি হইনি। আমরা নিজেরাই নানা রং দিয়ে নিজেদের মতো করে তোমার প্রতিকৃতি রচনা করেছি। কারণ, আমরা জানি, ক্রীতদাসের জীবনে কোনও মৃত্যুই অবিশ্বাস্য নয়। আমরা তোমার জন্য তাই কাঁদি আনারকলি। এখানেও ফের একবার চোখের জল ফেললাম তোমার নামে।

তোমরা ক'জন?

রোমের শহরতলির দিকে এগিয়ে যাও। দেখবে সেখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এক কোণে জলপাই গাছের ছায়ায় সারি সারি কবর। ডোরিয়ান থামের বন্ধনে যে উন্নত স্মৃতিসৌধগুলো, সেগুলো পিছনে ফেলে কাঁটাগুল্মের ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে যেগুলো তার দিকে একবার তাকাও। দেখবে প্রাচীন পাথরে বিশুদ্ধ লাতিনে সেখানে আজও উৎকীর্ণ রয়েছে আমার কাহিনী।

> এখানে যে শায়িত সে হারমিওস, লুকানিয়া থেকে আগত জনৈক ক্রীতদাস মেষপালক। সে জীবনে মাত্র একবার বেকন দিয়ে ফিল্ডফেয়ার খেতে চেয়েছিল। মাত্র একবার। কিন্তু পারেনি। হে পথিক, মনে রেখো। পৃথিবীতে যতদিন একটি মানুষ বলবে যে, সে ফিল্ডফেয়ার আর বেকনের স্বাদ জানে না ততদিন তা মুখে তুলো না।

আরও দু'পা এগিয়ে যাও। বাঁয়ের ওই ছোট্ট কবরটির দিকে তাকাও। আরও একটি জীবনের কথা শুনে যাও।

> এখানে যে শায়িত নাম তার গ্রিক্সাস। সে একজন কল্টিক গ্ল্যাডিয়েটার ছিল। সে একটি মেয়েকে তার জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল, মেয়েটি গান গাইতে জানত। কিন্তু পারেনি। এক দিনের জন্যে সে তাকে পাশে বসিয়ে গান শুনতে পারেনি। হে পথিক, মনে রেখো.....।

হারমিওস, তোমার অতৃপ্ত ক্ষুধার কাহিনী তোমার একার নয়। গ্রিক্সাস, তোমার অপূর্ণ কামনার হাহাকার আমাদেরও অন্তরে। কিন্তু সে কাহিনী পরে। তার আগে আমাদের তথাকথিত জীবনের অন্য কাহিনীগুলোও শোনা দরকার। গ্রিক্সাস, তুমি নিশ্চয় মানবে যে, যেসব রূপসী মেয়ে গান গাইত তারাই আমাদের একমাত্র কামনা ছিল না। জীবনে আমাদের আরও অনেক ছোটখাট সাধ আহ্লাদ, প্রার্থনা ছিল। কখনও এক ফোঁটা জল, কখনও একফালি আচ্ছাদন, কখনও-বা শুধু পিঠটা টান করে শোওয়া যায় এমন আর তিন আঙ্গুল নগ্ন কাঠ:—গ্রিক্সাস, যে সুন্দরী মেয়েরা গান গাইত

তাদেরও গলায় সেদিন এমনি সব তুচ্ছ বস্তুর জন্যে বিরামহীন কান্না, যে হালকা ঠোঁটগুলো প্রতি মুহূর্তে অভিজাত গ্রীক রোমানকে শ্রেণীভেদ ভুলিয়ে দিত, এক বিন্দু জল তখন তার কাছে সাধ। গ্রিক্সাস, ক'জন জানে সেই অসহ্য মাসগুলোর ইতিহাস?

ওল্ড কালাবার থেকে কী করে আমরা অপহৃত হয়েছিলাম সে কাহিনী তোমরা শুনেছ। সিল্কের রুমাল, জিন-এর ভাঁড়, আর পুঁতির মালার বদলে মানুষ কেনার 'সাধু' বাণিজ্য কী করে সভ্যতার চোখের সামনে দস্যুতায় পরিণত হয়েছিল, কীভাবে পর পর চার শতকের হৃদয়হীন লুণ্ঠনে বিশাল আফ্রিকার দীর্ঘ উপকূল বসতি শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল, সে ইতিবৃত্ত এখানে অবান্তর। লোভ, লাভ,—আরও চিনি, আরও তুলা, আরও তামাক এবং আরও স্বধর্মী এই সেদিনের ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র ধ্যান। তার বাইরে যেন আর কোনও জরুরি সংবাদ নেই। সুতরাং তার চেয়ে জনা কয় মানুষের পাউন্ড-শিলিং আর ডলার-সেন্টের অঙ্ক বাড়াতে কী করে আমরা শত শত মাইল পেরিয়ে অচেনা জগতে নতুন ঠিকানায় পৌঁছতাম তাই শোনো।

ওরা এজেন্টদের বলত 'বার্কার'। বার্কার শিকার ধরে নিয়ে এল। তাকে দাম চুকিয়ে দেওয়া মাত্র শুরু হল ব্যবসায়ীর কাজ। প্রথম কাজ মানুষগুলোকে গুদামজাত করা। হাটের অবস্থা ভাল থাকলেও একদিনে জাহাজ ভরানো সম্ভব নয়। কারণ, বন্দরে বন্দরে প্রতিদিন তখন নানাদেশের অনেক জাহাজ। ১৭৭০ সনে একমাত্র রোজ আইল্যান্ডেই এ কারবারে নিযুক্ত ছিল দেড়শো জাহাজ। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পরে, অর্থাৎ ব্যবসা যখন সম্পূর্ণ বে-আইনি তখন সেখানে দাস-জাহাজ ছিল একশো বিরানব্বইখানা! সুতরাং খোল বোঝাই করতে সময় লাগে তখন গড়ে তিন মাস থেকে দশ মাস।

১৮০৮ সনের পরে, অর্থাৎ এ বাণিজ্য বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার পরে চোরাকারবারের বেপরোয়া দিনগুলোতে অবশ্য আর এত সময় লাগত না। কারণ তখন উপকূলের সর্বত্র 'বার্‌রাকুন' উঁকি দিয়েছে। 'বার্‌রাকুন' মানে—দাস-গুদাম। সম্পন্ন এজেন্টেরা দুর্গের মতো সুরক্ষিত সেই গুদামে হাজার হাজার দাস নিয়ে সম্রাটের মতো বাস করে। জাহাজ ডাঙা ছুঁয়েই আবার পসরা নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিজের পথ ধরে। 'বার্‌রাকুন' আমাদের জীবনযন্ত্রণাকে লাঘব করেছিল এমন নয়। কারণ সেই কাঠের দুর্গের কোনও আয়োজনই মানুষের কথা ভেবে নয়। ডন পেড্রো, ডি সুজা বা চা-চাউর মতো দাস-সম্রাটেরা জানত এখানে যারা থাকবে তারা মানুষ নয়—ক্রীতদাস। স্বভাবতই 'বার্‌রাকুন'-এর পাশেই চা-চাউয়ের বৈঠকখানায় যখন দামি মদে সন্ধ্যা আরব্যরজনী হয়ে উঠেছে, গর্বিত দাস সম্রাট যখন জনৈক ক্যাপ্টেন ড্রেককে (১৮৪০) সগর্বে বলছে—কোন মেয়ে চাই তোমার বলো;—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, গ্রিক, সিরকাসিয়ান, ইংলিশ, ডাচ, ইতালিয়ান, এসিয়াটিক, আফ্রিকান,—আমেরিকান? এ গরিবের ঘরে বন্ধু সবই আছে; তখন

আমরা তারই বার্‌রাকুনে ক্ষুধায় ছেঁড়া রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি, ওভারসিয়ারের চাবুক তুচ্ছ করে আরও একটু জলের জন্যে 'বর্বরের মতো' চেঁচাচ্ছি! তাহলেও 'বার্‌রাকুন' অনেক ভাল। তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ জাহাজের খোল।

আফ্রিকার উপকূলে দু'ধরনের জাহাজ আসত তখন। বড় আর ছোট। বড় জাহাজগুলোতে দুটো করে ডেক থাকত। নাচের ডেক আর পাটাতনের মাঝামাঝি জায়গাটাকে বলা হত—লোয়ার বোল্ড বা নীচের খোল, আর দুটো ডেকের মাঝামাঝি দ্বিতীয় খোলটাকে বলা হত—আপার ডেক বা ওপরের খোল। 'বার্‌রাকুন' যখন ছিল না তখন এই ওপরের খোলটাই ছিল গুদাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চুরি করা কেড়ে আনা মানুষগুলোকে এখানেই জমা রাখা হত। নরকের প্রথম পর্ব সেখানেই। তারপর শুরু হত দ্বিতীয় পর্ব, ক্যাপ্টেনদের ভাষায় নাম যার—'মিডল প্যাসেজ'।

প্রত্যেক দাস-জাহাজের পথ তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম আফ্রিকার বন্দর। দ্বিতীয় বা মধ্যপথ আফ্রিকা থেকে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও হাট, তৃতীয়—সেখান থেকে আবার নিজের বন্দর। এই তিন অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমাদের তথা দাস-ব্যবসায়ীদের নিজেদের জীবনেও সবচেয়ে গুরুতর। কারণ এই সময়েই তার জাহাজের খোলে থাকে সেই বিস্ময়কর সম্পদ, নাম যার ক্রীতদাস! 'মিডল প্যাসেজ' আমাদের জীবনেও এক বীভৎস অভিজ্ঞতা কারণ এই সময়টুকুতেই আমরা প্রথম চর্মে-মর্মে আবিষ্কার করি ক্রীতদাস কাকে বলে, আর অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যই-বা কোথায়!

যাত্রার দু'দিন আগে মেয়ে পুরুষ সবাইকে ওপরের খোল থেকে বাইরে আনা হল। চাবুকের মুখে সার করে দাঁড় করিয়ে সবাইকে উলঙ্গ করা হল। ডাক্তার একজন একজন করে সবাইকে পরীক্ষা করল,—একজন একজন করে সকলের মাথা মোড়ান হল। তারপর নুন জলে হাত পা মুখ ধুইয়ে সকলকে খেতে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট খাবার। এক একটি পাত্রে দশজন করে খাবে। স্বদেশের কোলে সেই আমাদের শেষ ভোজ, খাওয়ার পর আবার শেকল গলায় উঠল, কিংবা পায়ে।

এ বার দাসদের চিহ্নিত করা হবে। রুপোর অথবা লোহার শিলমোহর গরম করা হচ্ছে। কপালটা ভবিষ্যতের প্রভুর জন্যে ফাঁকা রাখা হচ্ছে। বান্দাছাপ আপাতত বুকেই পড়বে। জাহাজ থেকে নামলেই বোঝা যাবে কারা কোন কোম্পানির পণ্য,— কতখানি নির্ভরযোগ্য। কাঁচা চামড়ায় সে-ছাপ পড়তে না পড়তে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠবে—ভিভালা হ্যা-ভা-না! বলো,—হ্যাভানা কি জয়! কিংবা—বলো লিভারপুল কি জয়! কোথায় হ্যাভানা, কোথায় লিভারপুল সেগুলো কী, কোন মানুষের নাম অথবা কোন দেশের, আমরা তখনও তা জানি না। কিন্তু তবুও হুকুম যখন তখন চেঁচাতেই হবে! সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। বুকে তপ্ত লোহার ছাপ ফুলে উঠেছে, বিদায়ের কথা ভেবে চোখ উপচে জল আসছে, আমরা তাই নিয়ে অজানা ভাষায়

চেঁচাচ্ছি,—ভিভালা হ্যাভানা।

এ বার নতুন হুকুম। আদেশ হল—মরদেরা সব নীচের খোলে চলো। মেয়েরা থাকবে ওপরের খোলে, আর বাচ্চারা এখানেই, ডেকে! দু'জন করে এক সঙ্গে বাঁধা আমরা দাসরা নীচের খোলে ঢুকলাম। নরকে কপাট পড়ল।

নরক যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা এইখানে, এইখানে! এই দাস-জাহাজের খোলে। ইতিহাসে যাকে বর্বর যুগ বলে, সেদিনের দাস ব্যবসায়ীও এমন করে নিপুণ হাতে বোধহয় নরক গড়তে জানত না। খোলটা লম্বায় জাহাজের প্রায় সমান। চওড়ায় পাঁচ ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট, উচ্চতায় তিন ফুট দশ ইঞ্চি। তারই মধ্যে সার করে একজনের পা আর একজনের সঙ্গে বেঁধে আমরা পড়ে আছি। শেকলগুলো আবার দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো। উঠে সোজা হয়ে বসব সে-সুযোগ নেই। চিৎ হয়ে পিঠটা টান করব সে-জায়গা নেই। কাঠের পাটাতন বরাদ্দ করা, সেখানে এক ইঞ্চিও বাড়তি বদান্যতার সুযোগ নেই। আমরা ক্রীতদাসেরা সেখানেই পড়ে থাকি। দিনে দু'বার ওরা খাবার দিতে আসে, একবার সকাল দশটায় আর একবার বেলা চারটায়। চব্বিশ ঘণ্টায় জলের বরাদ্দ—আধ পাঁইট। চেঁচালে চাবুক পাবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পাবে না। সপ্তাহে একদিন জাহাজের কর্মচারী ভেতরে আসে,—বেড়িগুলো চেঁছে দিয়ে যায়, নখগুলো কেটে ছোট করে দেয়। ওদের ভয়—নখ দিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরব। মাঝে মাঝে ওরা ভিনিগার দেয়। বলে—কুলকুচি করে ফেল, শরীর ভাল থাকবে। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠায়। বলে—নাচ গান করো। অবসন্ন শরীর, ভারাক্রান্ত মন, সে আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না। তবুও নাচতে হয়, গাইতে হয়। ওদের হাতে হাতে চাবুক, পা বা গলা থেমে গেলেই তা সপাং করে পিঠে এসে পড়ে। ওরা সতর্ক ব্যবসায়ী, ওরা জানতে চায়—আমরা বিদ্রোহী নই, বাধ্য : আমরা এখনও আনন্দিত, উৎফুল্ল!

এটা একটা আদর্শ জাহাজের খবর। বলা নিষ্প্রয়োজন, দরিয়ায় এ জাহাজ সেদিন অনেক ছিল না। অধিকাংশ জাহাজের দাস-খোল উচ্চতায় মাত্র দু'ফুট। ১৮৪৭ সনে 'মারিয়া' নামে তিরিশ টনের একটি জাহাজ ধরা পড়েছিল, তার পঞ্চাশ ফুট লম্বা পঁচিশ ফুট চওড়া খোলে দাস ছিল দুশো সাঁইত্রিশ জন! লিভারপুলে 'ব্রুকস' নামে একটি জাহাজের খোল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল তিনশো টনের এই জাহাজটির একশো ফুট লম্বা আর পঁচিশ ফুট চওড়া খোলে মানুষ আছে ছশো ন'জন! 'ব্রুকস'-এর ক্যাপ্টেন এ অবিশ্বাস্য কাণ্ড সম্ভব করেছিল শায়িত দাসদের মাথার ওপরে দু'পাশে দুটি তাক ঝুলিয়ে তাতে আরও কিছু মানুষকে শুইয়ে দিয়ে! ওরা সবাই ডান দিকে পাশ ফিরে চামচের কায়দায় শুয়ে থাকত। কারও পা সোজা করার বা পাশ ফেরার জায়গা ছিল না। দশ সপ্তাহ মানুষগুলো সেখানেই চোখ বুঁজে পড়ে ছিল!

ছোট জাহাজের কাহিনী আরও ভয়াবহ। সেগুলোকে বলা হত—'স্লুপ' এবং

'স্কুনার'। তাতে ডেক আর খোলের মাঝামাঝি আর কোনও দ্বিতীয় ডেক থাকত না। দশ টন, পনের টন, কুড়ি টনের জাহাজে তার কোনও অবকাশ ছিল না। ওরা ডেকের তলায় মালপত্রের ওপরে আর একটি অস্থায়ী ডেক তৈরি করে নিত। অবশ্য জায়গা বেশি পাওয়া যেত না। বড় জোর আঠারো ইঞ্চি কি দু'ফুট। তাতেও বাণিজ্য আটকাত না। ওরাও প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ করত।

সে লাভের অঙ্কটাও বোধহয় শোনা দরকার। কেন-না, নয়তো আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, স্টিম ইঞ্জিন, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যেও মানুষ এ হৃদয়হীন বাণিজ্য কেন ভুলতে পারেনি তা বোঝা যাবে না। ১৭৫৩ সনে প্রায় বিনামূল্যে কেনা প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসের বিক্রয় মূল্য ছিল গড়ে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। ১৭৮৬ সনে লিভারপুলে একটি কোম্পানি বিক্রি করেছিল একত্রিশ হাজার ছশো নব্বুই জনকে। এক একবারে তাদের নিট লাভ হয়েছিল দু'লক্ষ আটান্নব্বুই হাজার চারশো বাষট্টি পাউণ্ড! 'লটারি' নামে একটা জাহাজ এক অভিযানে লাভ করেছিল—চব্বিশ হাজার চারশো তিরিশ পাউন্ড, 'লুইসা'—উনিশ হাজার একশো তেত্রিশ পাউন্ড। পরবর্তী কালে, ঊনবিংশ এবং এই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই লাভের অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ১৮২৭ সনে জনৈক ক্যাপ্টেন ক্যানট এক ক্ষেপেই লাভ করেছিল—একচল্লিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ ডলার চুয়ান্ন সেন্ট। হিসেব করে দেখা গেছে, সাড়ে তিন হাজারের একটি 'স্কুনার' এবং একুশ হাজার ডলার অন্য খরচ হিসেবে খরচ করতে পারলে—এই ব্যবসায়ে ছ'মাসের মধ্যে নিট লাভ প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার। কেন-না, একদিকে উপনিবেশগুলোয় তুলা এবং তামাক চাষের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দাসের চাহিদা বেড়েছে, অন্যদিকে নানা আইনের কড়াকড়িতে ব্যবসায়ের ঝক্কি বেড়েছে। তা ছাড়া রিক্ত উপকূলে দাসরাও ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ফলে ১৭৮০ সনে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে একজন কৃষ্ণাঙ্গের দাম ছিল যেখানে দুশো ডলার, ১৮১৮ সনে তা দাঁড়াল হাজার ডলার, ১৮৬০ সনে আরও বেশি—আঠারশো ডলার!

শুধু দর বৃদ্ধি নয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে ক্যাপ্টেনদের জাহাজগুলোও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ইতিহাস জানে, নৌ-বিজ্ঞানে এই হৃদয়হীন ব্যবসায়ীদের কী দান। তারা জাহাজের চেহারা পাল্টেছে, গতি বাড়িয়েছে, ক্ষিপ্রতা এনেছে, আবহাওয়া জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং আরও অনেক কিছু। জলে রাষ্ট্রীয় প্রহরীদের এড়াবার জন্যে তারা মাস্তুল গোপন করার উপায় বের করেছিল, পালের বদলে দাঁড়ের ব্যবহার বাড়াবার কৌশল বের করেছিল এবং সম্ভবত তারাই জলে বাষ্পীয় পোতকে প্রথম দিন অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু এত পরিবর্তনের মধ্যেও খোলে নির্বাসিত আমাদের দাসদের ভাগ্য অপরিবর্তিতই থেকে গেল। সেই বেড়ি, সেই অপরিসর কাঠ, সেই খাদ্য, সেই ব্যবহার! সরকারি নৌ-বাহিনীর প্রহরীরা সাক্ষ্য দিয়েছে বাতাস অনুকূল থাকলে তারা চোখ বুঁজে বলে দিতে পারে কাছে ভিতে কোনও চোরা দাস-জাহাজ আছে কি

নেই!—দাসবাহী জাহাজের দুর্গন্ধ পাঁচ মাইল দূর থেকেও নাকে ধরা পড়ে! কারণ সুস্পষ্ট। ওদের সর্বাঙ্গে অমানুষিকতার কলঙ্ক মাখা, খোলভরা পাপ।

শুধু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়, দাস ব্যবসায়ী কখনও কখনও নির্মমতায় শয়তানকেও পেছনে ফেলত। 'জং' নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন কলিংউড সগর্বে নিজ মুখে দুনিয়াকে সে-কাহিনী শুনিয়ে গেছে। ১৭৮১ সনের সেপ্টেম্বরে চারশো সাতচল্লিশ জন ক্রীতদাস খোলে পুরে সে আফ্রিকার সেন্ট টমাস দ্বীপ থেকে জ্যামাইকা যাত্রা করেছিল। পথে জাহাজে জলাভাব দেখা দিল। খোলে পতঙ্গের মতো মানুষ মরতে লাগল। যারা তখনও বেঁচে ছিল, কলিংউড তাদের ডেকে এনে সমুদ্রে ছুড়ে দিতে আদেশ করল। কারণ হিসেব করে সে দেখেছে—নাবিকদের খুশি রাখতে হলে সকলের পক্ষে এ জল যথেষ্ট নয়!

জীবন্ত মানুষকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার এমনি আরও অনেক কাহিনী ক্যাপ্টেনদের মুখে শোনা গেছে। জাহাজের খোলে মড়ক লেগেছে শুনে ক্যাপ্টেন কখনও জাহাজশুদ্ধ সব ক্রীতদাস দরিয়ায় সঁপে দিয়ে নিজের লোকজন নিয়ে ডাঙায় পালিয়ে গেছে, কখনও রুগ্ন ক্রীতদাসকে সেই বৈজ্ঞানিক তরল পদার্থ দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে যাতে একটি মানুষের প্রাণের সঙ্গে অন্যদের রোগের সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়।

আমরা কখনও কখনও আত্মঘাতী হতাম। বলতাম—আমরা খাব না। ওরা আমাদের ঠোঁট কেটে দাঁত ভেঙ্গে পেটে নল চালিয়ে যন্ত্রে খাওয়াত। প্রত্যেক জাহাজে সে-যন্ত্র থাকত। একবার একটি শিশু কি মনে করে বেঁকে বসল। ক্যাপ্টেনের জেদ চেপে গেল। শাস্তি হিসেবে সে শিশুটির গলায় একটি বারো পাউণ্ড ওজনের কাঠ বেঁধে দিল, তারপর চাবুক হাতে নিজে তাকে খাওয়াতে বসল। চতুর্থ দিনে চাবুকের ঘায়ে বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। ক্যাপ্টেন ওর মাকে দোষী করল। বলল—এ হত্যার জন্যে তুই-ই দায়ী, এ অবাধ্য দাসকে তোকেই সমুদ্রে ফেলতে হবে। চাবুকের ভয়ে মাকে সে দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে হল। উলটো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বেচারা আপন হাতে নিজের ছেলেকে বিসর্জন দিল। সে জানে খুনি কে, তবুও তার বলার কিছু নেই!

মাঝে মাঝে আমরা বিদ্রোহী হতাম। ওরা তখন পাইপ লাগিয়ে খোলে ফুটন্ত জল ঢেলে দিত। সে সুযোগ না পেলে বিদ্রোহীদের তিল তিল করে হত্যা করত। ১৮৪৪ সনে 'কেন্টাকি' নামে একটা জাহাজে পাঁচশো দাস বিদ্রোহী হয়েছিল। কিন্তু কিছু করার আগেই সাতচল্লিশজন নেতাকে ধরে ফেলা হল। তাদের মধ্যে একটি মেয়েও ছিল। ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদেশে তাদের হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী সে হত্যার বিবরণ:

দু'জন মানুষ একসঙ্গে বাঁধা। যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে টানতে টানতে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। একজনের গলায় ফাঁস নেই, সে নীচে পড়ে আছে; সুতরাং লোকটি মারা গেল না,—মৃত্যুর দ্বারবর্তী হল মাত্র। তখন তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। দ্বিতীয় লোকটিকে বলা হল—তাকে বয়ে রেলিংয়ের কাছে আনতে। সেখানে মৃতের পা কেটে তাকে আলাদা করে জলে ফেলে দেওয়া হল।

ক্যাপ্টেনের তীক্ষ্ণ নজর বেড়িটাকেও বাঁচাতে হবে!...মেয়েটিকে গুলি করা হয়েছিল। কিন্তু গুলিতে তেমন কাজ হল না। তারপরেও সে বেঁচে ছিল। ক্যাপ্টেন সে অবস্থাতেই তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। হতভাগ্য রমণী যখন ডুবে যাচ্ছে, নাবিকেরা তখন উল্লাসে হাসছে।...ক্রমে নেশা চেপে গেল। ওরা খোল থেকে আরও কুড়িটি পুরুষ এবং ছ'টি মেয়েকে ধরে নিয়ে এল। তাদের কাউকে কাউকে জীবিত অবস্থায়ই সমুদ্রে ছুড়ে দিয়ে ক্রীড়ার ভঙ্গিতে একটি বিশেষ মুহূর্তে গুলি করে হত্যা করা হল!

এর চেয়েও অবিশ্বাস্য ক্যাপ্টেন হোমানস সাহেবের 'ব্রিলান্ত'-এর কাহিনী। দাসব্যবসা আর জলদস্যুতা এক অপরাধ ঘোষিত হওয়ার পরের কথা। হোমানস-এর সেটা আফ্রিকা থেকে একাদশ সমুদ্র যাত্রা। ইতিপূর্বে সে হাভানায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার কৃষ্ণাঙ্গকে নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। এ বার মাঝপথে এসে হঠাৎ মনে হল—কে বা কারা যেন পিছনে লেগেছে। কিছুক্ষণ পরেই হোমানস তাকিয়ে দেখল তার চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর চার-চারটি জাহাজ। খোলে দাস পেলে—তার আর ছাড়া নেই। হোমানস জাহাজে বড় বড় যত নোঙর ছিল সব বের করল। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অসহায় ক্রীতদাসদের নিয়ে সে একটি মানুষের মালা তৈরি করল। তারপর নৌবাহিনীর জাহাজ কাছে আসবার আগেই নোঙরের সঙ্গে সেটি বেঁধে সমুদ্রে নামিয়ে দিল। ওঁরা জাহাজে এলেন, খোল পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, চারদিক তকতকে ঝকঝকে। সুতরাং মিছেমিছি ক্যাপ্টেনকে ঘাঁটাঘাঁটি করা, ওঁরা আবার নিজেদের কাজে ফিরে গেলেন। হোমানস বিজয়ীর হাসি হাসল। ইতিহাস জানে, এ হাসিটুকু অর্জন করতে একজন ব্যবসায়ীর ছ'শো মানুষকে জীবন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল!

একই হৃদয়হীনতা আবিষ্কার করেছিল—নৌবাহিনীর জাহাজ 'মেডিনা'। ওরা একটি দাস-জাহাজ থামিয়ে তল্লাসি করলেন। কিন্তু কোথাও কোনও দাস নেই। ওরা ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে গেলেন। পরে এই ক্যাপ্টেনের মুখেই ওরা শুনেছিলেন—ক্রীতদাস ছিল না সত্য, কিন্তু ক্যাপ্টেনের নিজের কেবিনে একটি রূপসী আফ্রিকান ক্রীতদাসী ছিল।—তোমরা আসছ দেখেই মেয়েটিকে আমি জোর করে নোঙরের সঙ্গে বেঁধে জানালা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলাম। সে আরও জানিয়েছিল—মেয়েটির পেটে আরও একটি প্রাণ ছিল। এবং সে অজাত মানব-শিশু তারই আপন সন্তান!

মাঝে মাঝে আমরা আত্মহত্যা করতাম। বন্ধুদের চোখের সামনে লাফিয়ে হাঙরের দঙ্গলে ঝাঁপ দিতাম। ওরা আনন্দে চিৎকার করত, বলত—যে মৃত্যুকে চিনল সেই সুখী, আমরা বেঁচে আছি আমরা চির দুঃখী, ক্যাপ্টেনেরা ওদের মৃত্যু সম্পর্কে ভয় দেখাতে চেষ্টা করত। আত্মঘাতী মুক্ত দাসকে জল থেকে তুলে এনে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে খোলের সামনে ঝুলিয়ে রাখত। বলত—এই দেখ মৃত্যু মানেই স্বাধীনতা নয়। তোদের যে বন্ধু মরে স্বাধীন হয়েছিল বলে ভেবেছিল এই তো সে, যার হাত পা নানা জায়গায় ছড়ানো সে কি কখনও বাঁচে?—সে কি কখনও স্বাধীন

মানুষের মতো গান গায়, হাঁটে? আমরা মনে মনে হাসতাম। পরদিন ওরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করত, খোলে আরও একটি মানুষের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। সে বেচারার ডেক থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ ছিল না, হাতের কাছে নিজের আঙুলগুলো ছাড়া নিজেকে হত্যা করার মতো কোনও হাতিয়ার ছিল না। তাই দিয়ে সে আত্মঘাতী হয়েছে, নিজের আঙ্গুলে নিজের টুঁটি ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছে।

আশ্চর্য, তবুও কিন্তু ওরা একবারও জাহাজ থামিয়ে ভাবে না, মানুষ কেন আত্মহত্যা করে!

মাঝে মাঝে অবশ্য প্রকৃতি প্রতিশোধ নিত। নির্মম প্রতিশোধ। খোলে অবহেলার বদলি হিসেবে ডেক-এ কেবিনেও মৃত্যু এসে হানা দিত। ক্রীতদাস আর প্রভুর ব্যবধান ঘুচে যেত,—দু'দল এক সঙ্গে পতঙ্গের মতো প্রাণ হারাত। এমন ঘটেছে, পীত জ্বর জাহাজের অধিকাংশ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের সুস্থ সহচরেরা জাহাজ সমুদ্রে সঁপে দিয়ে ডিঙ্গি নিয়ে জলে ভেসে পড়েছে। কখনও-বা দুই দস্যু জাহাজে লড়াই লেগেছে, দুই দল-ব্যবসায়ীই সে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। কখনও কখনও সমুদ্রে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে!

তোমরা নিশ্চয় হুইটিয়ার-এর বিখ্যাত কবিতা 'দি শ্লেভ শিপস' পড়েছ। সেকালের পশ্চিম দুনিয়ায় এ কবিতা আলোড়ন এনেছিল। সাধারণ পাঠক জানত—এ কবিতা কল্পকাহিনী মাত্র, বিবেকবান কবির অন্যদের বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা। কিন্তু ইতিহাস জানে, তাঁর প্রতিটি হরফ ঘটনা।

জাহাজখানার নাম ছিল—'রঁদা'। সে ১৮১৯ সনের কথা। ফরাসি দাস-তরী 'রঁদা' একশো বাষট্টিজন দাস নিয়ে আফ্রিকার উপকূল ছেড়ে গুয়াদেলুপের পথে পাল উড়িয়ে চলেছে। হঠাৎ মাঝদরিয়ায় আবিষ্কৃত হল—জাহাজে এক ভয়াবহ চোখের রোগ দেখা দিয়েছে। খোলে ক্রীতদাসেরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশে ছত্রিশজন দাসকে জীবন্ত জলে ছুঁড়ে দেওয়া হল। কিন্তু ব্যাধির তাতে মীমাংসা হল না। রোগ খোল ছেড়ে ডেকে হানা দিল। দেখতে দেখতে 'রঁদা'র ডেক অন্ধজনে ভরে গেল। ক্যাপ্টেন, মেট—সবাই অন্ধ। একমাত্র একজন নাবিক তখন চক্ষুষ্মান। সে অসহায়ের মতো ভাবছে—এ বার কী কর্তব্য। হঠাৎ দেবদূতের মতো দিগন্তে একটি জাহাজের পাল দেখা দিল। ভয়ার্ত নাবিকের মনে আশার সঞ্চার হল। সে পতাকায় সাহায্যের আবেদন পাঠাতে লাগল, কিন্তু আশ্চর্য, কোনও সাড়া নেই; বরং জাহাজটি যেন হেলে দুলে অন্য পথ ধরছে। 'রঁদা'র একমাত্র নাবিক প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে চলল, যে করে হোক এই সহায়কে ধরতে হবে—মানুষগুলোকে না পারা যায়, নিজেকে অন্তত বাঁচাতে হবে।

জাহাজটা এক সময় কাছে এল। 'রঁদা'র নাবিক চেঁচাতে লাগল, কে তোমরা, নিশ্চয় শ্বেতাঙ্গ, আমি ফরাসি জাহাজ 'রঁদা'র নাবিক—আমার জাহাজের ডেকে খোলে সবাই অন্ধ, একমাত্র আমিই এখনও দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে সাহায্য করো! রেলিংয়ে সার বেঁধে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা জবাব দিল আমরা

স্প্যানিশ দাস-তরী 'লিওন'-এর নাবিক—আমরাও সবাই অন্ধ! ডেকে খোলে চোখে দেখতে পারে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই!

'রঁদা' শেষ অবদি অবশ্য এই নাবিকের চেষ্টায়ই উপকূল সামনে পেয়েছিল। নিজে অন্ধ হওয়ার আগে সে দুনিয়াকে খবরটা জানাতে পেরেছিল। কিন্তু দৃষ্টিহীন ক্রীতদাস আর তাদের প্রভুদের নিয়ে অন্ধ জাহাজ 'লিওন' কোথায় কীভাবে পাতালের কোন হাটে পৌঁছেছিল সে-খবর আজও কেউ রাখে না!

তবুও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা অকুতোভয়। শতকের পর শতক তারা জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার উপকূলে এসে নোঙর করেছে, আবার জাহাজ ভাসিয়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে গেছে। একজন ঐতিহাসিক হিসেব করে দেখেছেন—জাহাজে তোলার আগে আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ সন্তান শিকারি দস্যুদলের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তারপর যারা জাহাজে উঠত তাদের মধ্যে কমপক্ষে অন্তত শতকরা সাড়ে বারোজনকে বিসর্জন দেওয়া হত অ্যাটলান্টিকে। জ্যামাইকায় বন্দরে নোঙর করার পর প্রাণ হারাত গড়ে শতকরা সাড়ে চারজন, এবং শতকরা তিনভাগের একজন জীবন দিত নবজীবনে দীক্ষা নিতে গিয়ে শিক্ষক তথা প্রভুদের হাতে। অর্থাৎ একশো ক্রীতদাস জাহাজে চড়লেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন খামারগুলোর হাতে আসত গড়ে পঞ্চাশ জন! তবুও সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনও ইউরোপীয় কলোনির জীবনে তারা কম নয়!

আর একজন ঐতিহাসিক হিসেব করে দেখিয়েছেন ১৫১৯ থেকে ১৮০৭ সন অবধি আমেরিকার উপনিবেশগুলোয় আফ্রিকার দাস এসেছে কম করেও পঞ্চাশ লক্ষ! তারপরেও এসেছে আরও কয়েক লক্ষ। কেন-না, আইনে কড়াকড়ি হলেও, ব্যবসায়ী দস্যু বলে ঘোষিত হলেও, আফ্রিকার উপকূল ১৮৬০ সন অবধি পশ্চিমের মৃগয়া-কানন। কলম্বাসের আমল থেকে কুইন ভিক্টোরিয়া—অ্যাটলান্টিকের বুকে ভাসমান জাহাজের অন্ধকার খোলে প্রত্যেকের আমাদের এক জীবন! গ্রিক্সাস, অ্যাটলান্টিকের ও পার হয়তো সত্যিই তোমাদের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সমুদ্র নিশ্চয় নয়। তোমরাও বোধহয় একদিন ফিনিসীয়, মিশরীয়, পারসিক, আরবি জাহাজে চড়েই রোম পৌঁছেছিলে! এবং তোমাদের যারা মায়ের কোল, প্রিয়তমার বাহুডোর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা নিশ্চয় ব্যবসায়ী ছিল। তা হলই-বা তাদের অঙ্গে সেনাপতির পোশাক।

যদি ডাঙার পথে তোমরা এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে পাড়ি দিয়ে থাকো, তা হলেও তোমাদের কাহিনী আমাদের ধারণার অতীত নয়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শেকলের অভাবে তোমাদের হাতগুলো বাঁশের হালকা পালি দিয়ে বাঁধা। তোমরা সার বেঁধে সাহারার বুক দিয়ে চলেছ। তোমাদের হাত থেকে মরুভূমিতে টপটপ করে রক্ত ঝরছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তোমরা কাঁদছ। টিম্বাকটু থেকে কানো, সেখান থেকে কুকা, সেখান থেকে মরক্কোর সুলতানের প্রাসাদ—তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে। হয়তো আরও দূরে, তোমরা তুরস্কে

কোনও আমিরের ঘরে যাবে, ইস্পাহানে কোনও শৌখিনের বাগিচায় গোলাপ ফোটাবার জন্যে মাটি তৈরি করবে, জল ঢালবে।

স্থলপথে সেদিন আমরা শুধু মরক্কো আর তুরস্ক নয়—আমরা সেদিন আরও বহু দূর দূর দেশের যাত্রী। খ্রিস্টজন্মের বারোশো বছর আগে, আসিরিয়ার সিংহাসনে যখন প্রথম সালমানাসার, আমরা তখন থেকেই পসরা হয়ে পথে পথে পথিক। আসিরিয়ার রূপসীদের সঙ্গে তোমরা চিনের রেশম দেখেছ , গলায় দেখেছ আফগানিস্তানের জড়োয়ামালা—কিন্তু উঁচু প্রাসাদ-দেওয়ালের আড়ালে রেশমের মতো মসৃণ ভারতীয় মেয়েগুলোকে দেখোনি। চুংকিং থেকে ব্রহ্মের বুক দিয়ে দিল্লির পথে রাত কাটিয়ে, তেহরান সমরখন্দ পিছনে ফেলে, কাস্পিয়ান ডিঙ্গিয়ে যে রেশম-পথ টিফলিস থেকে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে ঠেকেছিল, সে কি শুধু প্রাণহীন রেশমেরই পথ ছিল? নিশ্চয় নয়, এই পথেই যেমন মার্কোপলো, ফাহিয়ান, ইবনবতুতার নিঃশব্দ অভিযাত্রা এই পথেই যেমন—চেঙ্গিস খাঁ, আলেকজান্ডার আর তৈমুরের রক্তাক্ত অভিযান, এই পথেই তেমনি যুগযুগান্ত ধরে আমাদের আনাগোনা।

তৈমুর দিল্লি দখল করে তার উন্মত্ত সৈনিকদের বলেছিল—তোমরা মাথা পিছু কুড়ি থেকে দু'শো মানুষকে দাস করে সঙ্গে নিতে পারো। হিন্দুস্থানের রাজধানী শূন্য করে আমরা জ্ঞানী, গুণী, গায়ক, নর্তকীর সেই বিরাট বাহিনী এ পথেই এশিয়ার আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এই 'মিডলপ্যাসেজ' কি ভারতের তাঁতীদের হাতে বোনা রেশমের মতো ফুলকাটা? বরং অ্যাটলান্টিকের তুলনায় সে-সব বাণিজ্যপথ আরও করুণাহীন, দুর্গম। অথচ এ সব পথেই ইংল্যান্ডের টিনের সঙ্গে মোট হয়ে স্যাক্সন তরুণী ইউরোপের হাটে এসেছে, স্পেনের তামায় তুরস্কে স্প্যানিশ তরুণের দাসখত লেখা হয়েছে, মধ্য আফ্রিকার লোহায় ইউরোপে শেকল তৈরি হয়েছে, মোলুক্কাসের মশলায় তার রোমান প্রভুর জন্যে ইরানি ক্রীতদাসী মিশরের ফারাওদের রুচিমতো খাবার রেঁধেছে।

খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬ অব্দ থেকে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমানরাও তিন মহাদেশ জুড়ে অনেক পথ গড়েছে। তার কোনওটিই শুধু সামরিক পথ নয়। আমরা সব পথেই সভ্যতার নিত্য সঙ্গী, প্রতিক্ষণ তার পায়ে পায়ে আছি! তাকিয়ে দেখো, ওয়াশিংটন যখন মানুষের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন, আমরা তখন শেকল পায়ে ভার্জিনিয়ায় নামছি, রামমোহন যখন বিশ্বমানবতার কথা ভাবছেন—কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে আমরা তখন সওদাগরের কোলে চড়ে মাটিতে পা রাখছি। হাতে আমাদের শেকল, অনাহারে আর অত্যাচারে এত দুর্বল যে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। সতর্ক ব্যবসায়ী তাই হঠাৎ মায়ের মতো স্নেহময় হয়ে উঠেছে, দেখো ওরা আমাদের অতি সাবধানে কোলে করে নামাচ্ছে।

যাত্রা শেষে হাট।

জাহাজ বন্দরে এল। এথেন্সের হাটে শুরু হল সুখী নগরপিতাদের আনাগোনা।

নগরসভার অধিবেশন বসে মাসে চারদিন, কিন্তু গোলামের বাজার বসে প্রায় প্রতিদিন। রোমেও তাই। সেখানে গ্রাম থেকে সম্পন্ন রোমান, শহরে বন্ধুকে বার্তা পাঠায়,—গতরে খাটতে পারে এমন বদলি দিতে পারি, তুমি আমাকে একটি সুসংস্কৃত তরুণী পাঠাও! একই খবর পরবর্তীকালের ভারতে, আমেরিকায় এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে। মানুষ কেনাবেচার হাট—শহরে শহরে সেদিন অন্যতম দ্রষ্টব্য, যেন বিনে পয়সার থিয়েটার, সার্কাস!

রুয়া ডাইরিটা নামে যে পথটা, তাই ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। ভাইসরয়ের প্রাসাদ থেকে সিকি মাইল আসতে না আসতে তোমার সামনে পড়বে টের্‌রি রো ডি সাবাইও—এ শহরে এটাই চৌরঙ্গী, এখানেই ক্যাথিড্রাল, সেনেট হাউস, ইনকুইজেশন। ভাল করে তাকিয়ে দেখ, তারই একপাশে কীসের যেন ভিড়। এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে, কতকগুলো উলঙ্গ-প্রায় তরুণ তরুণী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাঝবয়সী লোক চেঁচাচ্ছে—হিন্দু স্থানের যে-কোনও রাজ্যের তরুণী চাও পাবে!—যে-কোনও রাজ্যের তরুণী!—এই যে মেয়েটি দেখছ, সে বাদ্য বাজাতে জানে, সেলাই জানে, মিষ্টি বানাতে জানে!—আর এই যে মেয়েটি দেখছ, সে নাচতে জানে, গান গাইতে জানে, নানা দেশের খাবার রান্না করতে জানে! এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করো—ক্যাপ্টেন খুব তো শোনালে, এই তাম্রবর্ণের তরুণটির জন্যে সঠিক কত দিতে হবে তাই বলো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হবে—সস্তা! সস্তা! মাত্র তিরিশ শিলিং।

এ সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে গোয়ার হাটের খবর। ১৬০৮ সনে ফ্রাঁসোয়া পিরার্দ নিজের চোখে এ হাট দেখে গিয়েছেন। তার আগের দিল্লি এবং পরবর্তীকালের কলকাতা, চন্দননগর এবং হুগলিতেও একই খবর। গোলামের হাট তখন স্বাভাবিকতায় হিন্দুস্থানে হরিহরছত্রের মেলার মতো! কী করে আর্য-ভারতের সেই বিন্দু-প্রতিম দাসের হাট ক্রমে সাগরে পরিণত হল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এখানে তা সবিস্তারে বলার অবকাশ নেই। শুধু সেই ক্লেদাক্ত পথের স্মারক হিসেবে কয়েকটি তথ্য স্মরণীয়।

প্রথম খবর, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মৌর্য সাম্রাজ্য—সর্বযুগে ভারতে ক্রীতদাস ছিল সত্য, কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম যে-যুগে বাণিজ্যপণ্য হিসেবে বিশাল নরগোষ্ঠীরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিলাম সে সুলতানি আমল। ইসলামে পণ্য হিসাবে দাস নিষিদ্ধ। ওরা একমাত্র তাদেরই দাস করতে পারে—যারা পবিত্র যুদ্ধে ধৃত। অবশ্য খোলা তলোয়ারের মুখে মাঠেই ধরতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সৈনিক অন্যভাবেও দাস পেতে পারে। যাদের অর্জন করা হল তারা—'মামলুক'। জয়চাঁদের আত্মসমর্পণের ক্ষণে তার গলা থেকে একটি মালা ছিঁড়ে ধুলোয় খসে পড়েছিল। মোহম্মদ ঘুরি তা কুড়িয়ে নেননি। তিনি তাঁর সঙ্গে পাঁচলাখ সৈন্যকে নিজের করেছিলেন। ওরা—'মামলুক'। তৈমুরের সৈন্যরা যাদের নিয়ে গিয়েছিল তারাও তাই।

১৭৮৪ সনে টিপু কুর্গ জয় করে ফেরার পথে সত্তর হাজার বন্দিকে হাঁটিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তমে এনেছিলেন। সেই হতভাগ্যরাও 'মামলুক'! সুলতানের ঘরে দানসূত্রে বা উপহার হয়ে যারা আসত তারা 'মাউহুর'। গুজরাতের শাসনকর্তা ফিরোজ তুঘলককে এমনি চারশো 'মাউহুর' পাঠিয়েছিলেন। সুলতান এবং মোগল বাদশারা নজরানা হিসেবে প্রতিদিন তা পেতেন! কিন্তু তারা আসত কোথা থেকে? কেউ কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে দাস পেত সত্য, কিন্তু 'মাউহুর'দের নিয়েই নিশ্চয় সুলতান-বাদশাদের বিশাল 'খানজাদা' বাহিনী গড়ে উঠত না। আইনে না থাক,—তাদেরও হাটে নামতে হত! না হলে কোথায় পাবেন আলাউদ্দিন পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তিগত দাস!

ফিরোজ তুঘলকের দিল্লিতে ছিল এক লক্ষ আশি হাজার! ইতিহাস জানে, তাদের অনেকেই গোলামের হাটে কেনা। আলাউদ্দিনের সৈন্যদের মাইনে ছিল—দু'শো চৌত্রিশ টঙ্কা, কিন্তু তাঁর আমলে একজন রূপসী সহচরীর নগদ মূল্য, কুড়ি থেকে চল্লিশ টঙ্কা, একজন দাস-শ্রমিকের দাম—দশ থেকে পনেরো টঙ্কা এবং সুশিক্ষিত সুদর্শন একটি বালক ভৃত্যের দাম কুড়ি টঙ্কা! উল্লেখযোগ্য সেদিনের দিল্লিতে চোদ্দো সের গমের দাম—তিন আনার মতো, চালের দাম—দু' আনা!

মুসলিম শাসকদের আনুকূল্যে মৃতপ্রায় দাস-প্রথা দেখতে দেখতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাজির সঙ্গে কাওলা প্রথা এল। আমরা মায়ের কোল থেকে হাতে হাতে ফিরি হতে লাগলাম। কারণ কখনও রাজধানীর রাজনৈতিক অস্থিরতা, কখনও জাতিভেদ প্রথা, কখনও ধর্ম, কখনও দুর্ভিক্ষ, কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কখনও-বা দস্যুতা! শেষোক্তটি, বিশেষ করে পর্তুগিজদের কৃতিত্ব! অবশ্য, সবটুকু কাজই ওরা সব সময় নিজেদের হাতে করত এমন নয়। দক্ষিণে সশস্ত্র মোপলারা নায়ারদের গাঁয়ে গাঁয়ে হানা দিত,—সেই লুঠের মাল উপকূল থেকে জাহাজে দেশে দেশান্তরে ফিরি হত! শুধু তাই নয়, প্রতিটি শহরে তখন নবযুগের বিলাস 'জেনানা তোয়াইফা' বা বাঈজির ঘর। ভদ্রঘরের সুশ্রী শিশুর সেখানে বিরামহীন চাহিদা! মেদিনীপুর, শ্রীহট্ট, কলকাতা—নানা এলাকার শিশু তখন উত্তর ভারতের হাটে হাটে। শ্রীহট্টের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উনিশ শতকেও (১৮১২) ছেলে-ধরার মামলা ওঠে বছরে গড়ে দেড়শো!

এই চোরা-পথ ছাড়াও সেদিনের ভারতে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য ছিল। স্বাধীন মানুষের কাছে দাসত্বের এ দুটি পথ—তখন সত্যি-সত্যিই সড়ক। ১৭৮৫ সনের ঢাকার দুর্ভিক্ষ কত হতভাগাকে যে কলকাতার হাটে ঠেলে দিয়েছে তার হিসেব নেই। ১৮৩৩ সনে দক্ষিণ বাংলার মানুষও কলকাতার হাটে হাটে নিজেদের ফিরি করেছে। বর্ধমানের মা কলকাতার পথে আসতে আসতে ফরাসডাঙ্গায় এসে তার দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাকে দেড়শো টাকায় রাজা কিষানচাঁদের হাতে তুলে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে আবার নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে (১৮২৫)। আগ্রার জনৈক ভবানী তার যৌবনবতী স্ত্রীকে নিয়ে গোয়ালিয়রে চলেছে। সেখানে সে তাকে বিক্রি করবে। দরিদ্র

প্রজা 'দাসখতে' টিপ দিচ্ছে, কারণ হিসেবে প্রকাশ তার কিঞ্চিৎ টঙ্কা ঋণ হয়েছে!

সত্য বটে বাইরে থেকেও পণ্য হয়ে মানুষ তখন এদেশে আসত। ১৮২৩ সনে কলকাতার একটা কাগজে আফ্রিকা থেকে দেড়শো গোলামের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল। ১৮৩০ সনে আর একটা কাগজ জানিয়েছিল—অযোধ্যার নবাব তিনটি আবিসিনিয়ান মেয়ে, সাতটি মরদ এবং দুটি এতদ্দেশীয় রূপসী কিনলেন। তাঁর দাম পড়েছে মোট কুড়ি হাজার টাকা! কিন্তু তবুও বিচক্ষণ সাহেবদের হিসেব ঊনবিংশ শতকে কলকাতা বন্দরে অন্তত বছরে গড়ে একশোর বেশি দাস নামে না! এ দেশের দাসরা প্রধানত এদেশেরই 'সম্পদ'!

সেই সম্পদের পরিমাণ অনুমান করতে হলে—আরও একটি তথ্য শুনতে হবে। সেটি দাসদের সংখ্যা। অবিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই, এথেন্স, রোম, ভার্জিনিয়ার মতোই দাসরা সেদিন এ-দেশে বিরাট সম্প্রদায়। ১৮৪২ সনে মালাবারে তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। তারা প্রধানত ভূমিদাস কিংবা অন্ত্যজ। কিন্তু দুঃখ তাদের জীবনেও কম ছিল না। কেন-না, নিগ্রহের জাল বহুদূর বিস্তৃত ছিল। অন্ত্যজদের গাঁয়ের মুখে একজন টায়ার, পথের মাঝামাঝি জায়গায় বসে থাকত। লোকটি এমনভাবে বসত যে, রাস্তা পার হতে হলে হয় তাকে ছুঁতে হবে, না হয় তার ছায়া মাড়াতে হবে! বেচারা দাসরা সে-বিভ্রাট থেকে মুক্তির জন্যে দূর থেকে তাকে পয়সা ছুড়ে দিত,—গেট মনি পেয়ে প্রভু একটু সরে বসত। এই তার পেশা। মালাবারে নগদে যারা বিক্রি হত, সেকালে তাদের দাম ছিল গড়ে পঞ্চাশ টাকার মতো। মেয়ে হলে স্বভাবতই বেশি—একশো।

বাংলা প্রেসিডেন্সির খবর আরও ভয়াবহ। ১৮৬২ সনে বিহার-উড়িষ্যা, আসাম এবং অবশিষ্ট বাংলা মিলিয়ে প্রায় একচল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দাস। তার মধ্যে আসামে সাতাশ হাজার, শ্রীহট্টে তিন লক্ষ একষট্টি হাজার, চট্টগ্রামে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার, ভাগলপুরে চল্লিশ হাজার এবং অন্যত্রও প্রায় একই অনুপাতে! আসামের দুরাং জেলায় একজন বলবান দাসের দাম তখন কুড়ি থেকে আটাশ টাকা, ষোল থেকে পঁচিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ের দাম পঁচিশ টাকা। নওগাঁয় আরও সস্তা—পনেরো টাকা! উল্লেখ্য, তামার পাতের জায়গায় ততদিনে কাগজ এসেছে এবং কোম্পানির কাছারিতেই সে-যুগে চার টাকা চার আনার বদলে দাস-খত বিক্রি হচ্ছে। কেন-না মোগলের মতো ইংরেজও তাদের রাজত্বের সূচনার দিন থেকে এ ব্যবসায়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সেজেছে! সনাতন প্রথার সঙ্গে তাদের উদ্যোগে আরও দু'-একটি নতুন পন্থা যুক্ত হয়েছে। হেস্টিংস দণ্ডিত অপরাধীদের সমাজের দাসে পরিণত করেছিলেন,—কোম্পানি তাদের বাইরে চালান দিয়ে নগদ রোজগারের নতুন পণ্য বানিয়েছিল। সুতরাং সন্দেহ কী, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের কলকাতা কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে গোলাম খুঁজবে, গঙ্গার ঘাটে তপসে মাছ কিনতে গিয়ে টেরিটি বাজারের সাহেব জোড়া গোলাম হাতে নিয়ে কুঠিতে ফিরবে!

গোলাম আর গোলাম। অষ্টাদশ শতক তো বটেই, ঊনবিংশ শতকের প্রথম

দিককার বছরগুলোতেও কলকাতা এক অবিশ্বাস্য গোলামের হাট। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে (১৭৮৫) সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্স, বেদনামথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার ধারণা, আপনারা অনেকেই দেখেছেন কলকাতার হাটে বিক্রির জন্যে বিরাট বিরাট নৌকো বোঝাই করে কীভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নদীপথে এখানে আনা হয়ে থাকে। আপনারা বোধহয় জানেন, এইসব মানবশিশু অধিকাংশই তাদের বাপ-মার কোল থেকে চুরি করে আনা, কিংবা অন্নাভাবের দিনে কয় মুষ্টি চালের বিনিময়ে কেনা! শ্রোতারা নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছিলেন। কেন-না, তা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ সেদিন কাগজে কাগজে নিত্য বিজ্ঞাপন চলেছে:

> চাই! চাই! আপাতত কলকাতায় আছেন এমন একজন ভদ্রব্যক্তির জন্য দুইটি তাম্র বর্ণের প্রকৃত সুন্দরী আফ্রিকান রমণী চাই। তাদের বয়স চৌদ্দর নীচে এবং কুড়ি কিংবা পঁচিশের ওপরে হলে চলবে না।...(১৭৮০)

কিংবা

> আবশ্যক। দুইজন কাফ্রী বালক আবশ্যক। তারা ফরাসী বাদ্যে পারঙ্গম হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি ঘরের কাজে দক্ষতাও বাঞ্ছনীয়। তবে তাদের মদ্যপানের অভ্যাস না থাকাই সঙ্গত। যদি কারও সন্ধানে বিক্রির জন্যে এরকম বালক থেকে থাকে তবে তিনি এই বিজ্ঞাপনের প্রিন্টারকে জানাতে পারেন।...

অথবা

> বিক্রয় হইবে। ফরাসী বাদ্যে দক্ষ, কেশ-চর্চা এবং ক্ষৌরকর্মে নিপুণ, দু'জন আফ্রিকান ক্রীতদাস বিক্রয় হইবে!...মূল্য মাথাপিছু চারশ' সিক্কা টাকা!

কে জানে সেদিন যাঁরা বিচারকের আসনে, তাদেরও কেউ কেউ বিজ্ঞাপনদাতাদের এই ভিড়ে ছিলেন কিনা! অসম্ভব নয়। কেন-না, উইলিয়াম জোন্স তাঁদের সামনে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছিলেন—সম্ভবত এই জনবহুল শহরে এমন কোনও ঘর নেই যেখানে কমপক্ষে একটি ক্রীতদাস নেই!

উনিশ শতকের প্রথম দিকেও হিন্দুস্থানে কোম্পানির রাজধানী শহরেও একই সমাচার। বরং খবরের পরিধি বেড়েছে, ইংরেজি কাগজের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা কাগজে খবর ছাপা হচ্ছে—

> ভার্যা বিক্রয়।...আমরা অবগত হইলাম যে, জিলা বর্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু...সংপ্রতি বর্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে

> লইয়া গেল তাহাতে...এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল এ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক।...ইত্যাদি ইত্যাদি। (অক্টোবর, ১৮২৮) কিংবা—'আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমিদার বারাণসী হইতে স্বগৃহে আগমনকালীন ভাগলপুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০/২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল। (জানুয়ারি, ১৮৪০)।

খাস কলকাতার বাজার আরও সরগরম। কাগজে শুধু গোলাম কেনাবেচার খবরই বের হয় না, পলাতক গোলামের সন্ধানকারীদের জন্যে পুরস্কার ঘোষিত হয়। সে বিজ্ঞাপনে গর্বিত মালিক নির্দ্বিধায় নিবেদন করেন—পায়ে ওর বেড়ি আছে। যদি তা সে কোনওরকমে খুলেও ফেলে দিয়ে থাকে তা হলেও চিনতে অসুবিধে হবে না,—দাগটা নিশ্চয়ই থাকবে। ১৮২৩ সনেও এ শহরে আফ্রিকা থেকে দাস-জাহাজের আগমন সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৩৯-এ নগরের বুক থেকে মানুষ-চুরির বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মাটিতে ততদিনে আফ্রিকার উপকূলের কৌশলে 'বার্‌রাকুন' পর্যন্ত উঁকি দিয়েছে।

অ্যাডম বলে গেছেন, তিনি স্বচক্ষে আমড়াতলা স্ট্রিটে একটি গোলামখানা দেখেছেন। কাঠের তৈরি সেই গুদামের দরজাটা ছিল অনেকটা পশুর খাঁচার মতো,—গরাদ দেওয়া। আমরা ভয়ার্ত মানুষের দল বিমূঢ় পশুর মতো সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে সামনের আলোয় উদ্ভাসিত পথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। রাস্তা দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে,—মুক্ত মানুষের স্রোত। আমরা বন্দি। আমাদের সামনে পথ নেই, পায়ের নীচে কাঁচামাটির পৃথিবীটা হঠাৎ যেন এখানেই শেষ হয়ে গেছে,—মাথার ওপরে আকাশ নেই, আকাশ আমড়াতলা থেকে অনেক দূরে—হয়তো এই সাদাকালো ধনীগরিব মানুষগুলো যেদিকে হাঁটছে সেই দিকে।

হঠাৎ সিকেন্দর শাহের ঘোড়সওয়ারদের পায়ের শব্দ কানে ঠেকত। জোড়া-ঘোড়ার ছিমছাম গাড়িগুলো এসে থামত। কসাইতলার মিঃ পার্কিস আর চিনে বাজারের মিঃ ডানকানেরা এসে সামনে দাঁড়াতেন। ভাঙা হিন্দুস্থানীতে কী যেন ফিসফিস কথা বলতেন। তাঁদের সন্ধানী নীল চোখগুলো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বিশেষ দুটি চোখে এসে নিবদ্ধ হত। তারপর ঘটনা অতি সামান্য। শ দেড়েক সিক্কা টাকা আর শেকলের ঝনৎকারের মধ্যে অসহায় সঙ্গীদের বোবা বিদায় সম্ভাষণ! তারপরও অবশ্য মিঃ পার্কিসের একটি কৃত্য অসমাপ্ত রয়ে গেল, সে কোনও আদালতে গিয়ে চার টাকা চার আনা ডিউটির বিনিময়ে একটি দলিল সংগ্রহ। কিন্তু তার আগেই তাঁর এই হীন বান্দার জীবনে শুরু হয়ে গেছে অজানা দৈর্ঘ্যের অজ্ঞাত ভাগ্যের নতুন জীবন।

এ জীবনের কাহিনী সহস্র এক আরব্যরজনীর মতো। মনে হয় এ বার বুঝি ফুরাল,

কিন্তু ফুরোয় না। শ্রোতা ভাবেন, কান্না বুঝি থামল, কিন্তু অশ্রুধারা তবু শুকোয় না। শুনতে যখন রাজি, তখন আরও কিছু খবর বলি। তার আগে সুধীরকুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" থেকে ছোট্ট দুটি দলিল পড়া যাক।

রূপৈয়া ওজন
দশ মাঘ
নিশান সহী

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র বরাবরেষু লিখিতং শ্রীসনাতন দত্ত ওলদ গোপীবল্লভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজঙ্গ মামুলে পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয়পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিবানাম্নী দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জ্জোপহতি ক্রমে নগদ পন ৯ নয় রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম—ইতি তাং ১১ কার্ত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গালা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ন
সন ৩৯ জলুষ

শ্রীমতি বিবা — শ্রীসনাতন দত্ত
কস্য
নাম্নি দাসী — নিসান সহী
কস্যাঃ
সম্মতিঃ।

এবার আর একটি।

৭ শ্রীশ্রীরাম
সন ১৭৩৫

ইয়াদী কির্দ্দ সকল মঙ্গলাময় শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গি সুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগ্‌দীকস্য ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং কার্যঞ্চণ আগে আমার বেটা নাম শ্রীস্যামা বাগদী ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিম্মত মান্দারাজী ৭ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছাপূর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমি ইহার বাতিজর ক্রিস্তাৎ করিয়া খোরাক-পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরার দান বিক্রয়ের সত্তাধিকার তোমার আমার সহিত ও আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগার সত ব্যাল্লিষ শাল তারিখ ১৭ সতরঞ্চী জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই

সন ১৭৩৭ সাল·

প্রথম দলিলে মাত্র নয় টাকায় নিজেদের বিক্রি করে দিলেন স্বামী-স্ত্রী। কারণ, তাঁরা অন্নোপহৃতী ও কর্জ্জোপহৃতি। তাঁদের পেটে ভাত নেই। তাঁরা ঋণভারে জর্জরিত। দ্বিতীয় দলিলে সাতটি মান্দারাজী টাকার বিনিময়ে অক্ষম পিতা তাঁর আট বছরের কিশোর সন্তানকে চিরকালের মতো বিক্রি করে দিলেন এক শ্বেতাঙ্গের কাছে, দলিলের ভাষায় "ফিরিঙ্গি"র কাছে। নতুন মালিককে তিনি অধিকার দিয়েছেন তাকে বাপটাইজ করে খ্রিস্টান করার। ক্ষুধা! ক্ষুধা! ক্ষুধা! সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে ভালবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা সবই ভক্ষ্য।

এ বার আর একটি দলিলের দিকে তাকানো যাক। এটির একটি প্রতিলিপি বেশ কিছুকাল আগে (১৯৮৩) প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার একটি বাংলা কাগজে। সঙ্গে টীকাকার ছিলেন ছদ্মনামা 'শ্যাম কাশ্যপ।' তার বয়ান—

/৭

শ্রীশ্রীহরি

ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণরাম মৌলিক ওলদে বাসদেব মৌলিক সুচরিতেষু— লিখিতং শ্রীবদনচান্দ ওলদে শ্রীগঙ্গারামচন্দ ও শ্রীমতি সরেস্বতি ওলজে শ্রীবদনচান্দ চন্দ রাজিনামাপত্র মিদং কার্যাঞ্চ। আগে আমরা স্ত্রী পুরুষ হই ও আমারদিগের পুত্র শ্রীভেঙ্গু চন্দ ওমর তিন বৎসার এহি তিনজন রিণঅর্থ উপহৃতিক্রমে আপনার স্থানে আপ্তবিক্রী হইয়া নফরি ও দাস্যতার বশী হইয়া রাজিনামা দিলাম আপনার পুত্র পউত্রাদিক্রমে নকরি ও দাস্যতা আমার পুত্র পউত্রাদিক্রমের নকরি ও দাস্যতা আমার পুত্র পউত্রাদিক্রমে নকরি ও দাস্যতা আমার পুত্র পউত্রাদিক্রমে নফরি ও দাস্যতা করিতে থাকিব এতদর্থে বশীনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১০ বারসও দস সন বাঙ্গালাতে ১৪ আশ্বীন।"

ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে বছরটি ছিল ১৮০৪। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর। তখনও দিব্যি ঢাকার অদূরে ঋণের দায়ে স্বামী-স্ত্রী তিনবছরের সন্তান সহ নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছেন উত্তমর্ণের কাছে। সেই সঙ্গে লিখে দিচ্ছেন বংশানুক্রমে গোলামির অঙ্গীকারপত্র। টীকাকার বলছেন এই ধরনের অন্যান্য দলিলকে কখনও কখনও বলা হত 'বন্দাজির পত্র', কখনও বলা হত 'বশীনামা'। এঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য লেখা হয়েছে 'রাজিনামা।' বাহাদুর বটে সেদিনের বাঙালি দলিল লেখকরা। মানুষের হাতে পায়ে জিঞ্জির পরাবার জন্য তাঁদের কলমে কত না ভাষার খেলা। কে বলবেন, বাংলা ভাষায় মনের সব ভাব ঠিকঠাক প্রকাশ করা যায় না। ওঁরা কিন্তু গোলামকে বশে রাখার জন্য নিপুন হাতে রচনা করতে পেরেছেন বান্দাকে চিরকালের মতো বন্দি করে রাখার জন্য নরম বাংলা শব্দে লোহার গারদ।

সর্বশেষ উল্লিখিত দলিলটি রয়েছে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে। বিলাতের

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, তথা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রয়েছে এ ধরনের বেশ কিছু দলিল। নিশ্চয় এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক দলিল পড়ে রয়েছে দেশের আনাচে-কানাচে। মহাফেজখানাগুলিতেও নিশ্চয় রয়েছে কিছু-না-কিছু সঞ্চয়। কারণ, ইংরেজ আমলে কাগজ কলমের বড়ই কদর। আমাদের যদি মন্ত্রগুপ্তি "শতং বদ মা লিখ," সাহেবরা তবে সবই করতে চায় কাগজে কলমে।

কাগজে কলমে ইংরেজরা ১৮৪৩ সালে এক আইন করে দাসপ্রথা এ দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আইন অনুসারে কেউ দাসদের সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নিয়ে আদালতে যেতে পারবেন না। কারণ অতঃপর গোলামের উপর প্রভুর কোনও আইনসম্মত অধিকার নেই। ১৮৬১ সালে জারি হল নতুন আইন। এ বার বলা হল দাস রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, ক্লেদাক্ত, রক্তাক্ত অতীতের কলঙ্ক রাতারাতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। ঢেরা পিটিয়ে আইন জারি হলেই যে হাজার হাজার মানুষের জীবনে হঠাৎ সূর্যোদয় ঘটবে, এমনটি আশা করা যায় না। কেন না, দূর অতীতে যার শিকড়, এবং মহাবটের মতো বিস্তৃত যার শাখা প্রশাখা, বটের মতোই প্রাণরস সংগ্রহের জন্য সেই বিষবৃক্ষর শাখা থেকে আবার নেমে আসে নব নব তৃষ্ণার্ত শিকড়। দাসপ্রথা কি এতই মরণশীল? সে নব নব রূপে বাঁচার কৌশল জানে। বুঝি-বা অমরত্বের গোপন মন্ত্র তার জানা। সে-কথা পরে হবে। আপাতত আমরা ঔপনিবেশিক আমলেই বরং আর একবার ফিরে যাই।

পর্তুগিজদের কথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ঔপনিবেশিক আমলে ফরাসি ডাচ ইংরেজ সবাই দাস ব্যবসায়ে হাত লাগিয়েছে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি তারা বজবজের কাছে আক্রায় রীতিমতো একটি বিশাল দাসগুদাম পর্যন্ত গড়ে তুলেছিল। ফরাসিরাও এ ব্যাপারে কম যান না। ১৭৯১ সালে চন্দননগরে বসে ক'জন ফরাসি ভদ্রলোক পরামর্শ করে স্থির করলেন তাঁরাও এই ব্যবসায়ে নামবেন। বাংলার মেয়ে পুরুষ ধরে সোজা চালান দেবেন পণ্ডিচেরিতে। এই অভিযানে নামবার পর প্রথমেই এক বিপর্যয়। খিদিরপুরের কাছে ফরাসি দাসবোঝাই জাহাজডুবির ফলে মারা গেল বাংলার বত্রিশ জন দাস। পরবর্তীকালে এই লোকসান নিশ্চয় পুষিয়ে নিয়েছিলেন ওঁরা। ক্লোরিয়াস নামে এক উদ্যোগী ফরাসি লিখিত বিবিরণ রেখে গেছেন তাঁর দাস শিকারের। বেচারা অন্যদের তুলনায় বেশ মন্দ ভাগ্য। অনেক চেষ্টা করে তিনি ধরতে পেরেছিলেন মাত্র দু'জন স্ত্রীলোক আর দুটি শিশুকে। তবু তিনি হাল ছাড়েননি। আশা প্রকাশ করেছেন, যদি কোনও দিন একটি বড়সড় জাহাজ আর কিছু মানুষধরা লোকজন সংগ্রহ করতে পারেন তবে নিশ্চয় তাঁর ভ্যাগ্যও প্রসন্ন হবে।

দেখাদেখি ইংরেজরাও নেমে পড়ল। বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যবসা। হাঙ্গামা-হুজ্জত নেই। মূলধনও বেশি চাই না। ঘটে যৎসামান্য বুদ্ধি থাকলেই লক্ষ্মীলাভ। বেওয়ারিশ দেশ, কোনও মতে মানুষ ধরে এনে বিক্রি করে দিলেই হল। পুরোটাই লাভ। শুধু কিছু দালাল ধরা চাই, এই যা। গ্রামাঞ্চলে চোর-ডাকাতদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে। ক্রেতার অভাব নেই। নিত্য নতুন স্বদেশের সিভিলিয়ান

আর ফৌজিরা আসছে। গোলাম পুষতে কে না চায়।

এ দেশেও সম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। পছন্দ মতো পণ্য পেলে তাঁরাও নিশ্চয় হাত পাতবেন। অতএব শুধু মশলাপাতি, লবণ, চিনি, কাপড় নয়, ইংরেজরা দাস ব্যবসায়ের দিকেও ঝুঁকলেন। এ দেশের ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রে এ-বাণিজ্য সিদ্ধ। আর, কুলীন ফরাসিরা যখন অর্থলোভে হাত নোংরা করতে পারছে, তখন ইংরেজদেরই-বা লজ্জা-শরমের কী আছে। সুতরাং লর্ড কর্নওয়ালিশ অম্লানবদনে লন্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার লিখে দিলেন,—এ দেশে দাসপ্রথা উচ্ছেদ সহজসাধ্য নয়। কারণ দাসরা সংখ্যায় অগুন্তি, আর হিন্দু মুসলমান আইনে এই ব্যবসা মঞ্জুর।...ইত্যাদি। তিনি নিজেদের এলাকায় দাসসন্ধানীকে পাকড়াও করে পাঁচশো টাকা জরিমানা করে দিয়ে ইংরেজের গৌরবগাথা রচনা করলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস আরও করিৎকর্মা। তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি অনেক বেশি পরিপক্ক। তিনি আইন করলেন ডাকাতদের বিচার হবে নিজেদের এলাকায়। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে। আর অপরাধীর শাস্তি? দণ্ড: পুত্র প্রপৌত্রক্রমে তাকে দাস হয়ে থাকতে হবে রাজসরকারের। অর্থাৎ, পুরুষানুক্রমে তারা হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাস। কোম্পানি সুবিধা মতো তাদের নিজের কাজে লাগাবে। তা ছাড়া তিনি সাধারণ অপরাধীদের ক্ষেত্রেও এক নতুন আইন জারি করলেন। বলা হল কয়েদিদের জেলখানায় বসিয়ে খাওয়ানোর বদলে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হোক। দাসদের পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে দূর দূরান্তে, কোম্পানির অন্য কোনও উপনিবেশে। তাতেও কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ।

হেস্টিংস-এর পরামর্শেই বাংলার কিছু ক্রীতদাসকে পাঠানো হয়েছিল সেন্ট হেলেনায়। সেখানে একবার একটি অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে। জাহাজ থেকে নামানো হয়েছিল পাঁচটি যুবক আর পাঁচটি যুবতীকে। যুবতীরা এমনই নির্বোধ যে নিশ্চিত উদরের ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, নতুন দেশের নতুন দৃশ্যাবলী উপভোগ করার সুযোগ পেয়েও তাঁরা মুখ ভারী করে বসে থাকেন। এমনকী পায়ের সুন্দর গহনা দুটিও তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। হয়তো তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন মোটা মোটা লোহার এই মল দুটি আসলে বেড়ি। আহাম্মক ওঁরা পাঁচজনেই এক সঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

গোলাম বাঁদিদের এ-ধরনের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের কথা সাধারণত আমল দেওয়া হয় না, তবু ঘটনাটি উল্লেখ না করে থাকা গেল না। কেন-না, অনেক আপাত বুদ্ধিমতী নারী যখন মল আর বেড়ির তফাত বোঝেন না, ওঁরা তা নিজেদের অনুভূতিতে ধরতে পেরেছিলেন। পায়ের গয়না কেন হাঁটতে গেলে ঝমঝম করে ছন্দ তুলে নর্তকীর ঝুমুরের মতো বাজে ক'জন মেয়ে তার রহস্য বোঝেন? ওই ধ্বনি প্রভুকে আশ্বস্ত করে, সে আছে, কাছে ভিতেই আছে, পাখি পালিয়ে যায়নি।

যাক সেকথা। তাঁর দাস রপ্তানির পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যায় ওয়ারেন হেস্টিংস কতখানি দূরদর্শী ছিলেন। বিলাত থেকে কলকাতার পথে এক সাহেব ১৭৪৫ সালে

কেপটাউনে নেমেছিলেন। তিনি লিখছেন, সেখানে বিস্তর মালয়দেশীয় দাস-দাসী। কিন্তু তারা বড়ই দুর্বিনীত, সহসা পোষ মানতে চায় না। যত ভাল ব্যবহারই করা হোক না কেন তাদের সঙ্গে কিছুতেই তাদের মন পাওয়া যায় না। মালয় ক্রীতদাসরা কখনও প্রভু এবং কখনও-বা প্রভুপত্নীকে খুন করেছে, এমন দৃষ্টান্তও নাকি আছে। তুলনায় দিব্যি জনপ্রিয় শুনছি ভারতীয় দাস-দাসীরা। বিশেষ করে মালাবার, করমণ্ডল এবং বাংলা থেকে যাদের আনা হয়েছে তারা খুবই নম্র, ভদ্র এবং বিশ্বস্ত। তবে তারা যথেষ্ট পরিশ্রমী নয়, এই যা। কে জানে, এ সব প্রশংসা পত্রের জন্যই কিনা, ওয়ারেন হেস্টিংস আরও একটি নিয়ম চালু করেছিলেন আমাদের এই বাংলা মুলুকে। তিনি ঘোষণা করলেন কেউ যদি নিজের প্রয়োজনে গোলাম বা বাঁদি কিনতে চান তবে আদালতে রেজেস্ট্রি করাতে হবে। কলকাতার জন্য নির্দিষ্ট হয় কোর্ট হাউস। মাথাপিছু রেজিস্ট্রেশন ফি ৪ টাকা ৪ আনা। সাধু! সাধু! বললেন বিলাতে কোম্পানির ডাইরেক্টররা। গভর্নর জেনারেলের ব্যবসা বুদ্ধি সত্যই তারিফ করার মতো।

এই হেস্টিংস-এর জমানাতেই প্রাজ্ঞ উইলিয়াম জোন্স-এর সেই উক্তি,— কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে বসছে গোলামের হাট। উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য-বিদ্যায় বিশ্বখ্যাত বিশারদ। আপনকালে তাঁর বিদ্যা এবং প্রজ্ঞার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সততার খাতিরে উল্লেখ থাকুক যে, ওই হাটে তিনিও ছিলেন একজন ক্রেতা। নগদের বিনিময়ে একটি কিশোরকে তিনি হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। গোলামির অভিশাপ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য?—তার চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার জন্য? হয়তো। ছেলেটির পরবর্তী কাহিনী আমাদের জানা নেই।

জোন্স বলেছিলেন কলকাতার ঘরে ঘরে ক্রীতদাস। এখানে এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া ভার যাঁদের ঘরে এক বা একাধিক দাস না রয়েছে। তারা সবাই কি বাংলার? মোটেই না। দাস ব্যবসায়ীর হাত বড়ই লম্বা। সে যদি কলকাতার চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, তবে বুঝতে হবে কলকাতার বাঙালি বাবুর মতো সে হাওড়া বা খেজুরি কোন দিকে তা বোঝাচ্ছে না, আসলে সে নির্দেশ করছে গুজরাতে উপকূল, আর আঙুলে ভর দিয়ে পা উঁচু করে পাশের মানুষটির ঘাড়ের উপর দিয়ে আঙুল তুললে জানবেন, সে দেখাচ্ছে আফ্রিকার উপকূল। সেই উপকূল যেখান থেকে গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় করে পশ্চিমি বর্বররা লুঠ করে নিয়ে গেছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে। হ্যাঁ, ওই কালো ভাই বন্ধুরা দাস হয়ে পৌঁছেছিলেন আমাদের এই দেশেও এমনকী কোম্পানির রাজধানী নয়াপত্তন কলকাতায়ও।

কলকাতার কথাই যখন হচ্ছে তখন তাঁদের দুঃখের কাহিনীই-বা ভুলে যাই কেমন করে? আফ্রিকা থেকে ভারতে ক্রীতদাস আমদানির ব্যাপারে অগ্রপথিক সেই পর্তুগিজরা। ওদের দাস বোঝাই জাহাজ ভিড়ত গুজরাতের উপকূলে। সেখান থেকে চালান যেত কাথিয়াবার, কচ্ছ এবং সিন্ধু প্রদেশের নানা ঠিকানায়। একাংশ পৌঁছাত পর্তুগিজ অধিকৃত গোয়া দামন ও দিউয়ে। ১৮৩৬ সালে কাথিয়াবাড়ের ইংরেজ

পলিটিক্যাল এজেন্ট, বা স্থানীয় দরবারে ইংরেজ রাজের স্থায়ী প্রতিনিধি বা দূত, জানাচ্ছেন ছয়-ছয়টা জাহাজ নিয়মিত মোজাম্বিক থেকে দাস নিয়ে আসছে পর্তুগিজদের এলাকায়। এক যাত্রায় সেবার আনা হয়েছিল ৪৯ জন শিশুকে। বয়স তাদের ৪ থেকে ১০ বছর। আর আনা হয়েছিল ৩০টি মেয়েকে। তাদের বয়স ৫ থেকে ১৫ বছর। 'জাহাজ থেকে নামাবার পর তাদের রাখা হয়েছিল খোলা বাক্সে। কারও গায়ে একটি সুতোও নেই। কলকাতার ইংরেজি কাগজে কাগজে এত 'কাফ্রি' কোথা থেকে এল তার ইঙ্গিত মেলে এই সমাচারে।

তার এক যুগ আগে ১৮২৩ সালে এই শহরের কাগজ সুখ্যাত 'ক্যালকাটা জার্নাল' জানাচ্ছে, কলকাতা এক গোলামের বৃহৎ আড়ত। শোনা গেল এই মরশুমে আরব নাবিকেরা এই শহরে ১৫০ জন খোজাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বিক্রির জন্য। এই আরব বণিকরাই ফেরার পথে এখান থেকে আরব মুলুকে নিয়ে যাবে এ দেশের পণ্য, দাস এবং দাসী। দ্বিতীয় দলেরই নাকি বাজার বেশি তেজি! তার সাত বছর পরে ১৮৩০ সালের খবর, লখনৌর নবাবদের জন্য কিছু আফ্রিকান ক্রীতদাস কলকাতায় পৌঁছেছে। তারা সবাই কি আর লখনৌ পৌঁছাতে পেরেছিল? আফ্রিকার বান্দা আর বাঁদিদের জন্য কলকাতায় সেদিন রীতিমতো কাড়াকাড়ি। শহরের ইংরেজি কাগজে একজন সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁদের খুঁজছেন। সেই বিজ্ঞাপনের ভাষা এ কালের বাংলা কাগজে সুপাত্রের মা-বাবার। তাঁরা যে কুশ্রী নির্লজ্জ ভাষায় প্রকৃত সুন্দরী খোঁজেন তাদেরও লজ্জা দেবে। সাহেব বলছেন, হ্যাঁ, ইনি একজন 'জেন্টলম্যান'! তিনি অত্যন্ত সুরূপা দু'জন আফ্রিকান কন্যা চান। সেই মেয়েরা যাদের অসংস্কৃত বা অনর্থ ভাষায় বলা হয় 'কাফ্রি', তিনি তাঁদেরই চান। তাঁদের দু'জনেরই বয়স কমপক্ষে চৌদ্দো হতে হবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই পঁচিশের বেশি হলে চলবে না। তাঁদের শরীর হবে দীঘল, হাত-পা লম্বা লম্বা, এবং সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মসৃণ। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি তাঁদের এমন দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে দেব, যাঁরা দেহবর্ণে এবং কুল পরিচয়ে তাঁদের তুল্য। এই বরদের জন্য তাঁদের কোনও পণের কড়ি গুণে দিতে হবে না। তবে এই আফ্রিকার বরদের মনোবাসনা যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য কনে নির্বাচনের আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে, তারা যথার্থই কুমারী।

এই ঘটকালি কি হেঁয়ালি বলে মনে হয় না? কিন্তু যে-কোনও অপক্ক দাস ব্যবসায়ীও জানেন, এই 'ভদ্রলোক' আসলে কী করতে চলেছেন। সে-রহস্য ভেদ করে দিয়ে গিয়েছেন ইংরেজের কলকাতার উপরতলার ইতিবৃত্ত লেখক সুপরিচিত ডাঃ বাস্টিড। তিনি লিখেছেন, এক সময় কলকাতায় এমন কিছু কিছু ইংরেজ ছিলেন যাঁরা আফ্রিকার দাস-দাসী কেনাবেচা করেই ক্ষান্ত হননি, বাজারের কথা চিন্তা করে তাঁরা দাস তৈরির বন্দোবস্তও করেছিলেন। তাঁদের কারখানা ছিল দাস মেয়েদের গর্ভাশয়! আমেরিকার দাস-মালিকদের দোসর এ দেশেও ছিলেন বইকি। ছিলেন এমনকী আমাদের এই কলকাতায়ও।

'গ্লোবালাইজেশন', বাণিজ্যের ভুবনীকরণ মোটেই নতুন কিছু নয়। কবে থেকে তা চলছে কেউ তার সঠিক সাল তারিখ জানেন না। নারীর দেহ-পসরাকে অন্যায় ভাবে পুরুষতন্ত্র চিহ্নিত করেছে। 'ওল্ডেস্ট প্রফেশন' বা 'আদিম ব্যবসা' হিসাবে লেবেল এঁটে দিয়েছে। আসলে নারী ছিল সওদাগরের হাতে আদিম পসরা। মানুষকে যারা নির্দ্বিধায় পণ্য করতে পেরেছে, বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে গোলামের হাট, তারাই কিন্তু সেই দূর অতীতে শুরু করেছিল পুরুষের সঙ্গে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা। সুতরাং 'ওল্ডেস্ট প্রফেশন' নারীর নয়, শ্রেষ্ঠীদের 'ওল্ডেস্ট ট্রেড'-এর অনেকখানি জুড়ে ছিল এই নারী। তা না হলে ভার্জিনিয়া কিংবা কলকাতায় আফ্রিকার অসহায় নারী তার গর্ভ পর্যন্ত বিক্রি করে দেবে কেন?

নারী! নারী! হায়, আমাদের এই আলো-আঁধারি দুনিয়ায়ও সেদিন কত না কাণ্ড! ১৭৮০ সালের একটি খবর। শ্রীরামপুরের অদূরে একজন কৃষ্ণকায় সুন্দরীর জন্য দুইজন বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকের মধ্যে বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাঁদের বন্ধুরা সভয়ে দেখেন বিরোধ ক্রমে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বন্ধুরা তাঁদের নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন। এই কৃষ্ণা কোন বীরকে বরণ করেছিলেন কে জানে!

তারও অনেক আগে ১৭১০ সালে কোম্পানির খাতায় রয়েছে আর একটি ঘটনার বিবরণ। ইশাক বার্কলে বলে একজন ইংরেজ কর্মচারী অভিযোগ করেন ক্যাপ্টেন পেটন তাঁর কেনা বাঁদিকে ফুসলে নিয়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন পেটনকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি বলেন বার্কলে আসলে তাঁর দাসিকে কেড়ে নিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় কোম্পানির সাহেব-বিবিদের নীতি ও ধর্মবোধ বেশ ঢিলে ঢালা ছিল। ভোজ কিংবা নাচের আসরে পরস্ত্রী কি পর-স্বামীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি মোটে দূষণীয় ছিল না, যাকে বলে অবৈধ সম্পর্ক, তাও মাঝে মাঝে গড়ে উঠত। আধুনিককালে ফরাসিরা ইংরেজদের নিয়ে রসিকতা করেন, হ্যাঁ অভিনব ওঁদের ধারণা বটে, ওঁরা নাকি মনে করেন আমরা যাকে বলি পরদারগমন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যাডালটারি', বায়রন যার টীকা হিসাবে লিখেছিলেন,

হোয়াট ম্যান কল গ্যালানট্রি,
অ্যান্ড গডস অ্যাডালটারি,
ইজ মাচ মোর কমন হোয়্যার দ্য
ক্লাইমেট ইজ সলট্রি...

তা নাকি একমাত্র রাত্রেই সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রাত্রে স্বামী স্ত্রী যদি একসঙ্গে থাকেন, তাতেই সতীত্বের শেষ প্রমাণ। যাক গে, বায়রনের কথা মতো, দুই সাহেব পরস্পরের দুই ক্রীতদাসীকে নিয়ে বিবাদে এমন মেতে ওঠেন যে, শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ওঁরা বাধ্য হন বাঁদি বদল করতে। 'স্ত্রী-বদলের' মতো 'বাঁদি-বদল', নারী বিলাসের নতুন দৃষ্টান্ত বটে। প্রসঙ্গত, একটি মেয়ের নাম ছিল বারবারা, অন্যটির লুক্রেসিয়া।

যাঁরা ভাবছেন এ দেশীয় মেয়ের এমন নাম হল কেমন করে, তাঁরা জেনে রাখুন, ব্যাপারটা ডাল ভাতের চেয়ে সহজ। বাঁদি কেনা হয়ে গেলে মালিক তাদের নিয়ে হাজির হতেন গির্জায়। পাদ্রি তাদের মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র আউরে বলতেন, যাও বাছা, পরম করুণাময় যিশুর নাম নিয়ে এ বার নতুন জীবন শুরু করো। সেইসঙ্গে তিনি এ কথাও বলে দিতেন যে, আজ থেকে তোমার নাম হল— বারবারা। কিংবা লুক্রেশিয়া। আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে তা-ই শুনতাম। তারপর চলে যেতাম মনিবের ঘরে।

হ্যাঁ, পাদ্রিরা নিজেরাও দিব্যি দাসদাসী কিনতেন। তাঁদের ঘরেও ক্রীতদাসের অভাব ছিল না। কলকাতায় লালবাজারের উলটো দিকে এখনও রয়েছে বিশাল-মিশন চার্চ। তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সুখ্যাত যাজক পাদ্রি কিয়ের ন্যান্ডার-এর গরবিনী বিবির ছিল দু'জন ক্রীতদাস। এক সময় কাছাকাছি ছিল সেন্ট অ্যান গির্জা। তার একজন সাধারণ যাজক সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় (১৭৫৬) তথাকথিত ব্ল্যাক হোল-এ মারা যান। কোম্পানির ফৌজ ফের কলকাতা দখল করার পর গভর্নর হলওয়েল সাহেব তাঁর অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে দু'জন ক্রীতদাসও নিলামে বিক্রি করেন। ছেলেটির বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছিল ১০৮ টাকা ৪ আনা ৩ পাই, মেয়েটির দাম উঠেছিল ৪৮ টাকা ৯ আনা ৬ পাই। সাধারণত দাসদের হাটে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দাম বেশিই হত। অবশ্য যদি সোমত্ত মেয়ে হয়। এ ক্ষেত্রে দামের তারতম্য দেখে মনে হয় সে-বেচারা নিতান্ত শিশু ছিল, কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মনিবহীন হয়ে ছিল রুগ্ন, অনাহার ক্লিষ্ট।

তার মানে এই নয় যে, দাসদাসীরা সব সময় মনিবের সংসারে সযত্নে লালিত হত, তাদের খাওয়া-পরার কোনও সমস্যা ছিল না। যাঁরা মানুষ হয়েও অন্য মানুষকে বান্দা বা বাঁদি বানাতে পারেন, যাঁদের মনে কোনও প্রশ্ন নেই, যাঁদের নেই কোনও বিবেক বা বোধ তাঁদের কাছ থেকে সাধারণ মানবিক আচরণ আশা করা যায় কেমন করে? বরং বিপরীত আচরণই তো প্রত্যাশিত। সুতরাং দাস দাসীদের জন্য যদি কম খাদ্য এবং বেশি কাজ বরাদ্দ হয় তাতে অবাক হওয়ার কী আছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও ক'জন দাস পেরেছিল প্রভু বা প্রভুপত্নীকে খুশি করতে?

সুতরাং ১৮২৮ সালে দানাপুর থেকে যখন ভেসে হল সেই মর্মান্তিক খবর যে, একজন ইংরেজ লেফট্যানান্ট তাঁর বালক দাসকে রেগে গিয়ে খুন করেছেন, তখন কলকাতার দাসরা নিশ্চয় কেউ চমকে ওঠেনি। তারা জানত যে-কোনও দিন তারা হতে পারেন উন্মত্ত প্রভু বা ততোধিক উন্মত্ত বিবির ক্রোধের শিকার। কলকাতায় প্রতিদিন যা ঘটছে তাও কি কান্নার উপলক্ষ হতে পারে না? মার-ধর, যুবতীর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া, গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া এ সব তো কিছুই নয়। পালিয়ে গেলে সহজে যাতে সনাক্ত করা যায় তার জন্য কোনও মনিব হয়তো নিজের নামের আদ্যক্ষর দুটি গরম লোহায় চিরকালের মতো তার গোলামের হাতে পিঠে মুদ্রিত করে দিতেন। পায়ে মাংসের মধ্যে লোহার আংটিও নাকি পরিয়ে দিতেন কেউ কেউ।

কলকাতায় একটি তরুণীকে একবার হাত-পা বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে অন্য দাসদের সামনে তার উলঙ্গ দেহে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল। এ খবর সমসাময়িক এক ইংরেজেরই দেওয়া। তিনি লিখেছেন,—মনিব অন্য দাসদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্যই এটা করেছিলেন। সাবধান, কেউ যেন তাঁর পবিত্র ক্রোধ জাগ্রত না করে। আর এক মালিক ছিলেন সম্ভবত ঈষৎ ধর্মভীরু। তিনি বিকল্প হিসাবে বরাদ্দ করেছিলেন অন্য শাস্তি।

১৮২৭ সালে মারিয়া ডেভিস নামে এক মহিলা রক্তের নেশা মিটিয়েছিলেন জলে। ঘুমন্ত মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিসেম্বরের ভোরে তিনি তাকে বিবস্ত্র করে বসিয়ে দিয়েছিলেন উঠোনে কুয়োর ধারে। মেয়েটির নাম নাসিবুন। তারপর অন্য দাসদের হুকুম দিয়েছিলেন—জল ঢাল। বেচারার মাথায় গায়ে বিরামহীন ঢালা হল বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল। মেয়েটি সংজ্ঞাহীন। মিসেস ডেভিস তৃপ্ত। জল যে রক্তের বিকল্প হতে পারে কলকাতার দাস মালিকদের চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন। শহরের ইংরেজি টোলায় তাঁর জয়জয়কার। কিন্তু সবার তাতে মন ভরবে কেন? একজন মহিলা তাঁর ক্রীতদাসীর কপালে গরম লোহায় লিখে দিলেন—"লায়ার!" অর্থাৎ মিথ্যাবাদী। এ ঘটনা ১৮৪৩ সালের। আহা! সাহেব-মেমদের যেন কেউ কোনওদিন মিথ্যে কথা বলেন না! যেন পৃথিবীতে এই একটি ভারতীয় মেয়েই প্রথম ও শেষ মিথ্যুক।

অসহ্য এই নরক থেকে অতএব সুযোগ পেলেই আমরা পালাতাম। আমরা মানে অষ্টাদশ উনিশ শতকের কলকাতার কেনা গোলামবাঁদিরা। সমসাময়িক শহরের ইংরেজি কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগের উপর একবার চোখ বোলাও। দেখবে আমরা মিথ্যে বলছি না। ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

> আমার নাম ইন্দে। আমার বয়স কত আমি জানি না। ডানকান একদিন বলাবলি করছিলেন, এই তো সবে বারো হল। হতে পারে। আমি জানি না। জানি এখনও আমার দাড়ি গোঁফ হয়নি। আমি ছিলাম চিনাবাজারে ডানকান সাহেবের কেনা গোলাম। ডানকান সাহেবকে লোকেরা বলে মিস্টার রবার্ট ডানকান। গত বৃহস্পতিবার এক সুযোগ পেয়ে আমি সাহেবের জিঞ্জির কেটে পালালাম। এ ভাবে কেউ বাঁচে? সামনে বিশাল শহর। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি কত লোক এই শহরে। সবাই কি আমার মতো গোলাম? সুতরাং এক ছুটে মিশে গেলাম শহরের ভিড়ে। পালিয়েছি, বেশ করেছি, তাই না? মহল্লায় একটা দোকানে লোকেরা বলাবলি করছিল পালিয়ে যাওয়া গোলামকে ধরে আনতে পারলে তিনি একটি সোনার মোহর পুরস্কার দেবেন। সোনার মোহর! সুতরাং ধীরে ধীরে সেখান থেকে অন্য ভিড়ে মিশে গেলাম আমি। দেখি কে বেশি চালাক, ওই বুড়ো সাহেব, না আমি!

পাতা উলটান। আবার বিজ্ঞাপন।

> আমি অষ্টাদশ শতকের কলকাতার আর এক গোলাম। যৎসামান্য পড়ালেখা ছিল আমার। মেমসাহেব আমাকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার দু'চোখের বিষ। তাঁর ন্যাকা 'খুকি খুকি' ভাব একদম বরদাস্ত করতে পারতাম না আমি। ও দিকে বউয়ের জন্য সাহেবের সোহাগ উপচে পড়ছে। তিনি আমাকে মেমসাহেবের খাস খিদমদগার করে দিলেন। মনে মনে আমি প্রমাদ গুনলাম। এই বিবি কোনওদিন কী কাণ্ড করে বসবেন কে জানে, তখন আমার প্রাণটি যাবে। বিজ্ঞাপনটা ভাল করে পড়লেই বুঝবেন কেন আমি ভয় পেয়েছিলাম। সাহেব জানাচ্ছেন আমার বয়স ২০/২১ বা তার কাছাকাছি। গায়ের চামড়া উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। ছিপছিপে লম্বা গড়ন, চোয়াল চওড়া, মুখে বসন্তের দাগ। সাহেব সবাইকে অনুরোধ করছেন কেউ যেন আমাকে কেরানি বা অন্য কোনও পদে বহাল না করেন। আর, কেউ যদি আমার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁকে যথোপযুক্তভাবে পুরস্কার দেবেন, আগাম এই প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছেন। একুশ বছরের ছিপছিপে তনু গৌরাঙ্গের জন্য মেমসাহেব কি তবে শয্যা নিয়েছেন? মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। আমি কেরানির কাজ কোথাও পাই কি না পাই, দূর কোনও গাঁয়ে পালিয়ে গিয়ে লাঙ্গল ঠেলার কাজই না হয় নেব, কিন্তু এ জীবনে আর না। কোথাও যদি দু'দণ্ড দাঁড়াই, তবে তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজেকে তাড়া দিই,—ওরে পালা! পালা!

এসব খবর ১৭৮০ সালের। সে-বছরেরই আর একটি বিজ্ঞাপন দেখো। বলা হচ্ছে,—

> "বিক্রি! বিক্রি! একটি চমৎকার কাফ্রি তরুণ বিক্রি হচ্ছে। সে বাটলারের কাজ জানে, সে প্রয়োজনে আবার খিদমদগার, এমনকী বাবুর্চির কাজও করতে পারে। দাম—চারশো সিক্কা টাকা। কোনও ভদ্রলোকের প্রয়োজন হলে সত্বর খবরের কাগজের অফিসে যোগাযোগ করুন। ইত্যাদি।

এ বালক কি কোনওদিন পালাতে পেরেছিল? জানি না। সবাই তা পারে না। অনেকে ভাগ্যকে মেনে নেয়। অনেকে দাসজীবনেই ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অন্য কোনও জীবনের কথা আর ভাবতে পারে না। ফলে কেউ কেউ নিঃশব্দে হাতবদল হতেও রাজি হয়ে যায়। সমসাময়িক একটি বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনে দেখছিলাম, ভাগ্যবান ক্রেতা ফাউ হিসাবে বাড়ির সঙ্গে পাবে একটি যৌবনবতী মেয়েকে, যে ছিল বিদায়ী সাহেবের প্রিয় বাঁদি! সাহেব আর তাঁকে দেশে নিয়ে যাবেন কেমন করে? সুতরাং কোনও স্বদেশীয় প্রভুকে উপহার দিয়ে যেতে চান। হ্যাঁ, সেই যুগে মানুষ যখন অতিশয় সস্তা তখন ভাগ্যবানরা দাসদাসীও উপহার পেতেন বইকি!

আমি কিন্তু হাতবদলের অপেক্ষায় থাকিনি। কলকাতায় সেটা পুজোর মরশুম। সাহেব কুঠিতে আমার সমবয়সী আরও একটি গোলাম ছিল। মাথায়ও দু'জনে সমান সমান। আমার নাম সাম, ওর নাম টম। দু'জনে শলা করে ঠিক করলাম আমরা আর কেনা গোলাম হয়ে থাকব না। আমরা পালাব। যা-ই থাকুক কপালে, আমরা পালাব। আমাদের মনিবের নাম ভ্যালেনটিন দু বোঁয়া। তিনি একজন মিলিটারি অফিসার। কিল, ঘুষি তাঁর লেগেই আছে। এমন নিষ্ঠুর মানুষ কমই হয়। নিজেই বিজ্ঞাপনে বলছেন—আমাদের বয়স মাত্র এগারো বছর। সঙ্গে সঙ্গে যে-কথাটা তিনি গর্ব করে জুড়ে দিয়েছেন তা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে কী নিষ্ঠুরই ছিলেন এই সাহেব। তিনি বলছেন, আমাদের দু'জনেরই হাতে কনুইয়ের উপরের দিকে চামড়ায় লেখা রয়েছে 'ভি ডি', এই দুটি হরফ, অর্থাৎ সংক্ষেপে তাঁর নিজের নাম। তিনি অপবাদ দিয়েছেন পালাবার সময় আমরা নাকি কিছু ডিশ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে গেছি। পোড়া কপাল! আমরা ডিশ দিয়ে কী করব। আরও একটা জিনিস খেয়াল করার মতো। তিনি টোপ ফেলেছেন বাঙালি টোলায়ও। বলছেন কোনও "কালা আদমি" যদি আমাদের ধরে দিতে পারে তবে তাকে একশো সিক্কা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দেখা যাক।

এই ঘটনা ১৭৮৪ সালের। পরের বছর ১৭৮৫ সালের ডিসেম্বরে শহরে আবার চাঞ্চল্য। কাগজে বিজ্ঞাপন ফের দুইজন ক্রীতদাস পালিয়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, রেভারেন্ড বানচার্ড। তিনি বলছেন তাঁর দু'জন দাস পালিয়েছে। মালয়ের দাস।

হ্যাঁ, আমরা দু'জন মালয়ের দাস পালিয়েছিলাম। পালাব না কেন? কোথায় মালয় দেশ আর কোথায় কলকাতা! আমরা কি এখানে পাদ্রির সেবার জন্য জন্মেছিলাম? সাহেব বলছেন পালাবার সময় আমরা একটা সোনার চেন সমেত সোনার ঘড়ি সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছি। তা ছাড়া রুপোর তৈরি একটি জুতো, সাধারণ জুতোর রুপোর বকলেশ এবং একটি টাকার থলিও নিয়েছি। তাতে নয়টি সোনার মোর ছাড়াও খুচরো টাকাকড়ি ছিল। আমরা আরও নিয়েছি ইউরোপীয় বেশ কিছু রেশমি ও ভেলভেটের কাপড়চোপড় এবং আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকার সম্পদ। এই হিসাব কতখানি বানানো বা ফাঁপানো তা নিয়ে আমরা কিছু বলব না। পাদ্রি হলেই যে তিনি সত্যবাদী হবেন তা কে বলতে পারবেন? তা ছাড়া এ প্রশ্ন কি কারও মনে উঠবে না যে, পাদরির ঘরে এত রেশমি ভেলভেটের, এত সোনাদানার ছড়াছড়ি কেন? যাকগে, সাহেব সন্দেহ করেছেন আমরা যখন মালয়ের লোক, তখন নিশ্চয় আমরা মালয়ে ফিরে যেতে চাইব। তার মানে কোনও জাহাজে মাঝিমাল্লাদের

সঙ্গে মিশে দেশে ফিরে যাব। জাহাজের সব কাপ্তানদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, চোখ খোলা রাখার জন্য। অন্যদের বলছেন, কেউ যদি ওদের খোঁজ খবর দিতে পারেন, তবে তাকে নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে নগদ তিনশো সিক্কাটাকা! বেশ তো, পারে তো ধরুক না ওরা আমাদের!

১৭৮৯ মে মাসে আবার খবর—“ইলোপড!” এতকাল তোমরা দেখেছ, ওঁরা বলতেন—“রান অ্যাওয়ে!” এখন নতুন কথা, ‘ইলোপড’, যেন কোনও দাস কোনও মেমসাহেবকে নিয়ে পালিয়েছি। মোটেই কিন্তু সে ধরনের কোনও ব্যাপার নয়। ৫১ নম্বর কসাইটোলার মিঃ পার্কিস যা বলছেন, তা-ই শুনুন। তিনি বলছেন তাঁর বাড়ি থেকে একজন ক্রীতদাস পালিয়েছে। ব্যস, আসল খবর এটুকুই, তাতে ওই “ইলোপ” আসছে কোথা থেকে। বিজ্ঞাপনটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন। সাহেবের বক্তব্য :

> আমার একজন ক্রীতদাস পালিয়েছে। তার বয়স চৌদ্দো বছর। গায়ের রং ফিকে। ঠোঁট পুরুষ্টু। হাঁটে হেলেদুলে। মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া চুল। চুল ঘাড়ে নেমে এসেছে। সে পালিয়েছে খিদমদগারের পোশাকে। ছেলেটি দিব্যি ভাল ইংরেজি বলে। গলার স্বর কিছুটা মেয়েলি। সবাই তাকে টম নামে চেনে। ধরে নিতে অসুবিধা নেই সে অনেক কিছুই সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে। (ইট ইজ সাসপেকটেড দ্যাট হি হ্যাজ স্টোলেন ম্যানি থিংস।”) সে আবার কী কথা। সন্দেহ করা মানে কী, তোমার কী জিনিস চুরি করেছি তা বলতে পারছ না কেন? এই তো মজা। দাসদের প্রভুরা জানেন না, সোনা দানা নয়, রেশমি পশমি পোশাক নয়,—দাসদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান তার জীবন। তার স্বাধীনতা। সাহেব যথারীতি ঘোষণা করেছেন কেউ আমাকে ধরিয়ে দিলে তিনি পুরস্কৃত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুসিয়ারি,—কেউ একে আশ্রয় দিলে আইন মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

না, আমরা কেউ ধরা পড়িনি। প্রভুদের পক্ষে সেটা সহজ ছিল না। প্রথমত নগরের সেই কৈশোরেও রীতিমতো ভিড় এই জনপদে। এখানে সবাই কালো অথবা তামাটে। সাদা মানুষ গোনাগুনতি তাঁরা সবাই সাহেবটোলার বাসিন্দা। বাদবাকি যে শহর, দৈর্ঘ প্রস্থে যা ওঁদের মহল্লার চেয়ে অনেক বড়, ওঁরা তাকে বলে ব্ল্যাকটাউন, কৃষ্ণনগর। সেদিকে সহসা ওঁরা বড় একটা পা বাড়ান না। কেন-না, সেখানে পাতা রয়েছে মৃত্যুফাঁদ। সেখানে পথে জঞ্জালের স্তূপ, নর্দমা পুতিগন্ধময়, রাস্তায় কাদা, গোড়ালি ছাপিয়ে তা কোথাও কোথাও হাঁটুতে পৌঁছাতে চায়। পলাতক গোলামের কাছে ঈশ্বর বর্জিত ছন্নছাড়া এই অনাসৃষ্টির মতো আশ্রয় আর কী হতে পারে? দ্বিতীয়ত, ওঁরা কাগুজে বাঘ, ওঁদের যত গর্জন ওই ছাপানো কাগজে। ইংরেজি কাগজ ক'জন পড়েন কালো শহরে? তার পড়ুয়া সাহেব-মেমরা নিজেরাই। তাঁদের ঘরে, অফিসে আদালতে, রেস্তোঁরায়, হোটেলে, থানাদারের টেবিলে কাগজ হয়তো পৌঁছায়, কিন্তু

সেই ছোট্ট চৌহদ্দির বাইরে নয়। সুতরাং, আমরা কাগুজে হুমকিতে ভয় পাব কেন? ভয় একমাত্র সাহেব কুঠির এ দেশীয় ভৃত্যকুলকে। তারাই আমাদের পালানোর খবর পায় সকলের আগে। মিথ্যা যোগসাজসের কথা পেড়ে দু'-চারজনের হয়তো শাস্তিও হয়। কিন্তু যারা প্রতিদিন নিজেদের চোখে কেনা গোলামের লাঞ্ছনা এবং অপমান দেখে অভ্যস্ত, তারা মনিবকে খুশি করবার জন্য আমাদের ধরবার জন্য ব্যস্ত হবে বলে তো মনে হয় না। তারা নিজেরাও কি কম অত্যাচারিত? নেহাৎ পেটে ভাত নেই, ঘরে বালবাচ্চা রয়েছে, নতুবা সাহেব কুঠিতে নকরি করে কে? দু'-চার জন দয়ালু মনিব হয়তো আছেন, দু'-চারজন শান্ত মেজাজের মেম সাহেবও যে না আছেন এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশই তো সব সময় অগ্নিশর্মা। ইংরেজি গালাগালি তাঁদের মুখে লেগেই আছে। কেউ কেউ হিন্দুস্তানি বুলিও শিখে নিয়েছেন, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্তানিতে যা বলেন শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। এক এক সময় রক্ত টগবগ ফুটতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। পেটে ক্ষুধা। সুতরাং, সাহেব কুঠির মাইনে করা নোকর শীতকালের নির্জীব সাপের মতো সাহেব-বিবির পায়ের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তারা যখন দেখে দু'-একজন কেনা গোলাম বা বাঁদি ওঁদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন হয়তো মনে মনে খুশিই হয়। তবে হ্যাঁ, এটা মানি, গরিবের অর্থলোভ থাকাও খুবই সম্ভব। বাজারের পয়সা থেকে দু'-চার আনা চুরি করতে ওরা কত ছলনাই না জানে। তারা হয়তো বকশিসের লোভে লাফিয়ে উঠতে পারে। স্বর্ণলোভে চকচক চকচক করতে পারে তাদের লোভাতুর চোখ। কিন্তু তাদের এতখানি ক্ষমতা নেই যে, ব্ল্যাক টাউনের ততোধিক অন্ধকার বস্তির কোনও ঘর থেকে আমাদের খুঁজে বের করতে পারে। বস্তির গরিবরা কিন্তু পলাতক দাসদের প্রতিই বেশি সহানুভূতিশীল, তাদের যারা ধরতে চায় সেই পুরস্কারলোভীদের প্রতি নয়। তা তারা সরকারি চৌকিদারই হোক, আর সাহেব কুঠির পাইক বরকন্দাজ দারোয়ানই হোক।

তা সত্ত্বেও যদি আমরা কেউ ধরা পড়ে থাকি, তবে হে পাঠক, মানুষের সন্তান হলে তুমি আমার জন্য দু'ফোঁটা অন্তত চোখের জল ফেলো। তুমি হয়তো জানো না, কলকাতার চাঁদনি চকের কাছে এখনও একটি গলি রয়েছে নাম যার গুমঘর লেন। সেখানে কে কাকে গুম করে রেখেছিল! এই বান্দাকে? না কি, আমার মতো আর কোনও হতভাগ্যকে?

তোমরা সেদিনের হিন্দুস্থানের আমড়াতলার গোলামখানার বাসিন্দারা সুখী পণ্য। অশ্বারোহীরা তোমাদের দুয়ারে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে অর্ঘ্যের মতো তোমাদের গ্রহণ করে, বিজ্ঞাপন দেখে যারা আসে সেই ভবিষ্যৎ প্রভুরাও প্রিন্টারের বাড়ি গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। কিন্তু আমরা, জর্জিয়া, মিসিসিপি, মিসৌরি আর আলবামার খোলা বাজারে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে বিক্রয় হচ্ছি—তাদের চারপাশে জগতের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য। আগে থেকেই হাতে হাতে মুদ্রিত হ্যান্ডবিল বিলি হয়েছে। দূর দূরান্তের মানুষ এসে হাটে ভিড় করেছে। কেউ কিনতে এসেছে, কেউ

বেচতে এসেছে। কেউ এসেছে শুধু মজা লুটতে। সেদিনের মার্কিন কাগজগুলোতে তাদের কথাও লেখা আছে। হ্যান্ডবিলে মেয়েদের কথা উল্লেখ থাকলেই ওরা এসে ঘিরে দাঁড়াত, তারপর দিন শেষে আবার শূন্য হাতে যে যার পথ ধরত।

একদিকে এই দর্শক দল, অন্যদিকে দোকানি আর খদ্দের। সকাল থেকেই টাউনের স্লেভ মার্ট গমগম করছে। আমরা শেকল হাতে বসে আছি। যখন সময় হবে তখন ওই উঁচু মঞ্চটায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই বিশেষ সময়টার জন্যেই সুদূর আফ্রিকা থেকে আমাদের বয়ে আনা হয়েছে। ক'দিন ধরে আমাদের বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করা হয়েছে, গায়ে মাথায় তেল দেওয়া হয়েছে, দাঁত নখ পরিষ্কার করা হয়েছে, জাহাজে যে হাতের কাজই ছিল চাবুক চালান, সেই হাতই সযত্নে বসে বসে ক্ষত শোধন করেছে। হয়তো তোমাদের হরিহরছত্রের ঘোড়ার নকল লেজের মতো দিনান্তেই কারও কারও এই সাময়িক সুস্থতার আবরণটি খসে পড়বে, ঠিকানায় পৌঁছোবার আগেই প্রতারিত মনিব জেনে যাবে, সে মরা মানুষ কিনে ঘরে ফিরছে। কিন্তু তা হলেও হাট হাটই,—ঠকা জেতা সেখানে তো থাকবেই!

সুতরাং নীলামওয়ালা যখন হাতুড়ি পিটিয়ে চেঁচাচ্ছে—এইট হান্ড্রেড!—এইট হান্ড্রেড! নিউ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ গৃহস্থ তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, মঞ্চে দণ্ডায়মান মানুষটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে,—মানুষটা তার হাতের আঙুলগুলো সব ক'টি ঠিকমতো মুঠি করতে পারে কি? তা ছাড়া এটাও জানা দরকার লোকটি কি পরিমাণ খায়,—তার কোনও নেশা আছে কি?

সদ্য যারা এসেছে, দেখতে দেখতে তারা উবে গেল। এ বার পুরানোদের পালা। কেউ জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো আবার মঞ্চে উঠছে। কারণ তার দেহে বল কমে এসেছে। মালিক নতুন হাত চায়। কেউ হয়তো দাসের কর্তব্য ভুলে মুহূর্তের জন্যে অবাধ্য হয়ে ছিল। সেও এসেছে। মেজাজি প্রভু সে আপদ বিদায় করতে চান। কারণ তিনিও বিশ্বাস করেন, দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল! কাঠের কেবিনে আগুনের চেয়ে শূন্য কেবিনই নিরাপদ। তা হলই বা সে আগুন স্ফুলিঙ্গ!

আমি জর্জিয়ার বাঁদিকন্যা এলিজা (১৮৪৭), দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরে আবার হাটে এসেছিলাম, অবশ্য অন্য কারণে। আমি, আমার বাবা, মা—আমরা সবাই সুখ্যাত স্মিথ সাহেবের গোলাম ছিলাম। আমরা কেউ দুর্বিনীত ছিলাম না। স্মিথও আমাদের প্রতি অসদয় ছিল না। কিন্তু তবুও আমাদের দল বেঁধে আবার হাটে আসতে হয়েছিল, কারণ আমি এলিজা, বাঁদির মেয়ে এলিজা কোন করুণাহীন ঈশ্বরের চক্রান্তে জানি না, সুন্দরী হয়ে জন্মেছিলাম। খামার মালিকের ঘর, বিলাসির হারেম নয়,—স্মিথ আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ল। সে ভাবনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কারণ আমি এখন আমার মায়ের চেয়েও মাথায় উঁচু মস্ত মেয়ে, তুলো ক্ষেতে সবচেয়ে জোয়ান তরুণটির স্বাস্থ্য আমার দেহে। দূরের যাত্রীরা আমাকে দেখতে পেলে মাঠের কাছে ঘোড়া থামিয়ে ইতিউতি করে। বাড়িতে নতুন অভ্যাগতরা আমার দিকে আড়ে আড়ে

তাকায়। তা ছাড়া স্মিথের কেবিনের দাসদের মধ্যে আমাকে উপলক্ষ করে মারামারি লেগেই আছে। নিরীহ, গোবেচারা মানুষ স্মিথ, তাই এক দিন বলে উঠল—যাঃ, তোকে বেচেই দিয়ে আসব। খবর শুনে আমার বাবা মা ওর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। স্মিথ আশ্বাস দিয়েছিল—ভয় নেই, তিনজনকে একসঙ্গেই পাঠাব।

প্রথমে মঞ্চে তোলা হল বাবাকে। তার অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ফিরিস্তি শেষ হতে না হতেই, একটি লোক এগিয়ে এসে হাজার ডলার ঘোষণা করল। বাবা বিক্রি হয়ে গেল। এ বার উঠল মা। মাঠ এবং ঘরকন্নার কাজে তারও অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। সুতরাং সেও বিকিয়ে গেল। সেই লোকটিই কিনল। এ বার আমার পালা। আমি কাঁদতে লাগলাম। মা বিক্রি হয়ে গেছে বাবা বিক্রি হয়ে গেছে, কে জানে আমাকে কে কিনবে।

নিলামওয়ালা হাতুড়ি পেটাতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—নাইন হান্ড্রেড!—নাইন হান্ড্রেড! দুটি লোক সাড়া দিয়ে বলল—থাউজেন্ড! তাদের পেছনে ফেলে আর একটি মানুষ সামনে এগিয়ে এল, তারপর আমার উলঙ্গ শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—টুয়েলভ হান্ড্রেড! নিলামওয়ালা চেঁচাচ্ছে টুয়েলভ হানড্রেড!—টুয়েলভ হানড্রেড! কোথাও কোনও সাড়া নেই। ভয়ার্তের মতো আমি চারদিকে সেই মানুষটিকে খুঁজতে লাগলাম, যে আমার বাবা আর মাকে কিনেছে। আশ্চর্য লোকটি নিঃশব্দে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি সে আমাকে কিনতে চায় না? তবে কি তার ডলার ফুরিয়ে গেছে?—আমাকে আমার মা বাপ ছেড়ে এই অসভ্য মানুষটিরই পিছু পিছু অন্য পথে পা বাড়াতে হবে? ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি কাঁদতে লাগলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাবা, মা ওরাও কাঁদছে। নিলামওয়ালা শেষবারের মতো চেঁচাচ্ছে—টুয়েলভ হান্ড্রেড! টুয়েলভ হান্ড্রেড! আমার সামনে থেকে আঠারো বছরের পরিচিত পৃথিবীর বন্ধনগুলো ধীরে ধীরে খসে পড়ছে, মা, বাবা, স্মিথ, কেবিন, তুলো খেত, বুড়ো পাদ্রি—সব উধাও হয়ে যাচ্ছে; আমি বাঁদির মেয়ে এলিজা হাত বাড়িয়ে যা ধরতে চাইছি তা-ই ফস্কে যাচ্ছে, আমি তলহীন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি, আমি বোধহয় অজ্ঞান—ফিফটিন হান্ড্রেড ডলারস!

হঠাৎ কার গলার স্বরে যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। চোখ খুলে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবদূত, তামাক চাষির ছদ্মবেশে সেদিন যে হাটে এসেছিল, আমার বাবাকে, আমার মাকে কিনেছিল। বারোশো ডলারের মানুষখেকো খদ্দেরটি ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেঁট করে একপাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি অবিকল দেবতার মতো মিষ্টি গলায় আমার নাম ধরে বলল—এলিজা, কাম ডাউন!

কেবলি হৃদয়হীন কেনাবেচা, প্রাণহীন হাতে হাতে মরা ডলারের হাতফিরি নয়, মার্কিন দেশের হাটে হাটে কখনও কখনও এমন অবিশ্বাস্য নাটকও অনুষ্ঠিত হত। স্বর্গ থেকে নেমে এসে স্বয়ং দেবতারা তখন মানুষের মতো দরকষাকষি করত, যে মেয়েটি কাঁদছে তাকে বেছে নিয়ে উধাও হয়ে যেত, সকলের চোখের আড়ালে বসে তার চোখের জল মুছিয়ে দিত। আমি এলিজা বাঁদি হয়েও তাই আমার সুখের কথা গোপন

করতে পারিনি। বহুকাল পরে লিঙ্কনের লোকেরা যেদিন বুড়ি এলিজার কাছে তার দুঃখের কাহিনী শুনতে চেয়েছিল, আমি তখন উত্তর দিয়েছিলাম—আমি সুখী এলিজা। জীবনে আমার কোনও দুঃখ নেই, একমাত্র দুঃখ—আই নার্সড বেবিস্, অ্যান্ড অল স্লেভ বেবিস্!

তুমি ক'টি সন্তানের জননী হয়েছিলে এলিজা? আমরা সেদিনের মার্কিন দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা তা জানি না। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, তোমার দুঃখ আমাদের অজানা নয়। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রথম পদার্পণের পাঁচশো বছর পরে দুই কোটি কৃষ্ণাঙ্গের অনেকেই জানে না তাদের পিতামহী মাতামহী প্রপিতামহী বৃদ্ধমাতামহীরা কী অসহায় জননী,—তাদের অনেকেই জীবনে জানতে পারেনি মাতৃত্বের আনন্দ কী। জীবনে আমাদের অনেক দুঃখ ছিল,—টমচাচাদের কেবিনে সেদিন অনেক যন্ত্রণার আয়োজন। কাউ-হুইপ, বুল্-হুইপ, চিকেন-হুইপ—রকমারি চাবুক, শেকল, ওভারসিয়ার, 'ক্রসিফিকশন'। ওরা আমাদের কখনও কখনও মাঠের ধারে গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে কানে পেরেক ঠুকে আটকে রাখত, বলত—রোমানরা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারত, তোদের ভাগ্য ভাল, তাই কানের ওপর দিয়ে গেল। হাতের চাবুকটা নাচিয়ে ওভারসিয়ার গর্ব করে বলত—আমি ওভারসিয়ার কেন জানিস?—বিকজ আই ক্যান সি অল ওভার অ্যান্ড হুইপ অলওভার।

কাঁদতে কাঁদতে আমরা বড় পাদ্রির পায়ে লুটিয়ে পড়তাম, সে উপদেশ দিত—প্রভুকে অমান্য করা পাপ; এ জীবনে সৎভাবে কাজ করে যা, আর জীবনে নির্ঘাৎ স্বর্গের হেঁসেলে কাজ পাবি! পাছে আমরা পালিয়ে যাই সেই ভয়ে মালিকেরা হাতে হাতে এক খণ্ড করে কাগজ গুঁজে দিত, বলত—এগুলো 'পাশ', কোথাও পাহারাদাররা আটকালে এটা দেখাবি, তৎক্ষণাৎ ছাড়া পাবি। ওরা তবুও আমাদের ধরে পেটাতে পেটাতে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসত, চাবুকটা হাতে নিয়ে মালিক হাসতে হাসতে বলত—কাগজটায় কী লেখা ছিল জানিস? লেখা ছিল—গিভ দিস নিগার হেল!

আমাদের নিয়ে সেদিন ওদের অনেক খেলা, অনেক মজা। ওরা আমাদের সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিত না, তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। কেন-না, বৃদ্ধ অক্ষম ক্রীতদাস ডলার বানাতে পারে না,—সে লড়াইয়ের মাঠে সৈনিকের হাতে বিকল কামানের মতো, সে শক্তি নয়, বোঝা মাত্র। ক্যারিবিয়ানের দ্বীপগুলোর মতোই খাস আমেরিকাও তাই নির্দয় হাতে আমাদের মাঠে নামিয়ে দিত, অভাবিত শ্রম ঝাঁক ঝাঁক নেকড়ে হয়ে আমাদের কুরে কুরে খেত, বছর ঘুরে আসতে না আসতে আমরা বিশাল মানুষগুলো কয়েক খণ্ড হাড় হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তাম,—আমাদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত অ্যারিজোনার মাটিতে ফুটফুটে তুলো হয়ে ফুটত! মাসা আবার ঘোড়ার পিঠে হাটে ছুটত।

শুনতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্য। ওদের নিজেদেরই হিসেব দেখো। ১৮৫০ সনে লুসিয়ানায় আমরা সংখ্যায় ছিলাম—দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার

ন'শো পঁচাশি জন, ১৮৫৮ সনে মাথা গুনতি করে দেখা গেল, আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার ন'শো পঁচাশি জন। অর্থাৎ সাত বছরে আমরা বেড়েছি মাত্র কুড়ি হাজার। অথচ এ সময়ের মধ্যে চোরাপথেও বিস্তর দাস সেখানে এসেছে। কিন্তু তা হলেও স্বাভাবিক মানুষের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে আমরা আড়াই লক্ষ মানুষ বছরে তিন হাজারের বেশি বাড়তে পারিনি কেন?—আমাদের মধ্যে কি মড়ক লেগেছিল? আমাদের মধ্যে কি মরদের অভাব ছিল? না। সবই ছিল। কিন্তু তবুও আমরা প্রাণীজগতের ব্যতিক্রম হয়েছিলাম, কারণ, ওরা আমাদের মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। ওরা পরিশ্রম নামে হিংস্র নেকড়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছিল। আমাদের জন্যে নয়, আরও সস্তা তুলো, আরও সস্তা তামাকের জন্যে, ওদের কাছে তাই ছিল যুক্তিসম্মত।

সে যুক্তি যেদিন অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে, এলিজা তুমি সেকালেরই কৃষ্ণা তরুণী। তোমার দেবতার মতো প্রভু হয়তো সত্যিই তোমার সুখ হরণ করতে চায়নি। কিন্তু বিশ্বাস করো এলিজা, দাস-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখার বাসনায় ওরা যেদিন 'বেবি নার্সিং'য়ের চিন্তা মাথায় নিয়ে আমাদের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ায় সেদিন থেকে মানুষের সুখের শেষ বিন্দুটিও আমাদের জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে। যৌবন, ভালবাসা,—মা হওয়া, পিঠে নিজের সন্তানের বোঝা নিয়ে মাঠে কাজ করা—তাও যখন গেল, তখন রইল কী?

আগে আগে তবুও আমাদের হত। মাসা নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা দু'জনে লাফিয়ে একটা ঝাঁটা পার হতাম, মাসা বলত—যা, তোদের বিয়ে হয়ে গেল। সব সময় যে পছন্দের মানুষকে কাছে পেতাম তা নয়,—তবুও একটি মানুষকে-ই পেতাম,—সন্তানেরা জানত কে ওদের বাবা। কিন্তু দাস শিশু যেদিন পণ্য হয়েছে, সেদিন আমরা মানুষের কাহিনীতে সবচেয়ে অসহায় জননী। অন্ধকার কেবিনে কারা চোরের মতো আসে, দস্যুর মতো সব তছনছ করে চলে যায়, আমরা জানি না। শুধু এটুকুই জানি, তামাক খেত, তুলো খেত, আখ খেতের মতোই—আমরা রত্নগর্ভা, আমাদের এই মজবুত দেহে অনেক অনেক ডলারের সম্ভাবনা। আফ্রিকার উপকূল শূন্য হয়ে গেছে, এক একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসশিশু এখন রাশি রাশি ডলার, হলুদ সোনা। মাসারা তাই এখন আর তাদের গোলাম আর বাঁদির যৌবন নিয়ে ভাবিত নয়। তাদের একমাত্র চিন্তা আরও শিশু,—আরও।

সে কী অসহ্য যন্ত্রণা, এলিজা, তুমি ভাবতে পারবে না। আমরা বছরের পর বছর অজ্ঞাত জনকের সন্তান বহন করে চলেছি। শিশু ভূমিষ্ঠ হল। সে মাটিতে পা দিতে না দিতে কোলে এল আর একটি। মাসা বলল,—এ বার সেটিকেই দেখাশোনা কর, এটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি! পরেরটিও তাই হল, তার পরেরটিও। আমি মিসিসিপির মেয়ে ইস্থার—চৌদ্দ বছর বয়স অবধি আমি জানতাম—ছোটদের বনে পাওয়া যায়, দে কাম আউট অব হোলার লগ! কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তাই বনের ধারে ঘুরে বেড়াতাম, মা হওয়া আমাদের অনেকদিনের শখ আর সেই আমিই, আমি মিসিসিপির

মেয়ে ইস্থার—আজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কেবিনের মেঝেয় শুয়ে শুয়ে হিসেব করছি, আমি জন্ম দিয়েছি চৌদ্দটি শিশুকে! কিন্তু কোথায় তারা?—কোথায় আমার সন্তানেরা?

তোমরা, এ যুগের আমেরিকান ক্রীতদাসীরা তবুও পেয়েছ, পেয়ে হারিয়েছ। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের বাঁদিরা, যাদের নিয়ে সে যুগের ব্যাবিলন, কনস্টানটিনোপল, কায়রো আর বাগদাদে আরব্য উপন্যাসের আলো ঝলমল নিশি উৎযাপন; আমরা, যাদের গৌরবে ইস্তাম্বুল আর দিল্লির হারেম সকল হুরিদের প্রবাদ পুরীতে পরিণত—তারা আরও দুঃখী। সত্য বটে, পরিচয়ে প্রত্যেকে আমরা বাঁদি নই, কেউ কেউ বেগমও। আমরা অনেক ঐশ্বর্য দেখেছি,—অনেক মসলিন, অনেক কিংখাব, অনেক জড়োয়া অঙ্গে ধারণ করেছি।—কিন্তু সন্তান কদাচিৎ। আমরা অনেক গোলাপ হাতে পেয়েছি, অনেক আতর গায়ে মেখেছি, রাশি রাশি সুগন্ধী তাম্বুরীতে ঠোঁট রাঙিয়েছি।—কিন্তু ভালবাসা? সে বস্তু দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনও।

তোমরা প্রাসাদের পর প্রাসাদ বোঝাই সেই হাহাকারের কাহিনী জানো না। কেউ জানে না। বার্নিয়ার নিজে বলেছেন, তার চোখ বাঁধা ছিল। অন্যরা আরও অক্ষম দর্শক। পরিদের কথা শুনে শুনে তারা চিরকাল এক চক্ষু কিংবা জন্মান্ধ। নয়তো শুধু সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বোনকে ভালবাসার অপরাধে জনৈক খোজার প্রাণদানের কাহিনী নয়, কেবলই শাহজাদির প্রণয়ের মূল্য হিসেবে জনৈক তরুণের ফুটন্ত জলে নিঃশব্দে আত্মবলিদানের গল্প নয়,—আরও কিছু কিছু কাহিনী দুনিয়ার কানে আসত। সে কান্নায় কান পাতার আগে হারেম নামে কথিত এই অদ্ভুত দর্শন প্রাসাদটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখো।

চারপাশে উঁচু দেওয়াল। মাঝখানে বিরাট প্রাসাদ। স্থাপত্যে সেদিনের মুসলিম দুনিয়ার প্রতিভা আজও বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু এই প্রাসাদটির দিকে ভাল করে তাকালে জানা যাবে—নৈপুণ্য এই উঠোনটিতে পা দিয়েই কেমন জানি সন্দেহাতুর, আপন ঐতিহ্য থেকে পলাতক। সামনে কারুকার্যের অন্ত নেই, কিন্তু একদিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ অন্ধ। সেখানে কোনও জানালা নেই। দেওয়ালের মাথায় মরা মানুষের চোখের মতো জাফরি কাটা কাটা ঘুলঘুলি। সে সূক্ষ্ম পাথরের জাল ভেদ করে উঁকি দেবে বেচারা সূর্যের সে-সাধ্য নেই। হাওয়া অশরীরী বলেই তবুও মাঝে মাঝে আসে,—দীর্ঘশ্বাস টানা যায়। সামনে কোণের ক'টি ঘর বাদ দিলে অন্য ঘরগুলোতেও কোনও জানালা দরজা নেই। যাতায়াতের পথগুলোতে অস্বাভাবিক উদারতা। সেখানে ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার আড়ালে বেগম নামে খ্যাত আমরা ক্রীতদাসীদের জগৎ।

তুরস্কের সুলতান তাঁর এই প্রাসাদটিকে 'হারেম' বলেন, কারণ তিনি ছাড়া রাজ্যের আর সকলের কাছে এ বাড়িটি নিষিদ্ধ। 'হারাম' মানে নিষেধ, হারেম—নিষিদ্ধ এলাকা। পারস্যে ওরা বলত অন্দরম অর্থাৎ—অন্দর মহল। মোগলেরা কেউ কেউ

বলত—জেনানা। পারসিকে 'জান' মানে মহিলা। সেই থেকে এল 'জানানখানা', অর্থাৎ মেয়েদের বাসস্থান। জেনানা তারই অপভ্রংশ। তবে যে-নামেই পরিচয় দেওয়া হোক তার, তাকিয়ে দেখ আমাদের এ জগৎ 'দেওয়ানখানা' বা দেওয়ালের বাইরেই সুলতানের যে দ্বিতীয় প্রাসাদটি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

তুর্কি সুলতানের এই হারেমটি কনস্টানটিনোপলের আদর্শে সাজান। আমরা পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির কয়েক হাজার মানুষ এখানে থাকি। দু'-একটি মেয়েকে বাদ দিলে, সবাই আমরা গোলাম অথবা বাঁদি। কিন্তু তবুও পরিচয় আমাদের এক নয়। এই প্রাসাদের অধীশ্বরী যিনি, তিনি সুলতান জননী—'সুলতানা ভালিদ'। হিন্দুস্থানে নাম ছিল তার—পাদশাহী বেগম। তাঁর পরেই স্তরে স্তরে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে বেগমদের পরিচয়।

সুলতানের জ্যেষ্ঠ তনয়ের জননী যিনি সেই সম্মানিত প্রবীণাকে বলি আমরা 'বাসখাদিন এফেন্দি', —হার এক্সেলেন্সি দি লেডি চিফ। সম্ভবত হিন্দুস্থানে তাকেই বলা হত—খাস-মহল। তার পরে পর পর জন 'হানুম এফেন্দি'। তারাও হয়তো আমাদেরই মতো বাঁদি ছিল,—এখন গর্বিত বেগম। কারণ, তারাও সুলতানের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম। এই চারজনকে বাদ দিলে বাকি বেগমেরা সব—সহচরী মাত্র। তাদের একমাত্র গৌরব, সুলতানকে একদিন তারা কয়েকটি আনন্দিত মুহূর্তের জন্যে হলেও কাছে পেয়েছিল, আবার কোনওদিন হয়তো পাবে। সর্বশেষ হৃদয়ের মণিটিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে খেয়ালি বাদশা এ মহল্লায় ফিরে আসবে— ওরা তারই অপেক্ষায়। ওদের বলা হত—'ওদালিক', শয্যা-সহচরীর দল। হারেমে বিবাহিত বেগমদের কাছে কোনও মর্যাদা না পেলেও তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। কেন-না, ওরা কেউ রক্ত পরিচয়ে এখানে আসেনি। তাদের সকলেরই চোখ ঝলসান রূপ, হাতে, পায়ে, গলায় ঠোঁটে তুলনাহীন গুণ। কেউ ইতিপূর্বে নর্তকী ছিল, কেউ গায়িকা, কেউ কৌতুকী, কেউ-বা সুরসিকা। বিশ্বের হাট মন্থন করে তবে সুলতানের প্রাসাদে সে দুর্লভের সমাবেশ। স্বভাবতই তাদের মনোহরণে আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এলাকা নির্দিষ্ট ছিল, প্রত্যেকের মাসোহারা ছিল, বাঁদি ছিল, গোলাম ছিল।—কিন্তু সুখ ছিল কি? সে উত্তর পরে।

যারা বিশুদ্ধ বাঁদি তাদের প্রধানকে বলা হত—'কিয়ায়া খাতুন।' হারেমের মেয়ে মহলে সে সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তারপরে পদাধিকারে দ্বিতীয় যে সে কোষাধ্যক্ষা—'হাসনাদার ওয়াস্তা'। তারপর তৃতীয় দল—'কাল্ফা'। তাদের পরের স্তরে যারা তারা সাধারণ বাঁদি। তারা কেউ বেগমতনয়কে দুধ খাওয়ায়, কেউ পোশাক তৈরি করে, কেউ দেহরক্ষীর কাজ করে, কেউ সরবৎওয়ালি, কেউ বা সারারাত্রি বসে বসে নিদ্রাহীন বেগমকে ঘুম পাড়ায়। তার কাজ—কিস্‌সা বলা। সকলের সঙ্গেই একদল শিক্ষানবিশ আছে, তারা 'অলাইক'। তাদের সকলকে নিয়েই সুলতানের বেগম মহল,—বাইরের পৃথিবীর কাছে স্বপ্নের স্বর্গ-হারেম।

এক দেওয়াল বন্ধনীতে হাজার রূপসীর মেলা, বাইরে অজ্ঞাত পৃথিবীতে জীবনের

রঙিন শোভাযাত্রা, ভেতরে রাজ্যভারে ক্লিষ্ট বহু আমোদে ক্লান্ত একটি মাত্র পুরুষের এলোমেলো অস্থির পদশব্দ, সামনে জাগ্রত লোভের হাতছানি,—সিংহাসন, হারেম কি স্বর্গ? খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের হারেমে রূপসী ছিল চার হাজার। মহম্মদ তুঘলকের শৌখিন পৌত্র মকবুলের ছিল—দু' হাজার। এমন যে মহানুভব বাদশাহ আকবর, আবুল ফজল বলে গেছেন, তারও হারেমে মানুষ ছিল পাঁচ হাজার। পশ্চিমি মেয়ে জুলিয়ানা সেখানে চিকিৎসক ছিলেন। রুশ দেশের ক্রীতদাসরা সম্রাট জননীর সেবা করত। জাহাঙ্গীর আরও বিলাসি সম্রাট। হারেমে তার দৈনিক খরচ তিরিশ হাজার টাকা! কিন্তু স্বর্গ কি কেবলি ঘড়া-ঘড়া মোহরে সম্ভব?

বোধহয় নয়। জনৈকা মীর হুসেন আলি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন—হিন্দুস্থানের হারেম স্বর্গ। এখানে কখনও কখনও শেকল চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে রুপোর শেকল। হুসেন আলি ইংরেজ দুহিতা। ঊনবিংশ শতকে লখনৌর এক অভিজাত মুসলিমকে ভালবেসে তিনি এ দেশে এসেছিলেন। বারো বৎসর তার হারেমে কেটেছে, অবশ্য বাদশাহি বা নবাবি হারেমে নয়,—আপন হাতে সৃষ্ট আপন অন্তঃপুরে। তিনি লিখেছেন—লখনৌতে থাকাকালে বাঁদিদের শাস্তি দেওয়ার একটি মাত্রই কাহিনী তিনি শুনেছেন। এক বেগমের রূপসী বাঁদি বেগমতনয়কে আপন রূপে বান্দায় পরিণত করে ফেলে। বেগম তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। তিনি করুণা পরবশ হয়ে বাঁদিকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু সে গর্বিতা তরুণী আপন পরিচয় বিস্মৃত হল। তার আচরণে বেগম ক্রমাগত ঔদ্ধত্য লক্ষ করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তার পবিত্র ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল। বাড়ির অন্য বাঁদিদের ডাকিয়ে এনে, তিনি সকলের সামনে পুত্রের প্রণয়ীকে পালঙ্কে শয়ন করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর একটা রুপোর শেকল এনে তার পা দু'খানি তার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটিকে সেভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখা হত। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, শুধু তাকে তার আদি পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া!

মীর হুসেন আলির কানে শোনা এই কাহিনী হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু আমরাও লখনৌর মেয়ে,—আমাদের কাহিনীগুলো শোনো, এগুলোও সত্য।

আমি অযোধ্যার নবাব আমজাদ আলি শাহের বেগম মালিকা কিসওয়ার বাহাদুর ফকরল-উল-জামিনি নবাব তাজ আরা বেগম বা সুখ্যাত জনাব আউলিয়া বেগমের বাঁদি ছিলাম। বেগম আমার ঘুমন্ত মুখ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ, আমার মুখে রূপ ছিল। এবং কে বা কারা ওকে কানে কানে বলেছিল—নবাব আমাকে ভালবাসে।

আমিও জনাব আউলিয়া বেগমের বাঁদি ছিলাম। বেগম আমাকে অন্ধকার কারাকক্ষে নির্বাসন দিয়েছিল। কারণ, তাঁর ঘরে বিছানার নীচে একটি সাপ পাওয়া গিয়েছিল। বেগমের সন্দেহ, তার পেছনে তাঁর আপন পুত্রবধূ ওয়াজিদ আলি সাহেবের প্রধানা বেগম—খাস মহলের ষড়যন্ত্র রয়েছে। এবং আমি সেই পরিকল্পনায় অন্যতম সাহায্যকারী।

আমরা এই প্রাসাদেই বাঁদি ছিলাম। এক বেগমের আমলেই আমরা তিন-তিনজন

বাঁদি জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছি। নাইটন-এর কাছে ইলুজানের জবানবন্দি পড়ো, শুনবে বেগম এখনও আমাদের পায়ের শব্দে ঘুমোতে পারে না। দেওয়ালের বন্ধন ভেঙে আমরা নাকি এখনও মাঝে মাঝে হারেমে নেমে আসি। ওরা আমাদের কবর দিয়েছিল কেন জানো?—আমরা বাঁদিরা বাঁদি হয়েও তিনটি পুরুষকে ভালবেসেছিলাম।

আমি এক গরিব রাজপুতের কন্যা। এই বেগমেরই দ্বিতীয় পুত্র বিখ্যাত 'জেনারেল সাহেব' নগদ মূল্যে আমাকে সংগ্রহ করেছিল। সে ভালবেসে আমাকে হারেমে ঠাঁই দিয়েছিল। আমি তার সন্তানের জননী হয়েছিলাম। কিন্তু তবুও সেই আনন্দক্ষণের পরে আমি বেঁচে থাকতে চাইনি। কেন জানো? খবর পেয়ে আমার মা এসেছিল। আমি জেনারেলের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—তাকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই। মাকে দুঃখে রেখে আমার কোনও সুখ নেই। জেনারেল মত দেয়নি। কাঁদতে কাঁদতে দশ দিনের মধ্যে আমি চিরবিদায় নিয়েছিলাম।

আমরা ওয়াজিদ আলি সাহেবের বেগম। নবাব তার মায়ের এক প্রিয় বাঁদিকে ভালবেসেছিল। নবাব-মাতা পুত্রের লালসা থেকে বাঁদিকে রক্ষা করতে চাইলেন। তিনি বললেন—এ মেয়ে অলক্ষুণে, ওর মাথায় সাপের চক্র আঁকা। নবাব অনুসন্ধান করলেন। সত্যিই তাই। মেয়েটির তালুতে চুলগুলো যেন সাপের ভঙ্গিতেই সাজানো আছে! সঙ্গে সঙ্গে হারেমে তলব পড়ল। গোটা বেগমমহল খালি করে আমরা বেগমেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবাব একে একে সকলের মাথা পরীক্ষা করল। মোল্লা এল, পণ্ডিত এল, একজনের মাথায় এই 'সাম্পুন' বা সর্পচক্র পাওয়া গেল। পণ্ডিতেরা বিধান দিল—তপ্ত লোহায় সকলের মস্তক শোধন আবশ্যক। যদি কেউ তাতে অসম্মত হয় তবে তাকে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। আমরা ছ'জন এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু বাকি দু'জন? বেগম হয়েও তপ্ত লোহায় যাদের শোধন করা হয় তারা কি সত্যিই বেগম?

আমি এই লখনৌয়েরই বিখ্যাত নবাব নাসিরউদ্দিনের বেগম আফজলমহল। ১৮২৫ সনে মুন্নাজান নামে আমি একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়েছিলাম। আইনত তার নবাব হওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, নবাব তাঁর বার্ধক্যের প্রণয়িনী জনৈকা দুলারির প্রেমে অন্ধ হয়ে ঘোষণা করল, মুন্নাজান তার পুত্র নয়, আমি নাকি ব্যাভিচারিণী! শুনে রেসিডেন্সির সাহেবেরা সেদিন হেসেছিলেন। লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় আমি জীবনে আর কোনওদিন হাসতে পারিনি।

আমি দুলারি। সত্য বটে, আমি এই মুন্নাজানের আবির্ভাব উপলক্ষে প্রাসাদে ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। আপন বুকের দুধে নবাবজাদাকে লালন করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেই দাসীকেই নবাব তার বার্ধক্যের পাটরানি করেছিল। আমাকে সে নাম দিয়েছিল—মালিকা জামানি। সত্য বটে, কৈয়ান ঝা নামে আমার যে-পুত্রটিকে নবাব তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিল সে তার পুত্র নয়। প্রাসাদে পা দেওয়ার আগেই আমি কৈয়ানের মা। সুতরাং, বেগম আফজলমহল তোমার দুঃখের দিনগুলোতে আমি অবশ্যই মনে মনে হেসেছিলাম। কিন্তু তার আগে, বছরের পর

বছর গোপনে আমি কেঁদেছিও। সত্য বটে, আমি নিষ্কলুষ ফুল ছিলাম না। তাই বলে আমি চকের মেয়েদেরও কেউ নেই। তোমরা জানো না, রুস্তম নামে এই শহরেরই একটি মানুষ আমাকে ভালবাসত। কৈয়ান তারই সন্তান। কিন্তু তার বাবা রুস্তম কোথায়? আফজলমহল, তুমি না জানলেও আমি জানি, নাসিরুদ্দিন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তিল তিল করে সে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। নাসিরুদ্দিন আমার ভালবাসাকে সাও-কাওলা করেছে। সে ভয় পেয়েছে, রুস্তম কোনওদিন হয়তো আবার তার দুলারিকে ফেরত চাইবে, হয়তো দুনিয়াকে সে বলে দেবে, কৈয়ান তার পুত্র! আফজলমহল, জীবনে যার এত কান্না, সে একদিন একটু হাসবে বইকি! হোক না সে মিথ্যে হাসি।

ছোট্ট রাজ্য। মধ্যযুগের মাপে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ছোট্ট একটি হারেমের কাহিনী। তাও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, কয়েকটি ঘটনা মাত্র। তারপরও কি বলা চলে হারেম স্বর্গ! বিশ্বের সবচেয়ে সুখী হারেমবাসিনী যে সম্ভবত সে-ও উত্তর দেওয়ার আগে ইস্তত্ত করবে। সত্য বটে, সেখানে অন্নাভাব ছিল না, সত্য বটে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় ছিল, অঢেল আনন্দের আয়োজন ছিল,—কিন্তু মানুষ যাকে সুখ বলে জানে সে বস্তু কোনও কক্ষেই ছিল না। প্রধান বেগম সেখানে আপন তক্তের চিন্তায় নিদ্রাহীন, অন্যরা নিদ্রাহীন প্রধানের সৌভাগ্য চিন্তা করে ঈর্ষায়। কেউ বিষের আয়োজন করছে, কেউ সংগোপনে আপন বাঁদির কাছ থেকে কানে কানে বশীকরণের মন্ত্র শিখছে। সে মন্ত্র জানে যখন—তরুণী বাঁদিই বা তখন পিছনে পড়ে থাকবে কেন? সে-ও বেগম হতে চাইছে। চারদিকে কানাকানি, ফিসফাস, ষড়যন্ত্র, দীর্ঘশ্বাস;—তারই মধ্যে ছায়ার মতো দৈবাৎ কখনও ক্লান্ত সুলতানকে দেখা যায়, তাঁর চারপাশ ঘিরে বিকৃত পৌরুষের উড্ডীয়মান নিশান,—সতর্ক খোজার দল।—এ প্রাসাদে প্রাণ কোথায়?

ঘরে ঘরে পর্দার আড়ালে সেজেগুজে সারি সারি বসে আছি আমরা পুতুলের দল। এইমাত্র যিনি এলেন তিনিও পুতুল। তাঁর চারপাশে যারা তারাও। এই আলো ঝলমল প্রাসাদ আসলে একটা বিরাট প্রহসন, পুতুল নাচের আসরমাত্র। এখানে হাহাকার ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।—ইস্থার, তুমি চৌদ্দটি সন্তানের দুঃখিনী জননী। আমরা দিল্লি-আগ্রা-লখনৌ-লাহোর, কায়রো-বোগ্‌দাদের হুরিরা সেই দুর্ভাগ্য থেকেও বঞ্চিত। পাঁচ হাজার নারীর মধ্যে সন্তানের অধিকার ছিল মাত্র চারজনের। তাও উচ্চৈস্বরে চাওয়ার অধিকার। পেলেও ওরা কোলে রাখতে পারত একমাত্র তাদেরই, যারা সিংহাসনের ভবিষ্যতের পক্ষে কোনওদিক থেকেই বিপদজনক নয়। অপ্রয়োজনীয় সন্তান খোজার কোলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করত। কিংবা পরিচয়হীন মানবসন্তান হয়ে রাজধানীতে নগণ্যের ভিড় জমাত। তাদের জননীরা নিঃশব্দে কাঁদত। আমরা অধিকাংশ ক্রীতদাসী সে কান্নার স্বাদটুকুও জানি না। কারণ—আমরা চিরযৌবনা। কোনও দেবতার বরে নয়, আমাদের এই অনন্ত যৌবন সেই একই লালসার চক্রান্তে সযত্নে সাজান। ওরা আপন কামনাকে তৃপ্ত করেই ক্ষান্ত হতেন না,—ওদের দুশ্চিন্তা লাঘবের পক্ষে এই সহস্র খোজার বেষ্টনীই যথেষ্ট ছিল না, ওরা

তারপরও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন,—সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমাদের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।—ইস্থার, আমরা অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব নই। মধ্যপ্রাচ্যের হারেমে হারেমে আমরা এই সর্ব কামনাশূন্য রূপসী নারীর দল এখনও আছি। ক'বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানীরা আমাদের আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছিলেন। ওঁরা মন্তব্য করেছিলেন—বিশ্বে সবচেয়ে অসুখী মানুষ যারা তারা গোপন হারেমের এই চেতনাশূন্য নারীরা নন, তাদের প্রভু তথা স্বামীরাও!—ইস্থার, যে বাদশাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই হৃদয়হীন দস্যুতার অভিযোগ তারাও তাই ছিল, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী নারীর প্রভু যারা, তারা কখনও সুখী হতে পারে না।—কক্ষনও না।

হারেমে এই অন্তহীন হাহাকারের আর এক প্রমাণ আমরা খোজারা। প্রবাদ বলে—আমরা বর্বরতার বিকটতম স্মারক হয়ে যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলাম সে এই হারেম। ব্যাবিলনের লোভি রানি সেমিরামিস তাঁর বাঁদিদের কলঙ্কশূন্য রাখতে গিয়ে আমাদের উদ্ভাবন করেছিলেন। তারপর দেখতে দেখতে আমরা সমগ্র প্রাচ্য জুড়ে হারেমের এক অপরিহার্য অলঙ্কার। আমরা হারেমের দৌবারিক, আমরা হারেমের রক্ষক, আমরা বেগমের স্নান সহচর, আমরাই হারেমের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী, বিচারক। আমাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ যারা, তুরস্কে নাম ছিল তাদের কাপু আগাসি। দ্বাররক্ষার চূড়ান্ত দায়িত্ব তার। এমনকী তার অনুমতি না নিয়ে প্রধান উজিরেরও সাধ্য নেই হারেমে পা দেবার। কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের নাম ছিল—কিসলার আগাসি। অর্থাৎ—কুমারী দলের রক্ষক। যে খোজা প্রমোদ কেন্দ্রে সুলতানের সহচর হত তার নাম ছিল 'দারুস সিয়াদেত'। এ ছাড়াও অনেক কাজ ছিল আমাদের।

পঞ্চাশজন আমরা পাদশাহী বেগমের ক্রীতদাস ছিলাম,—খাসমহলের চারপাশ ঘিরে থাকতে হত আরও পঞ্চাশজনকে। তার ওপর মসজিদ থেকে নজরানা আদায়, বাদশার হয়ে জল্লাদের কাজ, বাদশাহী দুনিয়ায় আমাদের অনেক কর্তব্য। অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় ওরা জেনেছিল মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত খোজা অনেক বিষয়ে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ অপেক্ষা সমর্থ। খোজার সবেচেয় বড় সম্পদ তার হৃদয়হীনতা। শূন্য মানুষ আমরা বিশ্বের সবচেয়ে ক্রূর ষড়যন্ত্রকারী, সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেনাপতি, নির্মম ঘাতক। আবার হারেমে আমরাই সবচেয়ে নিপুণ গায়ক। কারণ,—একমাত্র খোজার গলাই চিরকাল সমান তেজি, খাদহীন, তীব্র!

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই তথাকথিত প্রশংসায় খোজার জীবনের রিক্ততাকে আড়াল করা সম্ভব নয়। হারেমে যদি কান্না আর হাহাকারই ইতিহাস হয়, তবে আমরা খোজার দল সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে তীব্র আর্তনাদ। ১৮৩৬ সনে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল, সেখানে খোজা আছে তেষট্টিজন। ১৮২৭-৩৭ সনে নাসিরউদ্দিনের কালে লখনৌতে ছিল একশো পঞ্চাশজন। সংখ্যাটা আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য, কিন্তু ভয়াবহতা বোঝা যায় একটি খবর শুনলে। ১৯৫৬ সনে কার্ডিন্যাল লাভিগেরাই মরক্কো থেকে যুনোর দপ্তরে জানিয়েছিলেন—সম্প্রতি এখানকার হাসপাতালগুলোতে তিরিশটি শিশুকে মরক্কোর সুলতানের প্রাসাদের জন্যে খোজা

করার চেষ্টা হয়েছিল, তারা কেউ বাঁচেনি। ইরাকের একজন চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, সৌদি আরবের সরকারি হাসপাতালে যে কুড়িটি শিশুকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বেঁচেছে মাত্র দু'জন।

এ সব এই বিংশ শতকের পৃথিবীর দ্বিতীয়ার্ধের খবর। আমরা যখন প্রথম এই দুনিয়ায় মুখ দেখাই, সৌদি আরবে তখন হাসপাতাল ছিল না, আবিসিনিয়ায় পুরোহিত আর যাদুকর ছাড়া চিকিৎসক ছিল না। সুতরাং মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে তেষট্টি খোজা কয়শো মানবশিশুর প্রাণের মূল্যে অর্জিত সে কাহিনী জানে একমাত্র সেই মানুষগুলোই, মানুষ যাদের কাছে নিছক ক্রীড়াবস্তু, বিলাসপণ্য!

হারেমের লজ্জা তবুও চারটে উঁচু দেওয়ালের আড়ালে গোপন ছিল। আমাদের, গ্রিক আর রোমান দাসদের জীবনের ভয়াবহ শূন্যতা প্রকাশ্য। কপালে তপ্ত লোহার বান্দাছাপ, পায়ে শেকল, সামনে পেছনে যমরাজের প্রতিনিধিসকল,—ওভারসিয়ার। তাদের হাতে হাতে চাবুক। সে চাবুকে লোহার তারে ব্রোঞ্জের বল। আমরা নগ্ন দেহে, পেটে ক'বিন্দু বার্লি-জল ফেলে উদয়াস্ত খনিতে কাজ করে চলেছি। খনির সুড়ঙ্গগুলো উচ্চতায় তিনফুট, চওড়ায় দু' ফুট। দিনশেষে এখান থেকে যখন বের হব—আমরা তখন দ্বিতীয় নরকের নাগরিক। হাত-পা শেকলে বাঁধা আমরা পাতালের কারাগারে পড়ে আছি।

আমাদের মধ্যে যারা মাঠে কাজ করে তাদেরও একই কাহিনী। ওরা কোনও বাণিজ্যতরীর খোল বোঝাই হয়ে আসেনি। ওরা এই মাটিরই সন্তান, ডোরিয়ানদের প্রতিষ্ঠার আগে এই দ্বীপপুঞ্জের আদি নাগরিক। ওরা এখন—'হেলট', রাষ্ট্রের সম্পত্তি। রাষ্ট্র ওদের ভূস্বামীদের হাতে হাতে তুলে দিয়েছে, ওরা নগরের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মাঠে মাঠে কাজ করছে। আমাদের মতো ওদেরও পায়ে পায়ে শেকল,—ওভারসিয়ারের বদলে সামনে দণ্ডায়মান—'ইফর', খুনি স্পার্টানের দল। স্পার্টা ওদের বিশ্বাস করে না। সেবার ওরা প্রভুদের হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়েছিল। স্পার্টা ওদের পুরস্কৃত করেছিল নির্বিচারে দু' হাজার হেলটকে হত্যা করে।

যারা নগরে নগরে ঘরে ঘরে গোলামবাঁদির কাজ করত, তারা অবশ্য তুলনায় সুখী ছিল। কিন্তু সে সুখ স্বাধীন মানুষের সুখ নয়,—তাদের জীবনের কাছাকাছি থাকার শূন্য পানপাত্রের তলানিটুকু আস্বাদন করবার আনন্দ মাত্র। নাগরিক গ্রিকরা মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে তারা নিরাসক্ত ছিল। ওরা বলত—ইট ইজ বেটার টু বারি এ ওমেন দ্যান টু ম্যারি হার। জীবন তাদের আনন্দিত, একমাত্র নগরসভায় কিংবা 'সিম্পোসিয়াম' নামে খ্যাত আড্ডাখানাগুলোতে। আমরা নানাদেশের ক্রীতদাসীরা সেখানে তাদের সর্বস্ব। কখনও সেখানে আমাদের পরিচয় 'হেতায়েরা' বা পেশাদার সহচরী, কখনও-বা কেবলই বাঁদি। সেখানে আমরা আর ওরা এক পৃথিবীর মানুষ, একে অন্যের আনন্দের শরিক। কিন্তু রাত্রি শেষে পরদিন ভোরে? মানবী আবার এথেন্সের রুক্ষ বাস্তবে ফিরে এসেছে, সে এখন আবার বাঁদি।

রোমের জীবন আরও নগ্ন, আরও রিক্ত, আরও অন্তঃসারশূন্য। খনি আর মাঠে মোটামুটি একই কাহিনী। পার্থক্য শুধু এই পরবর্তীকালের আমেরিকান 'মাসা' বা তুলা-প্রভুদের মতো রোমানরাও সভ্যতার সারথি হিসেবে আরও নির্মম, আরও লোভী। ওদের তহবিলে কেটোর মতো প্রজ্ঞা ছিল। বিখ্যাত এই রোমাননায়ক পরামর্শ দিয়েছিলেন—হে রোমানগণ, তোমাদের জরাজীর্ণ গৃহপালিত পশু আর বৃদ্ধ, রুগ্ন, অক্ষম দাসগুলোকে বিদায় করো। ওরা তাই করত। টাইবারের একটি দ্বীপে অক্ষমদের জীবন্ত ছুঁড়ে দিয়ে আসত। সভ্যতার কারিগরেরা দূরে রাজধানী রোমের গৌরব পতাকার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলত। রাজধানীর ঘরে ঘরে যারা কাজ করত, তারা অবশ্য মর্ত্যজীবন শেষে প্রভুর কাছাকাছি একটি কবর পেত। কখনও হয়তো-বা তার সঙ্গে একটি ফলকও।

এ উদারতাটুকু অবিশ্বাস্য হলেও অভাবিত নয়। কারণ—কোনও অভিজাত রোমানের পক্ষে দাস ছাড়া সেদিন বলতে গেলে প্রায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও অসম্ভব। দাসদের সংখ্যা যেমন তার সামাজিক মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি, তেমনি ওরাও তার জীবনের জিয়নকাঠি। ওদের ডাকে প্রভু রোমানের ঘুম ভাঙে। দর্শনার্থীরা আসে। গোলাম আর বাঁদিরা প্রভুর প্রাতঃরাশের আয়োজন করে। ভোজন শেষে দাস বাহকের কাঁধের পালকি চড়ে তিনি ফোরামে যাবেন। কিংবা জুয়ার আসরে বসবেন। আসর শেষে আবার দাসের পালকিতে স্নানার্থে গমন। রোমান সভ্যতার অন্যতম কীর্তি রোমের অগণিত সাধারণ স্নানাগার। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে সেখানে কমপক্ষে এমনি এগারোটি স্নানাগার ছিল। একসঙ্গে সেখানে পনেরো হাজার মানুষ স্নান করতে পারত। প্রবেশ মূল্য হিসেবে অবশ্য নগদ কিছু দিতে হত, কিন্তু সে সামান্য, ক্ষুদ্রতম তামার মুদ্রাতেও কোথাও কোথাও অবারিত দ্বার। অভিজাত রোমান সাধারণত সেখানে যেত না। তাদের আপন স্নানাগার ছিল। যারা সাধারণ স্নানাগারে যেত তারাও তার মধ্যে যেগুলো অসাধারণ তাতেই। কোনও কোনওটিতে মেয়ে আর পুরুষেরা এক সঙ্গে স্নান করত। একজন সমাজপতি সে বিধানও দিয়েছিলেন। সে আনন্দ অবশ্য চিরকাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু অন্য আনন্দ ছিল। প্রভু পালকি অথবা রিকশা থেকে নামার পর দাসরা তার দেহে তৈল সংবাহন করবে, দাস বালকেরা জলে বল দেবে, ক্রীড়া হবে, মেয়েরা আপন কেশদামে প্রভুর হাত পা মুছিয়ে দেবে। ঠান্ডা স্নান, গরম স্নান, রকমারি স্নান শেষে গর্বিত রোমান আবার পালকিতে চড়বে, তার আগে পিছে দাসরা, ভেঁপু বাজাবে, পালকি দরজায় পৌঁছবে, দ্বাররক্ষী প্রভুকে অভিবাদন জানাবে। তাকিয়ে দেখো, লোকটির পা ফটকের সঙ্গে শেকলে বাঁধা।

স্নানের পর ভোজন। গ্রিসে, বিশেষত স্পার্টায় খাওয়া-দাওয়ায় কোনও সমারোহ ছিল না। একজন বিদেশি তাদের সঙ্গে ভোজন করে বলেছিলেন—এখন বুঝতে পারছি, স্পার্টানরা কেন এমন আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধে জীবন দিতে চায়। রোম তা নয়। মাননীয় রোমানেরা খাদকও বটেন। বেলা চারটায় খাওয়ার আসর বসবে। বাঁদি গোলামেরা ব্যস্ত। অতিথিরা আসছেন, একজন দাস তাকে দরজা খুলে দিচ্ছে, মনে

করিয়ে দিচ্ছে, ঘরে ঢুকতে হলে আগে ডান পা বাড়ানোই এখানে নিয়ম! ভোজসভা বসেছে। মেয়েরাও তাতে যোগ দিচ্ছে। ওভিদ মিথ্যে না হলে, টেবিলের এ পারে আর ও পারে গোপনে প্রণয় লীলা চলছে। ওরা সবাই খালি পায়ে খেতে বসেছে। হাতও খালি। তখনও রোমানরা ছুরি কাঁটার ব্যবহার শেখেনি। দাসরা ওদের হয়ে খাবার কেটে কেটে দিচ্ছে। এক প্রস্থ শেষ হওয়ামাত্র আর এক দাস জলের ঝারি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নতুন ডিশে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুতে হবে।

এত দাসের আনাগোনা, কিন্তু কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। এই আসরে হাঁচি বা কাশি দুই-ই নিষিদ্ধ। জাহাঙ্গীর অসাবধানতা বশত প্লেট ভাঙার অপরাধে জনৈক গোলামকে কোতল করেছিলেন, রোমান প্রভু কাশির অপরাধে যে-কোনও দাসকে বেত্রাঘাতের হুকুম দিতে পারেন। রাত আটটা পর্যন্ত এ ভাবেই চলবে। হয়তো সাকুল্যে কুড়ি কি বাইশ প্রস্থ খাবার খেতে হবে। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে ক্রীতদাস কমেডিয়ান সেজে অতিথিদের আনন্দ দেবে, রূপসীরা নাচবে, সংয়েরা নানা জীবনের অনুকরণ করবে, ক্রীড়াকুশলী খেলা দেখাবে, শিকারি সত্যি সত্যিই একটি বুনো শুকর হত্যা করবে। ওরা সবাই দাস,—প্রভুর নিজস্ব সম্পদ। এমনকী, বামন, কুঁজো, খোজা—ইত্যাদি হাস্যাস্পদ যে ক্রীড়াবস্তুগুলোকে একে একে দেখান হল, তারাও নগদ মূল্যে নানা দেশের হাট থেকে কেনা। শুধু তাই নয়, এই বিরাট প্রাসাদে এখানে ওখানে যারা কেরানি মুহুরি শিক্ষক কিংবা সচিবের কাজ করছে, তারাও অধিকাংশ দাস। রোমান প্রভুর একমাত্র দায়িত্ব শুধু বেঁচে থাকা। স্বাধীন রোমানের মতো জীবনকে দেখা। তারই জন্যে তিনি উদয়াস্ত ব্যস্ত, ইতিহাস এই ব্যস্ততার নাম দিয়েছে—'বিজি লিজার!' খাওয়াও তার কাছে এক ধরনের অবসর বিনোদন। রাত গড়িয়ে চলছে, কিন্তু ভোজ তবুও শেষ হচ্ছে না। জুতো আনার হুকুম যখন জারি হবে, অর্থাৎ আসর ভাঙার ইঙ্গিত শোনা যাবে, রাত হয়তো তখন দশটা বারোটা। অতিথিরা বিদায় নেবে, প্রভু এ বার শয্যা নেবেন। অভিজাত রোমানের ঘরে সেদিন অনেক আসবাব, কিন্তু রোমান প্রভুর সবচেয়ে প্রিয় যে বস্তুটি, সে এই পালঙ্ক, খাট। এখানে শুয়ে শুয়েই তিনি গ্রিক কাব্য পড়েন, দর্শন চিন্তা করেন, খাবার খান, আমোদ করেন। এবং এই খাটটিকে কেন্দ্র করেই তার বিরাট প্রাসাদে পাঁচশো বাঁদি গোলাম। তাদের কেউ কেউ ঘুমের ওষুধ জানে, কেউ কেউ জেগে থাকার গুপ্তমন্ত্র! এই প্রাসাদও এক ধরনের বিকৃতি, দ্বিতীয় হারেম।

তবে সভ্য রোমানের অন্তঃসারশূন্যতা যেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট, সে তাদের ঐতিহাসিক খেলাঘর তথা প্রমোদাগারগুলো। প্যালাটাইন পাহাড়ের পাদদেশে চলে এসো। এখানে রোমানদের গৌরব বিখ্যাত 'সার্কাস ম্যাক্সিমাস'। তাকিয়ে দেখ দেড় লক্ষ মানুষ হাততালি দিচ্ছে, উন্মত্তের মতো চেঁচাচ্ছে। আমরা রথক্রীড়া দেখাচ্ছি। এ ক্রীড়া রিপাবলিকান রোমে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রাজকীয় রোমে তার খ্যাতি বেড়েছে। দেশ বেকার মানুষে ছেয়ে গেছে,—শাসকেরা জেনে গেছে, এ মানুষের দলকে শান্ত রাখার একমাত্র উপায় বিনামূল্যে রুটি আর আমোদ বিতরণ। তাই বছরে

একশো পঁচাত্তর দিন, এখন সরকারিভাবে ঘোষিত আনন্দের দিন।

তার ওপর অভিজাতরা আপন জনপ্রিয়তা রাখতে অথবা বাড়াতেও মাঝে মাঝে এই রক্তভোজের আয়োজন করত। তাকিয়ে দেখো, আমরা দাসরা তাদের জন্যে সাত ঘোড়া, দশ ঘোড়ার রথের বলগা ধরে ছুটছি। সে বলগা আমাদের কোমর থেকে বুক অবধি জড়ান, রথ উলটে গেলে কিংবা ঘোড়া জখম হয়ে গেলে, নিজেরা বাঁচতে পারব তার কোনও আশা নেই; আমরা ঘোড়ার সঙ্গে মৃত্যু বাঁধনে বাঁধা। মাঝে মাঝে অসহায় রথী কোমরের গোপন পকেট থেকে ছুরি বের করে বাঁধন কাটতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই,—প্রহরীর তলোয়ার সেই আহত পলাতক উঠে দাঁড়াবার আগেই তাকে আবার ধরাশায়ী করবে, সার্কাস ম্যাক্সিমাস উত্তেজনায় থর থর কাঁপতে থাকবে, অভিজাত রমণীদের হাতের রেশমি রুমাল বাতাসে উড়বে, কসাই আর রুটি কারিগরদের চিৎকারে ইতিহাস কিছুক্ষণের জন্যে এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আজ এখানে যে সভ্য মানুষের জগৎ সমবেত, তাদের কাছে মানুষের কোনও প্রাণমূল্য নেই, তাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য—জিতছে কারা? 'সাদারা' অথবা 'সবুজেরা',—'লালেরা' অথবা 'নীলেরা'!

এ খেলা সাচ্চা রোমানের কাছে নিরামিষ আনন্দ, তৃণভোজনতুল্য। গানের আসর বা নাটকের মতোই উত্তেজনা এখানে সীমাবদ্ধ। সেখানেও আমরাই সর্বস্ব। গায়ক, অভিনেতা, পরিচালক সবাই ক্রীতদাস। কিন্তু রোমান দাসেরা যেখানে তাদের প্রভুদের সত্যিই যথার্থ আনন্দদানে সক্ষম, সে এই অ্যাম্ফিথিয়েটারর। সম্রাট ভেসপাসিয়ান এবং তস্যপুত্র টাইটাস-এর অবদান কলোসিয়ামে চলে এসো, রোম এবং তার ক্রীতদাস দু'দলকেই এখানে তাদের আপনরূপে দেখা যাবে। তাকিয়ে দেখো, পঞ্চাশ হাজার দর্শক ক্ষুধার্ত চোখে গ্যালারি থেকে নীচে আসরের দিকে উন্মুখ হয়ে ঝুঁকে আছে, আমরা দাসরা গ্ল্যাডিয়েটার তথা তলোয়ারধারী হয়ে লড়াই করছি। তলোয়ারের খেলা নয়, জীবনপণ লড়াই। এই দিনটির জন্যেই আমরা তিল তিল করে নিজেদের তৈরি করেছি, আখড়ায় আখড়ায় দিনের পর দিন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘাতকের বিদ্যাকে সম্পূর্ণ করেছি। আজ আমাদের লড়াইয়ের দিন। ওদের—'ক্রীড়ার'।

প্রথমে সাধারণ হাতিয়ার। তারপর সে-পরীক্ষা শেষে বর্শা, ত্রিশূল, জাল; কখনও-বা ঢাল-তলোয়ার খড়্গ কিংবা অভিনব কোনও হাতিয়ার। ক্লান্ত যোদ্ধা কখনও নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ওরা বড়শিতে তাদের দেহগুলো টেনে টেনে কোণের একটি ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। আহতদের সেখানে হত্যা করা হবে। নিহতদের পোশাকগুলো খুলে রাখা হবে। এ দিকে লড়তে লড়তে একটি যোদ্ধা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি ধারণ করেছে, বিজয়ী তার বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে,—এ মানুষের জীবন মরণ এখন তাদেরই হাতে। ওরা যদি উল্লাসে চিৎকার করতে করতে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে নিজেদের বুকের দিকে ইঙ্গিত করেন, তবে তলোয়ারের ওখানেই স্থির হয়ে থাকলে চলবে না। পরাজিতকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ করতে হবে, দৈবাৎ কোনও কারণে যদি ওদের মতিভ্রম হয়, আঙুলটি বুকের বদলে নীচের দিক

নির্দেশ করে, পরাজিত যোদ্ধা তবেই সেদিনের মতো ছাড়া পাবে! কিন্তু সে সাময়িক মুক্তি মাত্র। গ্ল্যাডিয়েটারের জীবনে অ্যাম্ফিথিয়েটারের রক্তাক্ত মৃত্যুই একমাত্র ভবিষ্যত। সুখী রোমানের জীবনে সেই আনন্দদায়ক মুহূর্তটির জন্যেই তার এই দেহ, এই পেশি, এই তাজা রক্ত। খ্রিস্ট জন্মের তিনশো বছর আগে থেকে তাদের এই রক্তের খেলা চলেছে। কখনও কখনও তলোয়ার হাতে বাঁদিরাও আসরে নেমেছে। হাজার হাজার ক্রীতদাস অ্যাম্ফিথিয়েটারে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। কখনও নিজেদেরই তলোয়ারের মুখে, কখনও-বা আরও কোনও নব উদ্ভাবিত আর কোনও নৃশংস পথে। একটি তার কুখ্যাত 'হান্ট' বা ক্ষুধার্ত পশুর সঙ্গে মানুষের খেলা।

খেলাটা অবশ্য আদিতে পশুর সঙ্গে অন্য পশুর খেলাই ছিল। কিন্তু রক্তের পিপাসা বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, পশুর দঙ্গলে বন্দি এবং দাসেরাও নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সে-খেলা ক্রমে এমনই জমে উঠেছিল যে, রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের রাজকীয় ভোজের আমন্ত্রণে আফ্রিকার বনগুলো পর্যন্ত সেদিন সিংহ, চিতা, গন্ডার এবং কুমিরশূন্য। মাঝে মাঝে ওরা আরও অভিনব মৃত্যু-আসরের আয়োজন করত। অ্যাম্ফিথিয়েটারকে সেদিন সমুদ্রে পরিণত করা হত। আমরা ক্রীতদাসেরা সেখানে নৌযুদ্ধ করতাম। কেউ নকল সমুদ্রে জ্যান্ত কুমিরের মুখে প্রাণ দিতাম, কেউ যোদ্ধা হিসেবে যোদ্ধার তিরের মুখে লুটিয়ে পড়তাম। ৫২ অব্দে সম্রাট ক্লডিয়াস এমনি একটি লড়াইয়ের আয়োজন করে ইতিহাসে অক্ষয় নাম কিনে গেছেন। তাঁর আগে রোমে সবচেয়ে শৌখিন রোমানদের সম্মান ছিল ট্রাজানের। তিনি এক আসরে দশ হাজার ক্রীতদাসকে গ্ল্যাডিয়েটার করে তলোয়ার হাতে আসরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। একসঙ্গে নয়, জোড়ায় জোড়ায় দু'জন করে। সেই অসংখ্য দাসের আত্মঘাতী খেলায় সময় লেগেছিল—একশো তেইশ দিন। ক্লডিয়াস খেলার আয়োজন করেছিলেন, রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ফুসিন লেকে। সেখানে আমরা আত্মদান করেছিলাম উনিশ হাজার। লড়াই চলেছিল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। অবশেষে লড়াই যখন থামল, সম্রাট এবং তাঁর তৃপ্ত নাগরিকেরা যখন সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়াল তখন আমরা উনিশ হাজার যোদ্ধার একজনও বেঁচে নেই, শান্ত জলের হ্রদ ফুসিন আবার শান্ত,—শুধু তার জলের রংটা এখন অন্য,—রক্তাক্ত।

এ খেলা সাচ্চা রোমানের কাছে নিরামিষ আনন্দ, তৃণভোজন তুল্য। গানের আসর বা নাটকের মতোই আনন্দ উত্তেজনা এখানে সীমাবদ্ধ। সেখানেও বলতে গেলে আমরাই সর্বস্ব। গায়ক, নর্তকী, অভিনেতা, পরিচালক সবাই ক্রীতদাস, কিন্তু রোমান দাসেরা যেখানে তাদের প্রভুদের সত্যিই যথার্থ আনন্দ দান করেছে, যেখানে তাঁরা সর্বোত্তম বিনোদন লাভ করেছেন সে এই অ্যাম্ফিথিয়েটার। কান পাতো, হাজার হাজার বছরের ও পার থেকে এখনও শুনতে পাবে হাজার হাজার উল্লসিত দর্শকের করতালি। তাদের কানফাটানো জান্তব ধ্বনি। যত শুনবে ততই অবাক হবে তোমরা। আরও একটু বিস্তারিত শোনা যাক রোমানদের তথাকথিত বীরগাথায় এসমার্কে। প্রথম অ্যাম্ফিথিয়েটার নাকি গড়ে তোলেন ওঁরা রোমে নয়, ক্যামোনিয়ায়। তার আগে

নগর বা জনপদের যে-কোনও খোলা জায়গায় ছিল ওঁদের ক্রীড়াভূমি। অ্যাম্ফিথিয়েটার তুলনায় উন্নততর ব্যবস্থা। ডিমের মতো বা বাদামি আকারে জমি ঘিরে তৈরি হত দর্শকদের জন্য গ্যালারি। মাঝখানে লড়াইয়ের জন্য কিছুটা কাঁচা মাটির শূন্যস্থান। সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হত বালি, কেন-না, এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে রক্ত তাড়াতাড়ি শুষে যায়। কালিগুলা এবং নিরো শখ করে সেখানে ছড়াতেন রঙিন বালি কিংবা তামার ধুলো। যা হোক, রোমের আগে কপুয়া এবং পশাইতেও গড়ে তোলা হয়েছিল অ্যাম্ফিথিয়েটার। পম্পাইয়েরটি তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৮০ অব্দে। আর রোমে কলোসিয়াম গড়া হয় মাত্র ৮০ খ্রিস্টাব্দে। কলোসিয়াম প্রাচীন পৃথিবীর এক আশ্চর্য স্থাপত্যকীর্তি।

পরবর্তীকালে ইউরোপের স্থাপত্যকলাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে রোমানদের এই বিশাল রঙ্গভূমি। নাম তার কলোসিয়াম, কারণ পাশেই ছিল নিরোর একটি বিরাট মূর্তি, যাকে বলে—"কলোসাস।" তার উদ্বোধন করেছিলেন সম্রাট টাইটাস। এই বিশাল ক্রীড়াঙ্গনে ৪৫ হাজার দর্শকের জন্য আসনের ব্যবস্থা ছিল। আর ৫ হাজার দর্শকের জন্য ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রীড়া উপভোগ করার ব্যবস্থা উদ্বোধন উপলক্ষে টাইটাস সেখানে আয়োজন করেছিলেন একশো দিনব্যাপী এক উৎসবের। উৎসব মানে, হত্যার মহোৎসবে। অবশিষ্ট দুনিয়া শুনলে স্তম্ভিত হবে, কলোসিয়াম না হলেও রোমানদের অধিকারে বড় মাপের অ্যাম্ফিথিয়েটার বা বধ্যভূমি ছিল কমপক্ষে সত্তরটি। মাঝারি ও ছোট আরও অনেক। শত শত বছর ধরে আমরাই সেখানে ঢেলেছি রক্ত। এবং কী আশ্চর্য—বীরবেশে!

আমরা রোমান ইতিহাসের সেই বহুশ্রুত গ্ল্যাডিয়েটার। যাদের দায়িত্ব ছিল নিজেদের জীবনের বিনিময়ে প্রভুদের আনন্দদান। শতকের পর শতক রোমানরা লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসকে দেখেছেন। সে এক বিরামহীন মিছিল। সম্ভবত ইতিহাসে দীর্ঘতম মৃত মানুষের জীবন্ত মিছিল। আমরা গ্ল্যাডিয়েটাররা প্রায় সবাই ছিলাম ক্রীতদাস। এবং তাঁদের বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ। আমাদের দলে বিশুদ্ধ ক্রীতদাস ছাড়াও ছিল, কিছু শৌখিন স্বাধীন রোমান যুবা যারা অলস জীবন যাপন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিছু খ্যাতিলোভী স্বেচ্ছায় যোগদানকারী তরুণ, যাঁরা নিজের জীবনে উত্তেজনার আগুন পোহাতে চান, আর দাগি আসামি, কিছু যাকে ওঁরা বলেন সমাজবিরোধী। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দাস গ্ল্যাডিয়েটারের মহাসাগরে ওঁরা বিন্দু মাত্র।

ইতিহাস হয়তো তোমাদের বলবে, কিছু স্বাধীন রোমান তরুণীও কি গ্ল্যাডিয়েটারের সাজে অ্যাম্ফিথিয়েটারে বর্ম পরে তলোয়ার হাতে লড়াই করেনি? হ্যাঁ, করেছেন। একবার লড়াই হয়েছিল অ্যাকিলিয়া নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যামাজন নামে আর একটি মেয়ের। কিন্তু মেয়েদের লড়াই উচ্চবর্গের রোমানরা কখনও কখনও উপভোগ করলেও আন্তরিকভাবে অনুমোদন করতে পারেননি। একবার ওঁদের লড়াই হয়েছিল রাত্রে, মশালের আলোতে। তবু কবিদের কলমে কত না ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ২০০ অব্দে এক রাজকীয় ঘোষণায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এই প্রথা।

সুতরাং, আমরা ক্রীতদাসদের ভাগ্যের সঙ্গে ওঁদের তুলনা হয় না। হ্যাঁ, প্রাচীন রোমের ইতিহাসের পাতা তছনছ করলে দেখা যাবে গণ্যমান্য রোমানরা, এমনকী রোমান সম্রাটরা নিজেরা পর্যন্ত শখ করে কখনও কখনও গ্ল্যাডিয়েটার সেজেছেন। আসরে নামার আগে তাঁদের কেউ লড়াইয়ে দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় তালিম পর্যন্ত নিয়েছেন।

সম্রাট কমোডাস। বিখ্যাত সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের এই পুত্রটির প্রকৃত জনক নাকি আমাদের একজন, অর্থাৎ একজন ক্রীতদাস। হতে পারে, তবে সে-সব কথা পরে। শৌখিন লড়াকু-নরপতিদের কথাই আগে শোনা যাক। সম্রাট কমোডাস সিংহাসনে বসার আগে ও পরে নিয়মিত গ্ল্যাডিয়েটার সেজে লড়াই করেছেন। তাঁর এক নেশা ছিল ঘোড়া, আর এক নেশা গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াই। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে খুন হয়েছিলেন তিনি (১৯২ খ্রিস্টাব্দ)। তার আগে অ্যাম্ফিথিয়েটারে ছিলেন তিনি একজন দক্ষ, সুশিক্ষিত যোদ্ধা। গ্ল্যাডিয়েটারের যে শব-সাধনা তার সুর, ছন্দ, মুদ্রা—সবই আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। এই লড়াইয়ে সম্রাট লড়াই করতেন বাঁ হাতে। সে কেমন লড়াই?

সে-খবর জানি আমরা, যারা তাঁর সঙ্গে লড়াই করতাম। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যই বরং শোনা যাক, তিনি লিখেছেন কোনও পেশাদার গ্ল্যাডিয়েটার তাঁর বিরুদ্ধে কখনও জিতবার জন্য লড়াই করতেন না। সম্রাট কিন্তু খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে খুন করতেন প্রতিপক্ষকে। কখনও-বা ভয় দেখাতেন যেন তিনি মৃত্যুদূত হিসাবেই অবতীর্ণ আসরে। যমদূত তখন কারও গলা কাটতেন না বটে, কিন্তু হাসতে হাসতে কেটে নিতেন কারও নাক, কারও কান বা একটি হাত! তিনি লড়াই করেছেন ১২ হাজার গ্ল্যাডিয়েটারের সঙ্গে। অন্তত তাঁর প্রতিমূর্তির নীচে তা-ই নাকি খোদাই করা ছিল। এই তো শুনলে সেই লড়াইয়ের নমুনা! অথচ সম্রাট কমোডাস নিজেকে কল্পনা করতেন তিনি—হারকিউলিস।

তাঁর মতোই কখনও কখনও গ্ল্যাডিয়েটার হিসাবে প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন সম্রাট কালিগুলা, হ্যাড্রিয়ান এবং লুসিয়াস ভেরাস। এই শৌখিন লড়িয়েদের কাহিনীও কিন্তু সমান লজ্জাকর। কালিগুলা একবার একজন গ্ল্যাডিয়েটারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। অন্যপক্ষের হাতে ছিল কাঠের তলোয়ার। সত্যিই তো, সম্রাট ঝুঁকি নেবেন কেন? তাঁর বিপরীতে যে-গ্ল্যাডিয়েটার—এক সময় সম্রাটকে খুশি করার জন্য কপট লড়াই চালিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছা করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। যার অর্থ, সম্রাট আমি হার স্বীকার করছি। কালিগুলা বিজয়ী হিসাবে কীভাবে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন জানো? কোমর থেকে ইস্পাতের ছুরিটা ঝটিতি টেনে নিয়ে বসিয়েছিলেন তার বুকে!

সুতরাং, রোমান তরুণরা, মেয়েরা, এমনকী রাজা-রাজরারা স্বেচ্ছায় গ্ল্যাডিয়েটার সেজেছিলেন, এ সব খোশখবর আমাদের কাছে কোনও সান্ত্বনা নয়। ওঁরা আর ক'দিন লড়াই করেছেন? লড়াই করতে গিয়ে কেউ কি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন? একবার

সম্রাট কালিগুলা অবশ্য ক'জন 'নাইট' বা তাঁর অভিজাত সহচরদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন গ্ল্যাডিয়েটারদের বধ্যভূমিতে নেমে লড়াই করতে। সেদিন কোনও কোনও পার্ষদ অবশ্য প্রাণ হারিয়েছিলেন। কারণ, সম্রাটের সন্দেহ হয়েছিল আসলে ওঁরা তাঁর মিত্র নয় শত্রু, ওঁদের কৌশলে সরিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এ ধরনের দু'-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অ্যাম্ফিথিয়েটারের বধ্যভূমি যুগযুগান্ত ধরে ছিল আমাদের রক্তেই চিরবর্ষার দিনের মতো নিত্য ভেজা।

নিত্য ছাড়া কী? অগস্টাস গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াইয়ের জন্য বছরে নির্দিষ্ট করেছিলেন ৬৬ দিন। মার্কাস অরেলিয়াস আমোদকে প্রলম্বিত করার বাসনায় তা বাড়িয়ে দেন ১৩৫ দিনে। পরে পরবের দিন আরও বেড়ে যায়। রোমান দেওয়ালপঞ্জিতে রক্তলাঞ্ছিত দিনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫! সে তো গেল সরকারি বা দরবারি বাদশাহি উৎসব দিনের সংখ্যা। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে স্থানীয় এবং ব্যক্তিগত উৎসবগুলোর কথা। রাজ্যব্যাপী শুধু অ্যাম্ফিথিয়েটার নয়, অগণিত উদ্যোগী, হাজার হাজার লড়িয়ে-দাস। স্থানীয় শাসকরা নানা উপলক্ষে তাদের লড়াইয়ের আয়োজন করতেন। উঁচু পদে অধিষ্ঠিত রাজ-কর্মচারীরাও ছিলেন গ্ল্যাডিয়েটারদের পৃষ্ঠপোষক বা অন্যভাবে ভাবলে—ঘাতক। কেউ কেউ বাড়িতে কোনও মান্য অতিথি এলেও তাঁকে আপ্যায়নের জন্য বাড়ির নাটমঞ্চে ছোটখাটো "শো" সাজাতেন। তাতে অবশ্য যথাসম্ভব রক্তপাত এড়ানো হত। লড়াইয়ে কে কতখানি পটু, কোন অস্ত্রে কে বেশি সহজ ও সুন্দর সে-সবই ছিল প্রধান বিচার্য। কিন্তু অন্যরা এমন বর্ণহীন জলো আমোদ মেনে নেবেন কেন? তলোয়ারের জোরে দুনিয়াকে রক্তস্নান করিয়ে এ রাষ্ট্রের আবির্ভাব, রক্তই তার প্রাণধারা, শাসককুলেরও তা-ই বড়ই রক্ত নেশা। ক্ষতবিক্ষত দাসের রক্ত তাঁদের ধমনীতে রক্তস্রোত খরতর করে তোলে, চোখে মুখে তৃপ্তির বিচ্ছুরণ ঘটায়। মৃত্যু-উৎসবে তা-ই তাঁদের বড়ই আগ্রহ।

সম্রাট অগস্টাস নিজের নামে বৃহৎ আসরের আয়োজন করেছেন তিনবার, পুত্র এবং পৌত্রের নামে আরও পাঁচবার। তার জন্য রোমান সম্রাটের বিপুল অর্থের সঙ্গে খরচ করতে হয়েছে দশহাজার জীবন্ত দাস বা গ্ল্যাডিয়েটার! সম্রাট ক্লডিয়াস ৪৪ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে আয়োজন করেছিলেন এক নকল রণাঙ্গন। সেখানে গ্ল্যাডিয়েটাররা একদল নগর আক্রমণ করে, অন্যদল চেষ্টা করে সে-আক্রমণ প্রতিহত করতে। দ্বিতীয় দল শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় । ফলে পরিণতি কী হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। রণক্ষেত্রে যখন তখন রক্তারক্তি কাণ্ড হবে তাতে আর বিস্ময় কী!

ভাইটেলিয়াসের দুই সেনাপতি ক্রিমোনা এবং বোলগনায় দুটি বিরাট আসর বসিয়েছিলেন, যাতে যোগ দিতে হয়েছিল বেশ কয়েকশো গ্ল্যাডিয়েটারকে। সম্রাটের জন্মদিনে রোমান সাম্রাজ্যের ২৫টি জেলার প্রত্যেকটিতে একবার আয়োজিত হয়েছিল গ্ল্যাডিয়েটারদের লড়াইয়ের বিশেষ প্রদর্শনী। কলোসিয়ামের উদ্বোধন উপলক্ষে সম্রাট টাইটাসের দীর্ঘ আনন্দোৎসবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর রক্ত নিয়ে খেলা যদি চলে থাকে শত দিবস, তবে ভাসিয়া রা রুমানিয়া জয় উপলক্ষে ট্রাজানের উৎসব চালু ছিল দীর্ঘ চার মাস! চার মাস ধরে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর প্রাণ নিয়ে খেলা,—ভাবা যায়?

আশ্চর্য, রোমানদের তবু ক্লান্তি নেই। ট্রাজানের এই রক্তের মহোৎসবে উৎসর্গ করা হয়েছিল দশ হাজার বন্য প্রাণী, আর দশ হাজার বলিষ্ঠ গ্ল্যাডিয়েটার। ১০৮ এবং ১১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একশো সতেরো দিন ব্যাপী প্রসারিত এক লড়াইয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ৪৯৪১ জোড়া গ্ল্যাডিয়েটার। ১০৬ থেকে ১১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শুধু রাজকীয় উৎসবেই নিবেদিত হয়েছিল তেইশ হাজার গ্ল্যাডিয়েটার! অবিশ্বাস্য সেই রোমান সমাজ। সেখানে রক্তের নেশায় রাজা-প্রজা ভেদ নেই। সেখানে পুরোহিতরা পর্যন্ত এই রক্তাক্ত উৎসবের আয়োজন করতেন। তাতে কোনও লজ্জা নেই, বরং গৌরব। এই গরিমা, মহিমা যে-ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত তা যদি বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য হয়, তবে তা গড়ে তুলেছে কিন্তু প্রধানত আমাদের দাসদের শ্রম। আর, সেই সঙ্গে আমাদের রক্ত। রক্ত দিয়েছি আমরা অনেকে সৈনিক হিসাবে, অনেকে আবার এই অস্ত্রধারী লড়িয়ে গ্ল্যাডিয়েটার হিসাবে।

আমরা গ্ল্যাডিয়েটাররা দাসদের মধ্যে এক বিশেষ সম্প্রদায়। আমরাও এক ধরনের সৈনিক, তবে লড়াই আমাদের কোনও ভিনদেশি শত্রুর সঙ্গে কোনও লড়াইয়ের ময়দানে নয়, রোমানদের নিজেদেরই ছোট বড় শহরে অ্যাম্ফিথিয়েটারের অপরিসর রণভূমিতে আমাদেরই ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা গ্ল্যাডিয়েটাররা অন্য ক্রীতদাসদের মতো নই। এক দিক থেকে আমরা অনেকের চোখে সুখী সম্প্রদায়। আমাদের কোনও খনিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় না, মাঠেও হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। এমনকী প্রভুর সংসারে দিনভর সেবার বিনিময়ে নিষ্ঠুর পীড়নের শিকার হতে হয় না।

আমরা কেউ কেউ স্বাধীন রোমানের মতো বিয়ে সাদিও করতে পারি। কারণ, গ্ল্যাডিয়েটারের বীজ বীর উৎপাদনে সক্ষম। ফলে কারও কারও অবসরে পারিবারিক জীবনও থাকে। আমাদের মধ্যে যারা লড়িয়ে হিসাবে খ্যাতিমান তাদের নাম আমজনতার মুখে মুখে ফেরে। তাদের কেউ কখনও রাজপথে বের হলে পিছনে অনুরাগীরা জয়ধ্বনি দিয়ে হাঁটতে থাকেন। তাদের চারপাশে অহরহ জনতার ভিড়। আমরা রোমান শিল্পীদের রচিত দেওয়াল চিত্রে ছবি হয়ে ফুটি, আমাদের লড়াইয়ের ভঙ্গিটি ইতিহাসের জন্য ওরা রকমারি মূর্তিতেও ধরে রাখেন। আমাদের ওঁরা চিরজীবী করে রাখার জন্য যেন সতত যত্নশীল। তবু আমরা এক চিরদুঃখী সম্প্রদায়। আমরা জানি কেন ওঁরা আমাদের এমন যত্নসহকারে লালন করেন, জানি কী আমাদের নিয়তি।

গ্ল্যাডিয়েটার তৈরি করার জন্য রাজধানী রোম বিরাট এক আখড়া ছিল। ওঁরা বলতেন ট্রেনিং সেন্টার, শিক্ষালয়। সেটি খাস রাজসরকারের অধীন। সেখানে অগণিত দাস নানা অস্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়। রীতিমতো কঠোরতার মধ্যে শরীর-চর্চা এবং অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন ছিল আমাদের কাজ। কঠিন সেই জীবন।

আমাদের রাখা হত এমন নিচু ও অন্ধকার ব্যারাকে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় ছিল না। সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হত, বেরও হতে হত হামাগুড়ি দিয়ে। সেই কারাগার তুল্য ঘরগুলোতে কোনও হাতিয়ার রাখা হত না। কারণ, যন্ত্রণাকাতর গ্ল্যাডিয়েটার ক্ষিপ্ত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারে। আমাদের অস্ত্রশিক্ষাও করতে হত ধারহীন ভারী অস্ত্র নিয়ে। এমন অস্ত্র, আসল ধারালো অস্ত্র যার চেয়ে অনেক বেশি হালকা। সে-সব অস্ত্র থাকত রক্ষীদের হেফাজতে বিশেষ অস্ত্রশালে। আমাদের খেতে দেওয়া হত প্রধানত বার্লি। মাঝে মাঝে চিকিৎসকরা আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন। অসুখ বিসুখ হলে তাঁরাই চিকিৎসা করতেন। একবার কে যেন বলেছিলেন, ক্রমাগত বার্লি খাওয়ার ফলে আমাদের পেশি পুষ্ট হলেও অতিশয় নরম, তাকে শক্ত করা দরকার। ফলে মেনুতে কখনও কখনও এটা সেটা যোগ করা হত।

আমরা যা পেতাম তা-ই খেতাম, তবু আমাদের শরীরে যেন অসুরের বল। কারণ হতে পারে একটাই, নিয়মিত দেহচর্চা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করে শিক্ষার্থী জীবনযাপন। রাত্রে আমরা যাতে কোনও মতে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে সেইসব অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে না-পারি সে-জন্য দেওয়ালের শেকলে বেঁধে রাখা হত আমাদের পা। কারণ, রোমান প্রভুদের কাছে আমরা মূল্যবান সম্পদ, এমন এক ক্রীড়াবস্তু সহসা যা কোনও গোলামের হাটে কিনতে পাওয়া যায় না। ফলে রাজ্যের সর্বত্র ছিল ট্রেনিং স্কুল বা গ্ল্যাডিয়েটার তৈরির কারখানা। তার মধ্যে বেশ কিছু যদি সরকারি, তবে বিস্তর অ-সরকারি। নানা মাপের রোমান প্রভু তা চালান। তবে কড়াকড়িতে সবাই সমান।

উচ্চাঙ্গের নৃত্যের মতোই গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াই। তার একটা বিশেষ রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে। হাত পায়ের মুদ্রা এবং চোখও সেই ব্যাকরণের অন্তর্গত। প্রভুরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ভঙ্গি বিচার করেন। উদ্যত অস্ত্রের সামনে কেউ চোখের পলক ফেলেছে কিনা সেটাও বিচার্য। এই কঠোরতা সবাই সহ্য করতে পারত না। বিশেষত, সবাই যেখানে জানেন, এই কুশলতার লক্ষ্য একটাই, সামনের অন্য গ্ল্যাডিয়েটারকে নিপুণ ভাবে হত্যা করা, বা তার নিপুণতর ছন্দের কাছে হার মেনে খুন হওয়া। সুতরাং, কখনও কখনও কানে ভেসে আসে বিষাদ সমাচার,—উনত্রিশ জন স্যাক্সন যুদ্ধবন্দি যাদের গ্ল্যাডিয়েটার হিসাবে তৈরি করা হচ্ছিল, অস্ত্রের অভাবে তারা মুক্ত হয়েছিল পরস্পরকে গলা টিপে হত্যা করে!

আমরা যারা বেঁচে থাকতাম, তারা অপেক্ষা করতাম প্রদর্শনী লড়াইয়ের দিনগুলোর জন্য। লড়াইয়ে আগে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তাতে বিশিষ্ট লড়িয়েদের নামও দিয়ে দেওয়া হত অনেক সময়। তা ছাড়া শিঙা ফুঁকেও প্রচার করা হত দর্শনীয় অনুষ্ঠানটির কথা সর্বজনের গোচরে আনার জন্য। এই সব লড়াই রাজনৈতিক অনুষ্ঠানও বটে। শাসকরা যেমন প্রজাদের খুশি করে তাঁদের জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে চান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকরা বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে এ মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান যাতে তাদের প্রতিপত্তি বাড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা আবার চান ভবিষ্যতে সেনেটে একটি আসন লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।

একজন রসিক রোমান কবি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, হায় এমন দিনও বুঝি-বা এল যখন একজন চর্মশিল্পী বা জুতো-কারিগরও অর্থকৌলিন্য প্রমাণের জন্য অ্যাম্ফিথিয়েটারে গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াই আয়োজন করছে!

যা-হোক, লড়াইয়ের আগের দিন আমাদের ভালমন্দ খেতে দেওয়া হত। এমন খাবার যা আনন্দ-উৎসবেই মানায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিশ্চয় জানা হয়ে গেছে তোমাদের। তিনি লিখেছেন, কেউ কেউ সেদিন পাগলের মতো খেত, কেউ কেউ কম কম খেত, আবার সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা ভেবে কেউ কেউ মোটে খেতেই পারত না। তাদের ক্ষুধা উবে যেত, উদর খাদ্য গ্রহণে মোটে রাজি নয়। চোখ দিয়ে দরদর করে নেমে আসত জলের ধারা। জীবন যেখানে এমন অনিশ্চিত, মৃত্যু যখন ওঁৎ পেতে অদূরে তখন এই প্রতিক্রিয়া অবশ্যই স্বাভাবিক। পরদিন আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তৈরি হতাম অ্যাম্ফিথিয়েটারের জন্য। আমাদের গায়ে ঝলমলে পোশাক। আমাদের ঘিরে চতুর্দিকে জনতার উল্লাসধ্বনি, আমরা বধ্যভূমি তথা ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছতাম চেরট বা ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে। রথ থেকে নামার পর গ্ল্যাডিয়েটারদের জন্য নির্দিষ্ট তোরণ দিয়ে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। তারপর শোভা যাত্রা করে দর্শকদের সামনে দিয়ে গোটা রণাঙ্গন পরিক্রমা করতাম। আয়োজক যদি হন স্বয়ং সম্রাট, তবে আমরা তাঁর আসনের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতাম। তারপর ডান হাত আকাশে ছুড়ে উচ্চকণ্ঠে বলতাম—"হে সম্রাট, যারা মরতে চলেছে তুমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করো!"

—মরতে চলেছে, না না-মরতে? একবার রসিকতা করে জবাব দিয়েছিলেন ক্লডিয়াস। আমাদের মুখে হাসি। সৌভাগ্য আমাদের, আমরা রাজ-অনুকম্পা লাভ করেছি। তবে আর লড়াই কেন? "অ্যারিনা" বা রণভূমিতে না নেমে আমরা উলটোপথে পা বাড়ালাম।—এ কী হচ্ছে? জিজ্ঞাসা ক্রুদ্ধ সম্রাটের চোখে। তিনি গর্জন করে উঠলেন—ওদের সবাইকে নৌকোয় তুলে তাতে আগুন দাও।—হ্যাঁ, কেউ যেন বাঁচতে না পারে। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি হওয়াই দরকার।

সেবার রণভূমি সাজানো হয়েছিল ফুসিন হ্রদের ধারে। যমদূতের রক্ষীরা সব এগিয়ে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ কী ঘটল, কে জানে! ক্লডিয়াস নেমে এলেন হ্রদের ধারে। তারপর আমাদের বললেন, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি তার জন্য তোমাদের এ ভাবে দণ্ডিত করতে চাই না। যাও, তোমরা ফিরে গিয়ে যা করতে এসেছিল তা-ই করো। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। তোমরা যথারীতি লড়াই শুরু করো। আমরা সম্রাটকে অমান্য করি, কারও এমন সাহস ছিল না। স্বভাবতই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেঁচে থাকলেও, লড়াই শেষে অনেকেই আর ব্যারাকে ফিরতে পারেনি।

কোনও কোনও সম্রাট ছিলেন আবার অমনোযোগী দর্শক। দর্শকদের নজর একদিকে যেমন আমাদের ওপর নিবদ্ধ, অন্যদিকে ঘুরে ঘুরে চলে যায় সম্রাটের দিকে। প্রজাদের কাছে তিনিও অন্যতম আলোচ্য। তাঁকে ঘিরে নানা গুঞ্জন। সম্রাট

ডোমিটিয়ানের আচরণ ছিল অভিনব। তাঁর সঙ্গে থাকত তাঁর হাঁটুর সমান উঁচু লাল রঙের পোশাক-পরা একটি ছোট ছেলে। সম্রাট অনবরত তার সঙ্গে কথা বলতেন। আমরা যখন মরণপণ লড়াই করছি তখন তিনি নাকি ওই বালককে বলছিলেন—জানো এই মাত্র আমি মেটিয়াস রুকাসকে আফ্রিকার শাসক নিযুক্ত করে এলাম। রাজকীয় তথ্য পরিবেশনের যোগ্য স্থান এবং পাত্র বটে!

স্বয়ং সম্রাট যেখানে উপস্থিত, সেখানে তিনি, অন্যত্র প্রদর্শনীর আয়োজকরাই ছিলেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অবশ্য জনমত তাঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটার যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ত তখন উন্মত্ত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ত। চিৎকার করে বলত—বেশ হয়েছে! ওর যা প্রাপ্য ছিল তা-ই পেয়েছে।—খতম করো ওকে! অসহায় গ্ল্যাডিয়েটার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত উল্লাসমুখর সেই ভিড়ের দিকে। সেখানে সব যেন ঝাপসা, অস্পষ্ট। তারই মধ্যে যদি দেখা যায় দিকে দিকে আন্দোলিত হচ্ছে রুমাল, এবং প্রত্যেকেই তুলে ধরেছে বৃদ্ধাঙ্গুলি, তবে তার অর্থ—জনতা তাকে মার্জনা করছে। আসরের আয়োজকও তখন তাঁর জনপ্রিয়তার খাতিরে আর গণআদালতের রায় পালটান না। রক্তাক্ত দেহে এই গ্ল্যাডিয়েটার তখন আবার ফিরে আসে নিজের ব্যারাকে। ওরা যদি বুড়ো আঙ্গুলটি উপরের দিকে না তুলে, নির্দেশ করত নীচের দিকে তবে মৃত্যু ছিল অবধারিত।

জনতার মত কীভাবে তৈরি হত সমকালের দর্শকরা তারও কিছু কিছু নমুনা শুনিয়েছেন। জুভেনাল লিখেছেন, স্ত্রী উত্তেজনায় কাঁপছেন, আর চিৎকার করে বললেন, খতম করে দাও ওকে!—খতম করো! স্বামীর জিজ্ঞাসা,—কী এমন করেছে বেচারা যে তাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করতে হবে? দেখো, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সব সময় ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় বিচার করা দরকার,—তাই নয়?—তুমি পাগল! তুমি ঘোরতর উন্মাদ! তুমি কি মনে করো ক্রীতদাসরা মানুষ? ধরা যাক, সে কোনও অপরাধই করেনি, তবু আমি যখন ওর মৃত্যু চাইছি তা-ই কি যথেষ্ট নয়? আমি চাইছি, আমি হুকুম দিচ্ছি, সেটাই যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট নয়!

সুতরাং, পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটারের বুকে বিজয়ীর উদ্যত অস্ত্র সর্বক্ষেত্রে মার্জনা মঞ্জুর করতে পারত না, সুবেশ সুবেশা স্বাধীন অন্নপুষ্ট রোমান নরনারীর রক্ততৃষ্ণা মেটাতে প্রায়শ আমাদের হত্যা করতে হত ভ্রাতৃপ্রতিম অন্য যোদ্ধাদের। এখনকার মতো ছাড়া পেলেও আমাদের অধিকাংশকেই শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়তে হত এই করুণাহীন আদিম বধ্যভূমিতে। এই পরিণতিই আমাদের অধিকাংশের ভবিতব্য। খ্রিস্টজন্মের অন্তত তিনশো বছর আগে থেকে আমাদের নিয়ে চলেছে এই রক্তের খেলা। গর্বিত রোমানের এই আমুদে ক্রীড়ার জন্যই আমাদের এই দেহ, এই পেশি, এবং আত্মঘাতী এইসব হাতিয়ার! প্রথমে সাধারণ হাতিয়ার। সে-পরীক্ষা শেষে, এক অস্ত্রের ঝনঝনানি থামতে না থামতে অন্য অস্ত্র তুলে নিতে হবে হাতে। এ বার হয়তো ঢাল তলোয়ার। তার রক্ততৃষ্ণা মিটবার পর আসবে বর্শা, ত্রিশূল, জাল। জালে যেভাবে বন্য জন্তু ধরে সেভাবেই এক গ্ল্যাডিয়েটার বন্দি করবে অন্য গ্ল্যাডিয়েটারকে।

তারপর বিদ্ধ করো তাকে সূচ্যগ্র ধারালো বর্শায়।

কখনও আবার হাতে তুলে দেওয়া হয় ভারী খড়্গ, কিংবা অন্য কোনও অভিনব অস্ত্র। খেলাচ্ছলে মানুষ খুনের সব উপকরণই মজুত বধ্যভূমিতে। ক্লান্ত যোদ্ধা যখন অবশ শরীর নিয়ে এলিয়ে পড়বে মাটিতে তখন তার দেহ বঁড়শিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে পাশের একটি ঘরে। জল্লাদরা সেখানে তার পোশাক খুলে নিয়ে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দেবে জীবনের ম্রিয়মাণ শিখাটিকে। সেটা "মার্সি কিলিং", অনুকম্পাবশত হত্যা।

উন্মত্ত জনতার রায়ে, কিংবা মাননীয় উদ্যোক্তার নির্দেশে যাদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের খুন করা হয়েছে সকলের সামনেই, —"অ্যারিনা" বা লড়াইয়ের আসরে। এ বার যাদের নেপথ্যে চিরবিদায় দেওয়া হল তারা আক্ষরিক অর্থে "পরাজিত" নয়, ক্ষতবিক্ষত, এই যা। যেহেতু তারা চিকিৎসার অতীত, প্রভুরা তা-ই তাদের চিরকালের মতো ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। সব মৃত গ্ল্যাডিয়েটারের পোশাক এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কবর দেওয়ার আগে তুলে নেওয়া হবে। পরে স্মারক হিসাবে সেগুলি নিলামে বিক্রি হবে। আধুনিক পৃথিবীতে বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা গায়কদের নানা স্মারক নিয়ে নিলামের বাজারে যেমন কাড়াকাড়ি, প্রাচীন রোমে গ্ল্যাডিয়েটারের স্মৃতি-সামগ্রী নিয়েও তেমনিই বাড়াবাড়ি। যে জীবৎকালে যত খ্যাতিমান লড়িয়ে ছিল তার স্মারকের দাম তত বেশি। সে-ও এক ধরনের উন্মাদনা।—নাকি মূল ক্রীড়াটির মতোই আর এক বিকার? একজন গ্ল্যাডিয়েটার তার কবরের ফলকে লিখে রেখে গিয়েছে সতর্ক বাণী: জানবে, তুমি যা কিছু করছ সবই তোমার ললাটের লিখন! পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটার তা সে যেই হোক না কেন, তার জন্য কেউ নয়!

যুগান্তরে লর্ড বায়রন নামে এক ইংরেজ কবি এই বধ্যভূমিতে পায়চারি করতে করতে আপন হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন আমাদের মর্মবেদনা:

> তার চারপাশে ঘুরে বড়াচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন। তার জীবনে ছেদ পড়তে চলেছে। সেই অমানবিক ধ্বনি তার নামে যে-হতভাগ্য আজ বিজয়ী। পরাজিত তা শুনছে। আসলে সে কিছুই শুনছে না, তার চোখ নিবদ্ধ তার হৃদয়ে, সে অনেক অনেক দূরে। সে মরতে চলেছে না বিজয়ী, তাতে কিছু আসে যায় না, তার হৃদয় পড়ে আছে দানিয়ুবের তীরে সেই কুঁড়ে ঘরটিতে, যেখানে তার দুই সন্তান আরণ্যক বর্বরের মতো খেলা করছে, যেখানে তার ডাসিয়ান জননী, যিনি তাকে লালন করেছেন, তিনি জানেন না, রোমানরা তাদের আমোদের জন্য তাকে হত্যা করছে।

বায়রন বলেছেন—ওরা তাকে হত্যা করছে "রোমান হোলিডে" উৎযাপনের জন্য। অনুবাদটা তা-ই ঠিকঠাক করা হয়েছে এমন দাবি করা যাবে না। কেন-না, কথা বলছেন কবির ভাষায়। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তিনি আমাদের জন্য চোখের জল ফেলছেন।

মৃত্যুর কত রূপ হতে পারে, মানুষ যে মানুষের প্রতি কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলোর রক্তমাখা ইতিহাসের পাতায় ছড়ানো রয়েছে তার অজস্র নমুনা। ওদের একটা কুখ্যাত খেলার নাম ছিল—"হান্ট" বা ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের খেলা। খেলাটা আদিতে ছিল অবশ্য পশুর সঙ্গে পশুর লড়াই। কিন্তু রক্তের পিপাসা বেড়ে যাওয়ার পর শুরু হল পশুর দঙ্গলে বন্দি এবং দাসদের নিক্ষেপ করা। অনেক আদি খ্রিস্টান যাজক এবং বিশ্বাসীকেও হত্যা করা হয়েছে এ ভাবে। সে-খেলাই ক্রমে জমে উঠে। শুরু হয় বন্যপশু আর গ্ল্যাডিয়েটারের মরণ-পর লড়াই। এই রোমান ব্যসনের জন্য এক সময় আফ্রিকার বন আর হ্রদগুলো পর্যন্ত সিংহ, চিতা, গন্ডার এবং কুমিরশূন্য হওয়ার দাখিল। সেই সব দৃশ্য কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয়। রোমান নারী পুরুষ তবু অধীর উত্তেজনায় কম্পমান, উল্লাসে উদ্বেল।

আর একটি অভিনব মৃত্যুর উৎসব ছিল কপট জলযুদ্ধ। সেখানে আমরা জ্যান্ত কুমিরের মুখে প্রাণ দিতাম। কখনও-বা যোদ্ধৃবেশে অন্য যোদ্ধার শরে বিদ্ধ হয়ে নকল সমুদ্রের জলে তলিয়ে যেতাম। খ্রিস্টীয় ৫২ অব্দে সম্রাট ক্লডিয়াস এমন একটি যুদ্ধের আয়োজন করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করে গেছেন। তাঁর রঙ্গভূমি ছিল রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ফুসিন লেক। তথাকথিত এই জলক্রীড়া চলেছিল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। লড়াই যখন থামল, সম্রাট এবং তাঁর তৃপ্ত প্রজাপর্গ হাস্যমুখে আসন ত্যাগ করলেন, শান্ত জলের হ্রদ তখন আবার শান্ত। শুধু পালটে গেছে তার জলের রং। সে-জল তখন রক্তে রক্তে টকটকে লাল। আমরা সেখানে এই পরবে রক্তদান করেছিলাম উনিশ হাজার গ্ল্যাডিয়েটার।

জুলিয়াস সিজারও শৌখিন ছিলেন বটে। তিনি রোমের ক্যাম্পাস মার্টিয়াসে একটি বিশাল হ্রদ কাটিয়েছিলেন। সেখানে নৌবহর সাজিয়ে লড়াই করেছিল দুই দল গ্ল্যাডিয়েটার। তাতে যোগ দিয়েছিল এক হাজার "নাবিক", আর দু'হাজার বৈঠাধারী। সবাই গ্ল্যাডিয়েটার কিংবা ক্রীতদাস। লড়িয়েদের একদল ভান করেছিল তারা মিশরীয় নৌবহরের লোক, অন্য দল সেজেছিল টায়ারের নাবিক। চারদিকে লোক ভেঙে পড়েছিল সে-খেলা দেখবার জন্য। যথারীতি তুমুল লড়াই একসময় শেষ হয়েছিল, এবং যথাপূর্ব এ বারও জলের রং লাল। সিজারের পরে শাসকরা এই হ্রদ বুঁজিয়ে দিয়েছিলেন। কেন-না, নয়তো দুর্গন্ধে টেঁকা ভার। হোক না এতকাল পরে, সে-দুর্গন্ধ তোমাদের নাকেও পৌঁছাচ্ছে নিশ্চয়!

এই জলক্রীড়ার নেশায় অগস্টাসও টাইবারের বাঁ-তীরে কাটিয়েছিলেন এক বিশাল জলাধার, আজকের মাপে ৫৫৭ মিটার × ৫৩৬ মিটার। মাপে এলাকাটা কলোসিয়ামের চেয়ে তিনগুণ বড়। তার কেন্দ্রে নকল একটি দ্বীপ ছিল। আশপাশে কিছু ঝোপও তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে মৃত্যুর অনবদ্য রাজকীয় প্রদর্শনী। এ ধরনের জলক্রীড়া বা রক্তের মহোৎসব আয়োজিত হয়েছে এমনকী খাস কলোসিয়ামের অ্যারিনা বা জল্লাদের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গনে। বৈচিত্র্যে এবং ধারাবাহিকতায় বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতার সে এক অন্তহীন কাহিনী।

মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও হত। আমাদের সঙ্গে মৃত্যুপথে তখন সহযাত্রী হত হাজার হাজার দর্শক। ঘরে ঘরে তখন হর্ষধ্বনির বদলে হাহাকার। ফুসিন হ্রদে ক্লডিয়াসের রক্ত নিয়ে খেলার কথা আগে বলা হয়েছে। আরও একটি বৃহৎ মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন তিনি পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে যখন ফুসিনের জল নিয়ে আসা হয় লিরিস নদীতে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সেখানে শুরু হয় সিসিলিয়ান ও রোডিয়ানদের নৌযুদ্ধ। কিন্তু সুড়ঙ্গের খাদে প্রয়োজনীয় গভীরতা ছিল না। ফলে হ্রদের জল তীরবেগে ছুটে এসে চতুর্দিকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গ্ল্যাডিয়েটাররা তলিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে সহমরণে গেল অসংখ্য দর্শক। ক্লডিয়াস তাঁর পত্নী না উপপত্নীর পরামর্শে তার দায় প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আমির না ওমরাহের কাঁধে চাপিয়ে কোনও মতে মুখরক্ষা করেন। এ ধরনের আর একটি বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটে একবার পম্পাইয়ে অ্যাম্ফিয়েটারের গ্যালারি ভেঙে। মৃত এবং আহতের সংখ্যা ছিল নাকি পঞ্চাশ হাজার।

তবু এই মারণ-যজ্ঞে কখনও দর্শকের অভাব হয়নি। সে-এক আশ্চর্য।—কেন? এ লড়াই কি মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলত? রক্ত-দর্শনে আপাত-সভ্য এই সব সুখী মানুষের রক্তে আদিমতার ঢেউ উঠত, তারা কামতাড়িত হয়ে নিজনিজ বন্দি বা অতৃপ্ত দেহক্ষুধাকে তৃপ্ত করার পথের সন্ধান পেতেন পেশিবহুল ওই সব সমর্থ যুবকের সতেজ দেহ থেকে ফিনকি দেওয়া রক্তধারায়। তবে কি একেই বলে—"স্যাডিজম"? পীড়ন প্রত্যক্ষ করার আনন্দ? আমরা জানি না। শুধু ওদের চকচকে লোভাতুর চোখগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিই। বিশেষ, রোমান নারীর চোখের এই জ্বলন্ত দৃষ্টি যখন দর্শককে দগ্ধ করে, তখন ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কী উপায়। এই কামনার আগুনে ওঁরা নিজেরা পুড়ে মরলেই আমাদের শান্তি। এবং স্বস্তি।

সমকালের মানুষ ওবিদ প্রকারান্তরে বলেছেন অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলো কামদেবের সাজানো উপবন যেন। সেখানে সতত মদনোৎসব। তিনি লিখেছেন:

> ক্রীড়াঙ্গনে সমবেত হয়েছিল নানা দেশের সুন্দরী রমণীরা। চারদিকে সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে যুবকেরা। ভালবাসার আগুন জ্বালাবার মতো অতএব জ্বালানির অভাব ছিল না। গোটা দুনিয়া যখন রোমে সমবেত, প্রত্যেক পুরুষের হৃদয়ে তখন ঘূর্ণি, কেন-না, কোনও বিদেশি নারীর হাতে হাত রাখলে মুহূর্তে তা পরিণত হবে ঝড়ে।

এই সব রক্তাক্ত উৎসব ছিল নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সময়। সে-পুরুষ বা নারী সবাই স্বাধীন রোমান নাগরিক। আমাদের প্রেম প্রণয় সবই অন্য ছকে বাঁধা। এক, যারা বিয়ের অনুমতি পেয়েছে, তারা সংসারের বাঁধনে বাঁধা। অর্থাৎ যাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যা, মা বাবা ভাইবোন রয়েছে, তাদের জীবনধারাকে তোমরা গতানুগতিকও বলতে পারো বটে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে তোমাদের। যে-সব গ্ল্যাডিয়েটার বিয়ে করার অনুমতি পেত, তাদের পুত্ররা জানত একদিন হয়তো

লড়াইতেই প্রাণ দিতে হবে তাদের। মৃত্যু সব মানুষেরই নিয়তি, কিন্তু আনন্দ মুখরিত রণাঙ্গনে উন্মত্ত দর্শকদের বৃদ্ধাঙ্গুল উপরের দিকে তোলা আর নীচের দিকে তোলার উপর যাদের জীবন মরণ—মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ধারণা অন্যরকম হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিছু কিছু গ্ল্যাডিয়েটার প্রভুদের দয়ায় অবসর নিত। সংখ্যায় তারা মৃতের তুলনায় নগণ্য। তাদের হাতে একটা কাঠের তলোয়ার তুলে দিয়ে বলা হত—যাও এ বার তোমার ছুটি। কোনও কোনও মনিব তাদের অবসর ভাতাও দিতেন। তারা বিয়ে করে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করতেন। মৃত্যুর পর তাদের যথারীতি পারলৌকিক ক্রিয়াদি হত। কবর হত। কখনও কখনও কবরে ফলক। বিখ্যাত গ্ল্যাডিয়েটারের নির্বোধ ছেলে হয়তো স্বপ্ন দেখত বাবার মতো সেও একদিন খ্যাতিমান লড়িয়ে হবে। সে-জীবন যে একটি সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা তার সে-হুঁশ থাকত না। একবার এমনই এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ যখন ঘুমোচ্ছে তখন তার বোন ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে নেয়। সে চায় না, ভাই তার বধ্যভূমিতে লড়াইয়ের নামে প্রাণ দেয়। সুস্থ হওয়ার পর ছেলেটি বোনের নামে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে। বোনকে বিচার সভায় তলব করা হল। মেয়েটির সাহস ছিল। বলল, আমার উচিত ছিল ওর সব ক'টি আঙুল কেটে নেওয়া।

গ্ল্যাডিয়েটারের জীবনে সম্পর্কে তার কোনও মোহ ছিল না। কেনই-বা থাকবে? গ্যালারিতে যখন হাজার হাজার রক্ত-পাগল তখন বিচারের নামে যে প্রহসন হবে না তার নিশ্চয়তা কী? সে-বার বাটোর কী হল? বেচারা সবে একটি লড়াই জিতেছে, হুকুম হল তোমাকে আবার লড়াই করতে হবে। বাটো ক্লান্ত, শরীর তার রক্তাক্ত, তবু আবার হাতিয়ার হাতে তুলে নিতে হল। সে-লড়াইতেও সে বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু প্রভু এবং দর্শকদের বায়না, তোমাকে আরও একবার তোমার শৌর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। গোটা অ্যাম্ফিথিয়েটার উল্লাসে ফেটে পড়ার উপক্রম। বলা নিষ্প্রয়োজন, শেষ লড়াইতে বাটোর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে দ্বৈরথের আঙ্গিনায়! আমরা অন্য গ্ল্যাডিয়েটাররা সেদিন ওর জন্য কেঁদেছিলাম। এ তো খেলা নয়, সরাসরি খুন। আমরা সকলে মিলে ঘটা করে কবর দিয়েছিলাম ওকে। বলেছিলাম, বাটো, ওরা তোমার মান রাখেনি, আমরা রাখলাম। ভাই, এ বার তুমি ঘুমাও।

ফ্ল্যামো নামে একজন গ্ল্যাডিয়েটার ছিল। সে বেঁচেছিল তিরিশ বছর। ছুটি মঞ্জুর হওয়ার আগে তাকে লড়তে হয়েছিল আটত্রিশ বার। এই দক্ষ গ্ল্যাডিয়েটার জিতেছিল পঁচিশটি লড়াইয়ে, হেরেছিল চারটিতে, তার জয় পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি নয়টি লড়াইয়ের। অবসর অনুমোদনের আগেই কিন্তু খুন হয়ে যায় বেচারা। হত্যাকারী কে আমরা জানি না। প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও অভিজাত হওয়া অসম্ভব নয়। সেরা গ্ল্যাডিয়েটারদের একজন অন্য কোনও প্রভুর হেফাজতে থাকবে, তা সবাই কি সইতে পারে?

পম্পাইয়ে পুলিয়াস ওসট্রোরিয়াস নামে একজন গ্ল্যাডিয়েটার ছিল। সে ক্রীতদাস

ছিল না। একজন স্বাধীন রোমান হয়েও স্বেচ্ছায় গ্ল্যাডিয়েটারের জীবনে বেছে নিয়েছিল বীরত্ব দেখাবার জন্য। ছেলেটির, সন্দেহ নেই, নিষ্ঠা ছিল। ছিল অপরিমিত সাহসও। একান্নটি লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার পরও কিন্তু তার অবসর মেলেনি। কারণ, রোমান হলেও সে গ্ল্যাডিয়েটার। তাকে বলা হয়েছিল, আবার ডাক পড়লেই তোমাকে লড়াই করতে হবে। তাকে দিয়ে নতুন অঙ্গীকার করানো হয়েছিল,—আমাকে পুড়িয়ে মারলে, শেকলে বেঁধে রাখলে, চাবুক কিংবা ডান্ডা দিয়ে পেটালে, কিংবা ইস্পাতের তলোয়ারে কাটলেও আমার কোনও আপত্তি নেই!

তারপর কি বলতে হবে সেই মেয়েটি কেন ঘুমন্ত ভাইয়ের আঙুল কেটে নিয়েছিল?

হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্যের আকাশে নিঃসীম অন্ধকারে কখনও সখনও চাঁদও উঁকি দিত। ভালবাসার জ্যোৎস্না ফুটে উঠত। রোমান সুন্দরীরা তখন মর্ত্যের মায়াময় মৃত্তিকায় আমাদের লোহার মতো শরীরকে তাঁদের কোমল হাতে টেনে নিতেন বুকে। অনেকের কাছেই অনাস্বাদিত সেই আমন্ত্রণ। সেই বহুবন্ধন ছিন্ন করি, সুস্থ সবল লৌহদৃঢ় দেহধারী এই গ্ল্যাডিয়েটারের সেই সাধ্য নেই। প্রভু ভৃত্য, মনিব এবং ক্রীতদাসের পরিচয় তখন লুপ্ত, মানব আর মানবী, এই আমাদের একমাত্র পরিচয়।

অভিজাত রোমানদের ঘরোয়া আড্ডা কিংবা সেনেটে গুরুতর আলোচনার পর ওই যে মান্যদের মধ্যে লঘু কথাবার্তা চলেছে, সেখানে কান পাতলে শুনবে আমাদের নিয়ে কত না গুঞ্জন। শুনবে নিচু গলায় ওরা এমন সব কথা বলছেন, যা অনেকের কাছে হয়তো শুনলেও পাপ! বিখ্যাত সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের পুত্র সম্রাট কমোডাসের প্রকৃত জনক নাকি অরেলিয়াস নন, আসলে একজন নামহীন গ্ল্যাডিয়েটার। সে-কারণেই কি এই সম্রাট সিংহাসনে বসার আগে ও পরে গ্ল্যাডিয়েটার সেজে রণভূমিতে অবতীর্ণ হতেন? ওঁরা ফিসফিস করে বলবেন ক্লডিয়াসের সেনাপতি কার্টিয়াস রুফাসের বাবাও কিন্তু কোনও সম্ভ্রান্ত রোমান নন, তাঁর ধমনীতে কোন দেশের রক্ত বইছে, কে তা নিশ্চিত বলতে পারেন? কারণ, তাঁর বাবা, কে না জানেন, একজন গ্ল্যাডিয়েটার। শুধু কি ওঁর বাবাই? তোমরা কি জানো না নিরোর প্রধান উপদেষ্টা নিমফিডিয়াস স্যাবিনাসের বাবাও কিন্তু একজন দাস-গ্ল্যাডিয়েটার। সমসাময়িকরা অনেকে তার নামও জানতেন। নাম তার—মার্তিয়ানাস। বলাই বাহুল্য, ওই গর্বিত রোমান ওমরাহের মা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত রোমান কন্যা। তিনি নাকি ওই গ্ল্যাডিয়েটারের প্রেমে পড়েছিলেন!

রোমের দীর্ঘ ইতিহাসে হয়তো এ-ধরনের আরও অঘটনই ঘটেছে। কোনও কোনও গ্ল্যাডিয়েটার মই বেয়ে সমাজের উপরতলায় ঠাঁই করে নিয়েছিল। কেউ কেউ সাম্মানিক নাগরিকত্বও লাভ করেছিল। একজন নাকি ছিল সাত-সাতটি শহরের সাম্মানিক নাগরিক। তাদের কাছে হয়তো কিছুই অলভ্য ছিল না। কিন্তু যারা বড় ঘরের মান্য গৃহিণীর গোপন প্রেমিক, তাদের জীবন নিশ্চয় ছিল বিপদসংকুল। কেন-না, এ তো যোগ্যতাবলে পরিশ্রমের বিনিময়ে সামাজিক মর্যাদা লাভ নয়। প্রভুর শয়নগৃহে তাঁরই শয্যাকে আপন পুষ্প-শয্যায় পরিণত করা! লড়াইয়ের আঙিনার মতোই

মানব-মানবী হয়তো সমাজ বন্য, সমাজ আদিম। সেখানে যদি যে-কোনও মুহূর্তে মৃত্যু হানা দিতে পারে, তবে এখানেই-বা নয় কেন? কিন্তু আমাদের তা ভাববার সময় কোথায়? উত্তাপে কি তবে আমরা দ্রব হয়ে যাব, কিংবা উবে যাব বাষ্প হয়ে?

প্রেমিক প্রেমিকা যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত না হলেও সমবয়সের তখন অবশ্য পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। ভালবাসা যেখানে নিবিড় সেখানে সামাজিক অনুশাসন শিথিল হতে বাধ্য। স্বাধীন রোমান তরুণীকে তো কেউ আর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না! সুতরাং, প্রয়োজনে তারা অভিসারিকা হত। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলে কখনও-বা অসামাজিক বন্ধনেই বাঁধা পড়ত। কালাদাস নামে একজন গ্ল্যাডিয়েটার ছিল । সুদর্শন যুবা। কমবয়সি রোমান মেয়েরা তাকে দেখলে পাগল-প্রায়। আর একজন ছিল ক্র্যাসিয়াম। তাকে ঘিরে কী না করত ওরা। ভাবখানা এই, এই সব বলিষ্ঠ যুবার আলিঙ্গনে পিষ্ট হয়ে মরতেও যেন রাজি তারা। আপন-প্রিয় একজন গ্ল্যাডিয়েটারকে মরতে দেখে তার প্রেমিকা প্যারিরাসে লিখেছিল তার মর্মবেদনার কথা:

> গর্বিত রোমানের নির্দেশে ম্যামিল্লো জাল হাতে রণভূমিতে যারা অবতীর্ণ হয়েছিলে, তুমি, হায়, তুমি তাদের মধ্য থেকে চলে গেলে। তোমার মজবুত হাতে ছিল তোমার একমাত্র হাতিয়ার, একটি তলোয়ার। পেছনে রেখে গেলে তুমি বেদনার্ত আমাকে আমারি অন্তহীন যন্ত্রণায়! (ইত্যাদি)।

একজন নিহত গ্ল্যাডিয়েটারের তরুণী স্ত্রী কবর লিপিতে লিখে গেছেন:

> কোনও মানুষ নয়, তোমাকে হত্যা করেছে তোমার ভবিতব্য। বিজয়ী হয়েছিলে তুমি, কিন্তু মরতে হল তোমার দেহক্ষতের জন্য।
>
> ...
>
> এ মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে আমার সহযোদ্ধারা, সবাই ভালবাসে আমাকে, আমি কাউকে কখনও যন্ত্রণা দিইনি। কিন্তু এখন আমাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

কালের ব্যবধানে আমাদের সেদিনের ভাষা হয়তো তোমাদের কাছে কিছুটা হেঁয়ালির মতো শোনাবে। অনুবাদ হয়তো যথাযথ হয়নি। কিন্তু এই বার্তাটুকু নিশ্চয় তোমাদের কানে পৌঁছেছে যে, আমরা গ্ল্যাডিয়েটাররা কেউ কেউ নারীর ভালবাসাও পেয়েছিলাম। শুধু আত্মীয় বন্ধুদের নয়, অপরপক্ষের, প্রভুকুলের রূপসীদের ভালবাসাও। মনে পড়ে বিখ্যাত কবি জুভেনালের সেই বিদ্রূপের কথা। তিনি ছন্দ করে লিখেছিলেন:

> ইপিয়া কী সেই তারুণ্যের মাধুর্য, কী এমন মুগ্ধকর বস্তু খুঁজে পেয়েছিলে ওর মধ্যে। "গ্ল্যাডিয়েট্রেস", গ্ল্যাডিয়েটার-রমণী এই পরিচিত কি এতই মূল্যবান ঠেকেছিল তোমার কাছে? এই তরুণ বহুকাল আগেই তার শ্মশ্রু মোচন করেছিল (অর্থাৎ, তার বয়স হয়েছে), তার একটা হাত জখম, হয়তো এবার সে অবসর অর্জন করবে। তা ছাড়া সে দেখতেও কদর্য,

কপালে হেলমেটের দাগ, নাকে মস্ত আঁচিল, চোখ দিয়ে সব সময় জল পড়ছে। স্বদেশ, আপন সন্তান, বোনরা—সবাইকে ভুলে গিয়ে ওকেই তুমি স্বামীত্বে বরণ করে নিলে!

নারী কখনও, কেন কাউকে আপন হৃদয় সমর্পণ করে কবিদের পক্ষে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। অন্তত তা-ই অনেকের ধারণা। কিন্তু এই গর্বিত রোমান ছান্দসিক স্পষ্টতই জানেন না নারী-হৃদয়ের গহনে কী থাকতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে সুখী সম্ভ্রান্ত কুলবধূ কেন আপন সমাজ সংসার স্বামী ও পুত্রকন্যাদের ত্যাগ করে ক্ষতবিক্ষত কদাকার এক গ্ল্যাডিয়েটারের হাত ধরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়।

অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনাই হয়তো আছে ক্রীতদাস এবং গ্ল্যাডিয়েটারের ইতিহাসে। কারও কারও জীবনে আছে হয়তো নানা সুখস্মৃতি। কখনও হয়তো রাতের তারা পুষ্পবৃষ্টি করেছে তাদের মাথায়, কখনও হয়তো-বা রামধনুকের সাতরং খেলে গেছে চোখের সামনে। কিন্তু মৃত্যুর ছায়া কোনও দিনই এড়াতে পারেনি কোনও গ্ল্যাডিয়েটার। অস্ত্রদীক্ষার দিন থেকেই মৃত্যু তার ছায়াসঙ্গী। লক্ষ লক্ষ গ্ল্যাডিয়েটারের জীবনে পরম সত্য সেটাই। তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু। রক্তাক্ত মৃত্যু।

মরে মরে একদিন আমরা বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম। একজন জার্মান গ্ল্যাডিয়েটার একবার বিষ খেয়েছিল। শুনে সেনেকা বলেছিলেন,—মুক্তি যেখানে এত কাছে, আশ্চর্য, মানুষ তবু কেন দাস। আমরা দরদীর এই দার্শনিকতায় বিশ্বাসী ছিলাম না। মরার আগে শত্রুকে আমরা মারতে চেয়েছিলাম। আমরা খোলা তলোয়ার হাতে ওদের চোখে চোখ রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

সেটা খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ অব্দের কথা। আমরা কপুয়ার সত্তরজন দাস শেকল ছিঁড়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম ব্যারাক-নামক ওই কারাগার থেকে। আমাদের পুরোভাগে স্পার্টাকাস। আমরা ওকে বলতাম থেরেসের অভিশপ্ত রাজকুমার। জন্মে থ্র্যাসিয়ান হলেও আসলে স্পার্টাকাস প্রথম জীবনে ছিল একজন রোমান সৈনিক। থেরেস এখন একটি স্বাধীন রাজ্য। রোমানরা প্রায়ই সেখানে হানা দিত। আবার ফিরে আসত নিজেদের সীমানার মধ্যে। সম্ভবত তখনই তারা বন্দি হিসাবে পেয়েছিল তরুণ স্পার্টাকাসকে। থ্র্যাসিয়ান হয়ে থেরেসের বিরুদ্ধে হানাদারি? সুযোগ বুঝে স্পার্টাকাস রোমানদের ফৌজ থেকে পালিয়ে যায়। তখন সে স্বাধীন ভবঘুরে। দুর্ভাগ্যবশত আবার সে ধরা পড়ে যায় রোমানদের হাতে। এ বার তারা ওকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয় নগদের বিনিময়ে। স্পার্টাকাস অতঃপর কপুয়ায় একজন গ্ল্যাডিয়েটার হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই রক্তাক্ত ক্রীড়ায় কপুয়া অন্যতম প্রাচীন পীঠ। পম্পাইয়ের মতোই এক সময় রোমকে ছাপিয়ে খুনি-উৎসবে তার খ্যাতি।

রক্তস্নাত সেই কপুয়ায় আমরা বিদ্রোহের পতাকা উড়ালাম। জেরুজালেমের আকাশে মানবতা তখনও কোনও নক্ষত্র হয়ে আবির্ভূত হয়নি, সেই তারকা লক্ষ্য করে পূর্বদেশীয় কোনও দ্রষ্টা পথে বের হননি, রোমের ইতিহাসেও তখন জাস্টিনিয়ান,

লিও, কনস্টেনটাইন, হ্যাডিয়ান প্রভৃতি উদারনৈতিক শাসকদের পদধ্বনি শোনা যায়নি, রোম তখনও তথাকথিত রিপাবলিকান সেনেটারদের হাতে, সেই অধ্যায়ের শেষ শতক চলছে। আমরা তাকে সম্পূর্ণ করতে চাইলাম। পিঞ্জর ভেঙে আমরা যখন ক্ষিপ্তের মতো হাতিয়ার খুঁজছি স্পার্টাকাস তখন ছুটে গিয়ে ঢুকল প্রভুদের বিশাল রসুইখানায়। সেখানে নানা মাপের রাশি রাশি ছুরি পড়ে আছে। আমরা তাই হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমাদের বন্দিশালার ওয়ার্ডার বা পরিচালকদের উপর। তাদের ঘায়েল করে নগর প্রাচীর ভেদ করে আমরা, মুক্ত মানুষের সেই দলটি, বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমাদের এই সত্তরজনের দলে অধিকাংশই থ্র্যাসিয়ান অথবা গল গ্ল্যাডিয়েটার। জাতি-পরিচয় নির্বিশেষে আমাদের সকলের অধিনায়ক একজন, প্রিয় স্পার্টাকাস।

সে জানত সরকারি কর্তারা এ বার আমাদের ধরবার চেষ্টা করবে। তা-ই হল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সেই দরবারি-যোদ্ধার দল পারবে কেন? আমাদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে শহরের দিকে ছুটল। স্পার্টাকাসের মুখে হাসি। হাসি অন্যদের মুখে। আমরা রোমানদের ফেলে দেওয়া অস্ত্রগুলো তুলে নিলাম। অতঃপর আর ছোরা-কাটারি নয়, সত্যকারের হাতিয়ার। যদি মরতেই হয়, তবে লড়াই করে মরতে পারব অন্তত। স্পার্টাকাস বলল—আপাতত চলো আমরা আশ্রয় নিই ভিসুভিয়াসের ভেতরে। প্রথমে সেখানেই রোমান বাহিনীর মোকাবিলা করতে চাই আমি। আমরা স্তম্ভিত তার সিদ্ধান্ত শুনে। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। একজন ক্রীতদাস বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের গর্বিত রোমান বাহিনীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান জানাচ্ছে, নিজেদের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা। রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে উঁচিয়ে ধরে দাস স্পার্টাকাস হাঁক দিল—চলো। কোটি ক্রীতদাসের আর্তনাদ তার কণ্ঠে মানুষের জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু, এই আমাদের পণ। আমরা জয়ধ্বনি দিলাম এই নবীন বীরের নামে। ভিসুভিয়াস তখন মৃত। অন্তত সকলেরই তা-ই ধারণা। আমরা তার জ্বালামুখে প্রবেশ করে সেখানে আশ্রয় নিলাম। সেখানে তখন অনেক গাছপালা। ফলে আত্মগোপনের পক্ষে সুন্দর জায়গা। পথে মোটামুটি ভালই রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছি আমরা। এ বার শত্রুর জন্য অপেক্ষা। এই গহ্বরে প্রবেশ করার পথ ছিল একটাই। সেটি যেমন সংকীর্ণ তেমনই বিপদসংকুল। যথাসময়ে ক্লাডিয়াস গ্ল্যাবার নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে রোমান বাহিনী এসে হাজির হল আগ্নেয়গিরির সামনে। তাদের পাঠিয়েছেন স্থানীয় শাসক পাবলিয়াস ভ্যারিনিয়াস। তাঁর ধারণা ছিল অনায়াসে, বা অল্পায়াসে রোমান সৈন্যরা এই ছোটখাটো বিদ্রোহ দমন করবে। এক ফুঁয়ে নিবে যাবে কপুয়ার আগুন। সেনাপতি গ্ল্যাবার পর্বত শিখরের সেই সংকীর্ণ পথটিতে সৈন্য সাজালেন। দেখা যাক, অবরুদ্ধ গ্ল্যাডিয়েটাররা আত্মসমর্পণ না করে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। তিনি তখনও জানেন না, আমাদের নায়ক স্পার্টাকাস কী ধাতুতে গড়া। তার নির্দেশে গাছের ডাল কেটে কেটে ভেতরে বসে রোমানদের অজান্তে আমরা তৈরি করলাম কয়েকটি লম্বা

লম্বা মই। তারপর রাতের অন্ধকারে রোমান সৈন্যরা যেখানে শিবির গড়েছে তার বিপরীত দিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল সেই সব মই। সেই মই বেয়ে একে একে গ্ল্যাডিয়েটাররা চুপি চুপি নেমে এল মাটিতে। একজন শুধু রয়ে গেল ভেতরে। সে অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগল নীচে। সবাই নিরাপদে নেমে হাতে অস্ত্র নিয়ে গুটি গুটি আমরা রোমান বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম তাদের পেছনে, বেশ দূরে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের উপর। ওরা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই আচমকা আক্রমণের জন্য। বিস্তর রোমান সেনা মারা গেল। সেনাপতি গ্ল্যাবার প্রাণ নিয়ে পালালেন।

রোমান পতাকা তখন আমাদের হাতে। আমরা ওদের শিবির লুঠ করে রসদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র সব দখল করে নিলাম। এ বার আমাদের সঙ্গে যোগ দিল ওই অঞ্চলের বলবান মেষপালকরা, ভবঘুরেরা, গরিব খেতমজুররা এবং আরও অনেকেই। তাদের নিয়ে রীতিমতো এক পদাতিক বাহিনী গড়ে তুলেছে স্পার্টাকাস। তা ছাড়া, অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আরও এক বাহিনী, পেছনে প্রয়োজনে মূল বাহিনীকে রক্ষা করা, কিংবা পেছনে ধাওয়া করে আসে যদি কোনও শত্রু বাহিনী তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আরও একটি বাহিনী । এক কথায় আমরা যেন কোনও এক দেশের নিয়মিত ফৌজ। আমাদের স্বপ্নলব্ধ সে-দেশের নাম—স্বাধীনতা। ভিসুভিয়াসের আগ্নেয় লাভাস্রোতের মতো এ বার আমরা নেমে এলাম সমতলে। আমাদের প্রতিহত করে এমন সাধ্য কারও নেই। মুক্তির আনন্দে আমরা দুর্বার, প্রতিহিংসায় প্রত্যেকে যেন এক-একজন আগ্নেয় ভিসুভিয়াস।

সেই লাভাস্রোতের সামনে একের পর এক রোমান শহর যেন তাসের ঘর। দাসরা প্রাচীরের দুয়ার খুলে দিচ্ছে, হাজার হাজার দাসের জয়ধ্বনিতে আমাদের অভিষেক হচ্ছে। কপুয়ার পর, থুর্‌রি, তারপর নোলা। তারপর আরও। কিন্তু পথে বিপত্তি। বিপত্তির কারণ আমাদের এক সহযোদ্ধা গ্ল্যাডিয়েটার। তার নাম ক্রিক্সাস। সে আর ওয়েনোমাউস ছিল স্পার্টাকাসের ডানহাত আর বাঁ হাতের মতো। ওরা দু'জনই ছিল গল-দেশীয়। স্পার্টাকাসের বুদ্ধি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ, যুক্তি ধারালো, এবং সে ছিল দূরদর্শী। সে জানত প্রবল বিক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের সৈন্যদলের কাছে আমাদের হার মানতেই হবে। তা এড়াতে হলে এ ভাবে খুন খারাপি আর লুঠতরাজে না মেতে নিজেদের সংহত করে উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে আল্পস অতিক্রম করতে হবে। তারপর স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রত্যেককে বলা হবে— সামনে বিপুল ধরণী। তোমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যাও। অথবা যেখানে খুশি অন্যতর জীবনে।

কিন্তু তা হওয়ার নয়। ক্রিক্সাস চায় আরও আগুন নিয়ে খেলতে। প্রভুদের আরও নিগ্রহ করতে। গতকাল অবধিও যারা ছিল ক্রীতদাস তারা তখন অভিজাত রোমানদের ভঙ্গিতে অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে আছে। তাদের সামনে সেদিনের প্রভুরা আজ গ্ল্যাডিয়েটারের মতো লড়ছেন। গ্ল্যাডিয়েটারের আঙুল রাজকীয় মুদ্রায় উঠানামা করছে। তাদের নির্দেশে কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ মার্জনা লাভ করছে। মানুষের ঈশ্বর

নতুন করে তার অস্তিত্বকে অনুভব করছেন, সভ্যতা স্তব্ধ হয়ে ন্যায়ের যথার্থ সংজ্ঞা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। স্পার্টাকাস এই সব দৃশ্যের পুনরাভিনয় দেখে ক্লান্ত। সে বলল—চলো উত্তরে, সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে স্বাধীনতা। কিন্তু ক্রিক্সাসের তাতে মত নেই। সে বেশ কিছু গল এবং জার্মান লড়িয়েদের নিয়ে আমাদের ছেড়ে গেল। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল, রক্তাক্ত তলোয়ার। তারা মূর্তিমান মৃত্যুদূত। লুঠতরাজ, আগুন, খুন, বলাৎকার—তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যেন।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে আমরা তবু একের পর এক লড়াইতে বিজয়ী। এক সময় আমরা লড়তে লড়তে হার্কুলানেয়ামের দুয়ারে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম। স্পার্টাকাস কিন্তু তক্ষুনি উত্তরের পথ ধরল না। শীতকালটা সে থুরিতে কাটাবে বলে স্থির করল। জায়গাটা লুকানিয়ার অন্তর্গত। ইতিমধ্যে ভবঘুরে, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষজন, পলাতক দাসরা দলে দলে এসে যোগ দিয়েছে আমাদের বাহিনীতে। যোগ দিয়েছে আমাদের বাহিনী শেকল কেটে যাদের মুক্তি দিয়েছে সেই ভূমিদাসের দল।

স্পার্টাকাস এ বার একটি বেশ বড়সর এবং মজবুত অশ্বারোহী বাহিনীও গড়ে ফেলেছে। কপুয়া থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম সত্তর জন। তিন মাস পরে আমাদের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার। দু'বছর পরে সেই সংখ্যা লাফে লাফে পৌঁছায় প্রায় তিন লক্ষে! ভাবা যায়? আমরা ভাবতে পারিনি এক ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত এবং ক্ষুব্ধ নাগরিক রয়েছে রোমান সাম্রাজ্যে, এত বান্দা এবং ভূমিদাস! প্রত্যেকেই তারা শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে চায়। প্রত্যেকেই চায় প্রতিশোধ নিতে। স্পার্টাকাস একবার ভেবেছিল সরাসরি রোম আক্রমণ করবে। রোমান সাম্রাজের রাজধানী রোম। সেখানেও নিশ্চয় বিদ্রোহীরা অপেক্ষা করে রয়েছে আমাদের জন্য। কে জানে, ভিসুভিয়াসের মতো রোমও হয়তো এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। রোমের দিকে না এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। সরাসরি উত্তরের পথও ধরল না স্পার্টাকাস। আল্পস অতিক্রমের চেষ্টা না করে সমতলেই আপাতত শত্রুর শক্তি যাচাই করা যাক।

আমাদের দমন করার জন্য একের পর এক স্থানীয় শাসকদের ফৌজ আসছে আর পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। সেনানায়কদের পতাকা এবং রোমান শক্তির প্রতীক "ঈগল" কেড়ে নিচ্ছি আমরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই রোমের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে আর নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হল না। তাঁরা নড়েচড়ে বসলেন। লুসিয়াস গেলিয়াস এবং লেনটুলাস ক্লডিয়ানাস নামে দু'জন সেনাপতিকে চার লিজিয়ন সৈন্যসহ তাঁরা রণক্ষেত্রে পাঠালেন বিদ্রোহীদের নির্মূল করার জন্য। তার মানে আমাদের লড়তে হবে এবার খাস সরকারি বাহিনীর সঙ্গে। রোমান সেনাপতিরা গারগানাস পর্বতের কাছে সামনে পেলেন ক্রিক্সাসের দলছুট বাহিনীকে। সেই বিরাট বাহিনী অতি সহজেই ছিন্নভিন্ন করে দিল গ্ল্যাডিয়েটারদের এই দলটিকে। ক্রিক্সাস নিজেও প্রাণ দিল রণক্ষেত্রে। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না স্পার্টাকাস। অপেক্ষাকৃত উঁচু পিসনামের মালভূমিতে

দাঁড়িয়ে একে একে সে দুই রোমান সেনাপতিকেই হারিয়ে দিল। ওঁদের মিলিত ফৌজও তার সামনে নতজানু। তিনশো রাজকীয় সৈন্য জীবিত অবস্থায় বন্দি হল আমাদের হাতে। স্পার্টাকাসের এ বার অন্য চেহারা। বন্দিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ব্যঙ্গ করে সে বলল, তোমাদের রোমান কেতা মেনে আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে মরেছি। এ বার তোমরা সেই রীতি মেনে নিজেদের মধ্যে লড়াই করো, দেখো গ্ল্যাডিয়েটারের মৃত্যুর কী মহিমা!

ওরা গ্ল্যাডিয়েটার হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। আমরা দর্শক হয়ে তাদের মরণ-পণ খেলা দেখছি। স্পার্টাকাস বলল, এ খেলায় আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তবু যে এই নিষ্ঠুরতার আয়োজন, তার কারণ ক্রিক্সাসের আত্মাকে আমি তৃপ্ত করতে চাই। হোক না সে দলছুট, কিন্তু সে যে আমাদেরই একজন সহযোদ্ধা ছিল তা ভুলব কেমন করে?

তারপর ফের লড়াইয়ের ময়দানে। এ বার আমাদের সামনে উত্তর ইতালির এক প্রাদেশিক কর্তার বাহিনী। আমাদের সামনে ঝড়ের মুখে তৃণের মতো সে-বাহিনীও ছত্রখান হয়ে গেল। আবার আমরা বিজয়ী। এ বার কি তবে আমরা আল্পস অতিক্রম করার জন্য তৈরি হব? তা আর হল না। আমাদের লড়িয়েরা পর পর বিজয়ের স্বাদ পেয়েছে। তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা। স্পার্টাকাস বলল, আমরা যা-ই করি না কেন, আগে দরকার শৃঙ্খলা। বিশাল বাহিনী আমাদের, তাকে সুশৃঙ্খল রাখা সহজ কাজ নয়। স্পার্টাকাসের মতো স্থির বুদ্ধি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়ক ছিল বলেই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সে।

দুই সেনাপতির পরিণতি শুনে রাজধানীতে রাগে কাঁপতে লাগলেন প্রভুরা, —কী! এত বড় স্পর্ধা? তার উপর আর একটি প্রাদেশিক বাহিনীর পরাজয়।—অসহ্য! রাজধানীর কর্তারা স্থির করলেন, এ বার পাঠানো যাক ক্রাসাসকে। লোকটি ধূর্ত। অর্থশালী। তা ছাড়া এক সময় সুলার আমলে সৈনিক হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন ক্রাসাস। স্পার্টাকাসের বাহিনীর শক্তি পরখ করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন—লড়াই "এলাম, দেখলাম, জয় করলাম", সেই বীরগাথা হবে না। তাকে লড়াই করতে হবে এক পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে। প্রথম প্রথম তাঁর বাহিনীও হার মানতে লাগল আমাদের কাছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি আমাদের বাহিনীকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলেন সেই বুট জুতোর মুখে, দক্ষিণে যেখানে ইতালির শেষ সীমানা। এ বার আমাদের সামনে সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই। পেছনে ক্রাসাসের বিশাল বাহিনী। স্পার্টাকাস সমস্যায়। সে দূত পাঠাল সমুদ্রে জলদস্যুদের কাছে, তোমরা সাহায্য করলে আমরা এই খাড়ি পেরিয়ে সিসিলিতে পৌঁছাতে পারি। স্পার্টাকাসের আশা ছিল ওরা সহযোগিতার হাত বাড়াবে। কারণ, তারাও রোমান শাসকদের মিত্র নয়, বরং ঘোরতর শত্রু। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সে-সাহায্য পাওয়া গেল না। উপায়ান্তরহীন স্পার্টাকাস তখন দুঃসাহসীর মতো একটা কাজ করে

বসল। এমন একটা সিদ্ধান্ত নিল যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদের পক্ষে অকল্পনীয়। সে সমুদ্রে ঝাঁপ না দিয়ে পেছনে ফিরে ক্রাসাসের প্রতিরোধের ব্যূহ ভেদ করে সমতলে ফিরে গেল। ক্রাসাসের প্রস্তুতি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি ভাবতে পারেননি, এমনটি ঘটতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে বিমূঢ় ক্রাসাস আবার স্পার্টাকাসের পিছু ধাওয়া করলেন।

ও দিকে রোমে যখন এই বিপর্যয়ের সংবাদ পৌঁছাল তখন কর্তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভেবে পান না, সামান্য এক গ্ল্যাডিয়েটার এতদিন ধরে কেমন করে রোমান-শক্তিকে চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। তাঁরা ক্রাসাসকে সাহায্য করার নামে দরবারে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পাইকে পাঠালেন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য। এ খবরে ক্রাসাসের তৎপরতা বেড়ে গেল। পম্পাই পৌঁছাবার আগেই তাঁর কাজ সেরে ফেলা চাই, নয়তো মুখ দেখানো দায় হবে। ভাগ্যক্রমে একটা সুযোগও এসে গেল তাঁর সামনে। আমাদের দলে ফের ভাঙন। দু'জন গল গ্ল্যাডিয়েটার বেশ কিছু অনুচর সহ দল ছেড়ে দিলেন। স্বভাবতই আমাদের বাহিনী তখন শারীরিক এবং মানসিক দু'দিক থেকেই দুর্বল। রোমানরা কিন্তু প্রথমে সামনে পেল দলছুট বাহিনীকেই। তাদের ছত্রখান করা আর এমন কী কথা!

কিন্তু আশ্চর্য, স্পার্টাকাস ছুটল ওদের সাহায্য করতে। হাজার হোক, ওরাও গ্ল্যাডিয়েটার। এবং এতদিন ধরে ছিল আমাদের সঙ্গে। লুসানিয়ায় সিলারাস নদীর উৎস যেখানে, সেখানে তুমুল লড়াই হল রোমান বাহিনী আর গ্ল্যাডিয়েটার বাহিনীর। যুদ্ধে আমাদের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। ক্রাসাস আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন পরাজিত কনলাসদের প্রতীক "ঈগল", এবং বেশ কিছু রোমান পতাকা। কিন্তু স্পার্টাকাস অপরাজিত। উত্তর থেকে তার বাহিনী নিয়ে সে আবার দক্ষিণমুখী। সেই অভিযাত্রার মুখে পড়ে আবার পর্যুদস্ত হয় এক রোমান বাহিনী। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি আমরা। ক্রাসাসের বিশাল বাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আমাদের। সেই বেষ্টনী ছেড়ে যারা বেরিয়ে পড়েছিল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সৈন্যরা পম্পাইয়ের বাহিনীর মুখে পড়ে। ফলে সব শেষ।

কিন্তু তা-ই কি? তা হলে প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আজও কি বেঁচে থাকত আমাদের নেতা স্পার্টাকাস? শুধু কোনও মতে নামটি ইতিহাসের পাতায় লিখিয়ে নেওয়া নয়, স্পার্টাকাস ইতিহাসের এক বিস্ময়-পুরুষ। সে আজ এক উপকথার নায়ক যেন। তাকে নিয়ে দু'হাজার বছর ধরে কত না লেখালেখি। উপন্যাস। চলচ্চিত্রের পর চলচ্চিত্র। অন্যদিকে নিরন্তর চলেছে আলোচনা আর গবেষণা। সামান্য এক গ্ল্যাডিয়েটার—কেমন করে সে পরিণত হল লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের অধিরাজে। নানা শ্রেণীর, নানা জাতের গরিব এবং সর্বহারাকে কেমন করে ঐক্য সূত্রে বেঁধেছিল এই জাদুকর। তাদের নিয়ে কেমন করে গড়ে তুলেছিল সুশৃঙ্খল রণপটু বাহিনী? সেনানায়ক হিসাবেও বিস্ময়কর আমাদের স্পার্টাকাস। শত্রুকে কখন কোথায় কীভাবে আঘাত হানতে হবে, কোন দিক থেকে এরপর আসতে পারে নতুন করে আঘাত,

ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে সে স্থির করত বাহিনীর রণকৌশল। এতগুলো মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, অন্যান্য রসদ জোগানো, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, অস্ত্র সরবরাহ,—সবই করেছে সে আশ্চর্য দক্ষতায়, পরম শৃঙ্খলায়। অন্ততপক্ষে নয় বার রোমান বাহিনী হার মেনেছে এই দুর্দ্ধর্ষ সেনানায়কের কাছে। স্পার্টাকাসের সাহসের তুলনা নেই। সে যে-কোনও বাহিনীর আদর্শ নায়ক। শত্রু হয়েও আপৎকালে নিশ্চয় শত্রুপক্ষ মনে মনে অভিবাদন জানিয়েছে তাকে। সে শৌর্যের প্রতীক। সে মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রতিমূর্তি। স্পার্টাকাস মূর্তিমান স্বাধীনতা। যুগ-যুগান্তের বিশ্বময় স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের কাছে পুণ্যশ্লোকে তার নাম। একজন দাস রোমান সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে জানিয়ে গেছে হৃতসর্বস্ব দুর্বলও যখন ঐক্যবদ্ধ, তখন তারা হারকিউলিসের চেয়েও শক্তিমান, তাদের পদভারে মেদিনী কাঁপে, আল্পস পর্যন্ত টলটলায়মান। তারপরও কেমন করে বলি আমাদের নায়ক, আমাদের হৃদয়ের রাজা স্পার্টাকাস মৃত।

শেষ যুদ্ধের পর যা ঘটেছিল তা আর হয়তো শোনার মতো নয়। সব যুদ্ধে পরাজিতের জন্য যে পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে, আমাদের জন্যও তেমনই অপেক্ষা করে ছিল—মৃত্যু। বিজয়ী রোমানরা স্বীকার করেছিল রণক্ষেত্রে আমরা ষাট হাজার দাস লড়াই করেছিলাম ষাট লক্ষ সিংহের মতো। কারণ, আমরা প্রত্যেকে ছিলাম একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা। কোনও প্রভুকে আনন্দ দানের জন্য তাঁর খেয়ালখুশি তৃপ্ত করার জন্য আমরা লড়াই করেনি, লড়াই করেছি নিজেদের স্বাধীনতার জন্য, স্বাধীনতা আর মৃত্যুর মধ্যে আমরা সেদিন মৃত্যুকে বেছে নেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলাম। স্পার্টাকাসের কথা মনে রেখে আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে মারছি এবং মরছি। কোনও খেদ নেই কারও মনে। শেষ পর্যন্ত আমরা বেঁচে ছিলাম মাত্র ছয় হাজার। ছয় হাজার এবং আরও একজন। একজন না বলে, দু'জন বলাই ঠিক। কারণ, মেয়েটির কোলে ছিল একটি শিশু। এই মেয়েটি কপুয়া থেকেই আমাদের সঙ্গী। স্পার্টাকাসের হাত ধরে সে-দিনই ঘর ছেড়েছিল এই অভিজাত রোমান-কন্যা। তারপর থেকে সব রণাঙ্গনেই সে স্পার্টাকাসের সঙ্গী। তার কোলে স্পার্টাকাসেরই সন্তান। আমাদের সকলের কাছে সে ছিল প্রিয়, শ্রদ্ধেয়।

আমাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে সবাইকে আনা হল বিজয়ী রোমান সেনাপতি ক্রাসাসের সামনে। সবাইকে বলা হল সার বেঁধে বসতে। ক্রাসাসের গলায় বজ্র নির্ঘোষ। বললেন, তোমাদের মধ্যে কে স্পার্টাকাস?—সাড়া দাও। আমরা সবাই একসঙ্গে সাড়া দিলাম, বললাম—আমি! প্রত্যেকেই যেন আমরা স্পার্টাকাস। ক্রুদ্ধ রোমান আবার হুংকার দিলেন,—তোমাদের মধ্যে যার নাম স্পার্টাকাস সে উঠে দাঁড়াও। আমরা সবাই তড়াক করে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। এমনকী শিশুকোলে সেই মেয়েটিও। ঘটনা দেখে স্পার্টাকাস নিজেও স্তম্ভিত। তার সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে এতখানি আসা করেনি সে। হঠাৎ কী হল, স্পার্টাকাস একবার পেছনে ফিরে তাকাল মেয়েটির দিকে। তার চোখে মমতা! স্পার্টাকাস দুর্বৃত্ত ছিল না। কোনও

নিরপরাধকে কোনও দিন হত্যা করতে দেয়নি। সে লুঠেরা ছিল না। লুঠপাটে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে ছিল আদ্যপান্ত একজন ধর্মযোদ্ধা। একজন প্রেমিক ও স্নেহশীল পিতাও বটে। ওদের কথা ভেবেই বুঝি-বা তার মন কিছুটা নরম। ক্রাসাস সে-চোখের ভাষা পড়ে নিলেন। লহমায় তিনি চিনে নিয়েছেন এই দলে স্পার্টাকাস কে? শত্রু হাজির, সুতরাং আর দেরি নয়। তিনি আমাদের পাইকারি ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। স্পার্টাকাসও বাদ পড়ল না। সেই মেয়েটিকে তখনকার মতো তিনি সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করলেন। ওরা জোর করে তাকে তুলে নিয়ে গেল আমাদের মধ্য থেকে। তার কী পরিণতি হয়েছিল আমরা তা জানি না। জানি না, স্পার্টাকাসের কোনও সন্তান কি জীবিত এই পৃথিবীতে? নিশ্চয়ই। তা না হলে যুগযুগান্ত ধরে পৃথিবীতে দেশে দেশে কেমন করে সম্ভব লক্ষ লক্ষ স্পার্টাকাসদের উত্থান।

রোম থেকে কপুয়ার দিকে যে পথটি গেছে, যাকে ওরা বলে অ্যাপ্পিয়ান সড়ক, তার দু'পাশে খাটানো হল সারি সারি ক্রুশ। তারপর আমরা ছয় হাজার বিদ্রোহীকে সেখানে বিদ্ধ করা হল জীবন্ত। তবু কোনও ক্রুশ থেকে কারও কোনও কাতরোক্তি শোনা যায়নি। আমরা মৃত্যুতেই সুখী হয়েছিলাম। কারণ, স্পার্টাকাস আমাদের নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল—জীবনের আর এক নাম—স্বাধীনতা।

আমরাও। স্পার্টাকাস একা নয়, আমরাও বিদ্রোহী। বিদ্রোহী দাস। স্পার্টাকাসের অনেক, অনেক আগে আমরা গ্রিসের ক্রীতদাসেরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম। সে খ্রিস্টপূর্ব ১০৫৫ অব্দের কথা।

আমরাও, আমরা পিলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের কালের (খ্রিঃ পূঃ ৪১৩ অব্দ) এথেন্সের দাস-কুল। আমরাও বিদ্রোহী হয়েছিলাম। কুড়ি হাজার এক সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলাম।

আমরাও আমরা খ্রিস্টপূর্ব ১৩৩ অব্দের স্পার্টার দাস।

আমরা খ্রিস্টপূর্ব ১৯৪ অব্দে রোমান শহর ল্যাটিয়াম দখল করেছিলাম।

আমরা খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬ অব্দে ইত্রুরিয়া দখল করেছিলাম।

আমরা খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে অ্যাপুলিয়া দখল করেছিলাম।

আমি ড্রিমাকস। সামান্য ফকির হয়েও আমি কিওস দ্বীপের দাসদের ঘুম ভাঙিয়েছিলাম। ওরা বিদ্রোহী হয়েছিল। আমি ওদের 'রাজা' নির্বাচিত হয়েছিলাম। রোমানরা আমার মাথার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আমি নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে দিয়ে রোমকে স্বাধীনতার মূল্য বোঝাতে চেয়েছিলাম।

আমি ইউনাস, সিসিলির দাস। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৩ অব্দে আমিই ছিলাম ইতালির প্রথম স্পার্টাকাস। দুই লক্ষ দাস নিয়ে আমি দাসদের স্বাধীন সেনাদল গড়েছিলাম। রোম বার বার ঘাড় হেঁট করে আমার দুয়ার থেকে ফিরে গেছে। ছ'বছর আমরাই ছিলাম সিসিলির সম্রাট।

ইউনাস, স্পার্টাকাস...তোমরা লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী ক্রীতদাস রক্তের বিনিময়ে অন্ধকার পৃথিবীতে আলো এনেছিলে।

আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। গ্রানভিল সার্প, উইলবারফোর্স, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ফক্স...আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কি সে-স্বাধীনতার অংশীদার মাত্র? তার অর্জনের ইতিহাসে আমাদের কি কান্না ছাড়া আর কোনও অবদান নেই? অবশ্যই নয়। স্পার্টাকাস, ইউনাস,—আমরা তোমাদের নাম শুনিনি, সত্য বটে স্বাধীনতার ভোরেও ফ্রিডম আমাদের অনেকের কাছে এক অপরিচিত শব্দ, আমরা কেউ জানি সে বোধহয় কোনও নতুন খামারের নাম কিংবা নতুন কোনও মালিকের; তবুও আমরা মানুষের সন্তান, আমাদের আরণ্যক অনুভূতিতেও আমরা যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারতাম, জীবনকে আমরাও ভালবাসতাম।

স্পার্টাকাস, আমাদের কাছেও বিদ্রোহ তাই অপরিচিত অগ্নি নয়। এ আগুনে আমরাও কখনও কখনও জাহাজ পুড়িয়েছি, কখনও কখনও নতুন উপনিবেশগুলোর বুকে মৃত্যুভয় জাগ্রত করেছি, কখনও-বা কেবলই মরে মরে জীবনের প্রতি নিজেদের ভালবাসাকে আবার প্রমাণ করেছি। আমেরিকার ইতিহাসে আমরা কেবলই কান্নার কাহিনী নই। সুদূর ১৭৯১ সনে বছরের পর বছর লড়াই করে ক্যারিবিয়ানের বুকে হাইতিতে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। ১৮৩১ সনে আমাদের নায়ক নাট টার্নার ভার্জিনিয়ায় তামাকের খেতগুলো শ্বেতাঙ্গের কবরে পরিণত করেছিল। ইতিহাস জানে, গৃহযুদ্ধের আগে আমরা খাস মার্কিন মুলুকেই কম পক্ষে দু'শো পঞ্চাশবার বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলাম! স্পার্টাকাস, তোমরা যদি খ্রিস্টকে আলোকে পরিণত করে থাকো, তবে সম্ভবত আমরাই উইলবারফোর্সদের বাঙ্ময় করেছিলাম, আমরাই বোস্টনের তরুণ মুদ্রাকর লয়েড গ্যারিসনের হাতে অগ্নিক্ষরা কলমটি তুলে দিয়েছিলাম। আমাদের মুক্তি সম্ভবত সেদিক থেকে আমাদেরই কীর্তি।

আমরা মুক্তি চেয়েছিলাম। আমরা কেঁদে কেঁদে ওঁদের ঘুম ভাঙিয়েছিলাম, আগুন জ্বেলে জ্বেলে ওঁদের হৃদয়কে আলোকিত করেছিলাম। ওঁরা বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভাষাহীন মানুষের হৃদয়ের কথাকে নিজেদের গলায় তুলে নিয়েছিলেন; আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখো, আজ আর আমাদের কারও হাতে পায়ে শেকল নেই, কপালে বান্দাছাপ নেই, পিঠের উপর উদ্যত চাবুক নেই। কিন্তু তবুও সত্যিই আমরা মুক্ত কি? মুক্তির আনন্দে ভার্জিনিয়ার বুড়ি ক্রীতদাসী তামাক খেতে গড়াগড়ি দিয়েছিল। অন্য দাসরা হেসে বলেছিল—দেখ, দেখ, ন্যান্সি সত্যিই মুক্ত, আজ পিঁপড়েগুলো পর্যন্ত ওকে কামড়াচ্ছে না!

স্বাধীনতা সেদিন আমাদের কাছে তা-ই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, শেকল থেকে মুক্তি; দিনরাত যে বিষ পিঁপড়েগুলো মাঠে মাঠে পথে পথে, শোবার ঘরে, খাবারের সময় চাবুক হয়ে কামড়ে ফিরছে, তার থেকে মুক্তিই সেদিন আমাদের কাছে স্বাধীনতা। কিন্তু আজ বুঝতে পারি বন্ধনের সেটাই শেষ কথা নয়। মধ্যযুগে অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে শেকলহীন দাসরা, আমরা, মুক্ত মানুষের পোশাকে মাঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম।

পরে জেনেছিলাম, আমরা স্বাধীন মানুষ নই, 'সার্ফ',—ভূমিদাস। আজ আনুষ্ঠানিক মুক্তির শতবর্ষ পরে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় এখনও তাই, আমরা সার্ফ নই, প্রখ্যাত দাস-তরী 'অ্যামিস্টাড'-এর ডেকে দণ্ডায়মান মুক্তি অভিলাষী মানুষ মাত্র। ১৮৩৯ সনের আগস্টে 'অ্যামিস্টাড'-এর দাস আমরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম—ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে আমরা শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের আদেশ দিয়েছিলাম জাহাজ পুবে ঘোরাতে। আমরা আফ্রিকায় ফিরে যেতে চাই,—আমাদের মাতৃভূমিতে। সে-আদেশ অমান্য করার সাহস ওদের ছিল না। রুইজ সুবোধ বালকের মতো হালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—'অ্যামিস্টাড' আবার চলতে শুরু করেছিল। দিন যায়, রাত যায় অ্যামিস্টাড চলেছে। আফ্রিকার উপকূলের কোনও চিহ্ন নেই! কিন্তু কোথায় আফ্রিকা? অবশেষে সরকারি প্রহরীরা যখন আমাদের আবিষ্কার করল, আমরা তখনও দরিয়ায়, ওরা জানাল—অদূরেই আমেরিকা! সবিস্ময়ে আমরা রুইজ-এর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। রুইজ উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ, তাই। দিনে আমি পুব দিকে জাহাজ চালাতাম,—রাতে পশ্চিম দিকে!

হ্যাঁ, আমরাও প্রতারিত হয়েছিলাম।

আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম বটে। তবে বলতে দ্বিধা নেই, এই স্বাধীনতায় ফাঁকিও ছিল। বিশেষ করে সেই স্বাধীনতার পরে আমরা ভারতীয়রা ছিলাম প্রতারিত। প্রভুরা আমাদের সঙ্গে নির্লজ্জের মতো ছলনা করেছিল। আমাদের জীবনে শুরু হয়েছিল দাসত্বের দ্বিতীয় যুগ। সেই কালা যুগ শুরু হয়েছিল ১৮৩৭ সালে। আর তার অবসান প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে ১৯১৭ সালে। আরও গুনে বললে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। অবশ্য রেশ চলে আরও কিছুদিন ১৯২০/১৯৩০ সাল পর্যন্ত। তার এই গোলামির মেয়াদ ছিল প্রায় সত্তর আশি বছর। আমরা, গরিব ভারতীয়রা ফের বান্দা। আমাদের সমগ্র দেশই পরদেশি ইংরেজের হাতে বন্দি তখন। ভারতের মানুষ তখন স্বাধীনতাহীন। আমরা আরও দুঃখী এ কারণে যে, স্বদেশের মাটিতে বাস করার স্বাধীনতাটুকু ওঁরা কেড়ে নিয়েছিলেন সেদিন। অথচ ইংরেজের গর্ব পৃথিবী থেকে ক্রীতদাস প্রথা সম্পূর্ণ উৎখাত করার ব্যাপারে তারাই ছিল নাকি অগ্রণী।

কাগজে কলমে হয়তো কথাটা মিথ্যা নয়। ১৮০৭ সালের মে মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল কোনও ব্রিটিশ জাহাজ দাস বোঝাই করে কোনও বন্দর ছাড়তে পারবে না। পরের বছর (১৮০৮) মে মাসে নতুন ফতোয়া, কোনও ব্রিটিশ উপনিবেশে কোনও দাসের অবতরণ চলবে না, তা জাহাজ যে-দেশের পতাকা উড়িয়েই আসুক না। ১৮১১ সালে আইন আরও কঠোর হয়। বলা হয়, কেউ ইংরেজের অধীন কোনও দেশে বা উপনিবেশে দাস আমদানি করলে তার কঠিন শাস্তি হবে। প্রয়োজনে তাকে দ্বীপান্তরী করা হবে। কিন্তু ও দিকে উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকের প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। আফ্রিকা থেকে আমদানি বন্ধ। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোতে আফ্রিকার দাসের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। খাতায় বলা হচ্ছে—"অপচয়ের ফলে।" ওরা আসলে রোগে

শোকে অনেকে অকালে মারা যাচ্ছে। নারী সঙ্গীর অভাবে খামার মালিকদের বেশি সংখ্যায় দাস-শিশু উপহারও দিতে পারছে না। ফলে ইংরেজের অধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজেই ১৮০৮ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ দাসের সংখ্যা ৮ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়ায় ৬.৫ লক্ষ। জ্যামাইকার খামার মালিকরা ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন সরকারকে, তাঁদের বছরে অন্তত দশ হাজার করে শ্রমিক চাই। কিন্তু কোথায় দাস?

১৮৩৪ সাল থেকে বলতে গেলে গোটা দুনিয়াতেই দাস কেনা বেচা বন্ধ। তবু চোরা পথে হয়তো কিছু কিছু চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতের কথাই ধরা যাক। ১৮০০ সাল নাগাদ মরিশাসে ভারতীয় ক্রীতদাস ছিল ৬ হাজার এমনকী ১৮৪৮ সালেও রিইউনিয়ন দ্বীপে ১ হাজার ভারতীয় ক্রীতদাস। মালাবার উপকূল থেকে এদের সংগ্রহ করেছিলেন ডাচ-ব্যবসায়ীরা। ইংরেজরা নিজেরা চালান দিতেন দণ্ডিত অপরাধীদের। এক সময় দ্বীপান্তর মানে বেনকুলেনে চলে যাওয়া। সে-বিন্দুটি ডাচদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইংরেজরা দণ্ডিতদের চালান দিতে শুরু করেন পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে। যে-জাহাজে করে কয়েদিদের নিয়ে যাওয়া হত, ভারতীয়রা সেগুলিকে বলত—"জিতা জুনাজা", জীবিত গোরস্থান! সিঙ্গাপুরের শাসনভার ভারত সরকারের হাত থেকে লন্ডনে কলোনিয়াল অফিসের হাতে চলে যাওয়ার পর, আসামি পাঠানো শুরু হয় আন্দামানে। সেই সঙ্গে ১৮১৫ সাল থেকে মরিশাসে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিকে মরিশাসের পোর্ট লুইস ৮০০ ভারতীয় কয়েদি ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট তৈরি করছে তখন চার্লস ডারউইন বিখ্যাত "বিগল" জাহাজে তাঁর গবেষণাগার নিয়ে সেখানে পৌঁছান। তিনি লিখেছেন, আমার জানা ছিল না ভারতীয়রা দেখতে এমন সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত দর্শন!

হ্যাঁ, দেশান্তরী হয়েও আমরা দেশ গড়েছি। পোর্ট লুইসের অনেক ঘরবাড়ি, অনেক রাস্তাঘাটই আমাদের হাতে গড়া। কেউ যদি এখনও সিঙ্গাপুরে যান তবে তিনি দেখবেন, সেখানকার মনোরম স্থাপত্যকীর্তি সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ক্যাথিড্রাল আমাদের হাতে তৈরি। আমরাই গড়েছি সিঙ্গাপুরের গভর্নমেন্ট হাউস!

সেসব কথা থাক। মুষ্টিমেয় কিছু দণ্ডিত অপরাধী আর ডাচ চোরাকারবারিদের সৌজন্যে পাওয়া কিছু দাস দেশে দেশে খামার মালিকদের বর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা মেটাবে কেমন করে? তলহীন তাঁদের মুদ্রা-ক্ষুধা। তাঁরা স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছেন। আদিগন্ত বিস্তৃত আখের খেত সোনার খনির চেয়েও রত্নপ্রসূ। দেখতে দেখতে পাউন্ডের পাহাড় জমে উঠবে; যদি তা কুড়িয়ে ঘরে তোলার জন্য শ্রমিকের বলিষ্ঠ হাত পান।

শুধু কি ক্যারিবিয়ানের আখখেত? ব্রিটিশ গিয়ানা, ডাচ গিয়ানা, ফরাসি গিয়ানা, ত্রিনিদাদ, বারবাদোস, আরও কত না দ্বীপ ওই দরিয়ায় ভেসে আছে শ্রমিকের অপেক্ষায়। ও দিকে মরিশাস ও আশেপাশের দ্বীপগুলোও হাঁ করে বসে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, কেনিয়া—সর্বত্র শ্রমিক চাই। শ্রমিক চাই এ দিকে ঘরের কাছে সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে এবং দূর ফিজিতেও। ব্রিটেন এবং ইউরোপের গরিবরা আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে। তাদের চোখে আমেরিকার দৌলতের স্বপ্ন, যাকে

বলে "আমেরিকান ড্রিম।" সেই স্বপ্নের তাড়নায় তারা দালালদের পিছু পিছু সেখানে পৌঁছাচ্ছে। কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গকে চালান দেওয়া হয়েছিল ক্যারিবিয়ানেও। কিন্তু আখের খেতে কঠোর শ্রমিকের জীবনে তারা অভ্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং তারা খরচের খাতায়। খোলা খাতায় কারা এ বার নাম লেখাবে? এগিয়ে এসো তোমরা ভারতীয় গরিবরা! এসো, এসো! বিশ্বের অন্তত বারো-তেরোটি দেশ থেকে দু'হাত প্রসারিত করে বাগিচা মালিক আর রকমারি ইংরেজ উদ্যোগীদের উদার আমন্ত্রণ—এসো।

কে আসবে, কেন আসবে সেটা তাঁদের ভাবনা নয়, সে-ভাবনা ভারতের অধীশ্বর ইংরেজ-রাজের। বিশ্বব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি সর্বশক্তিমান ইংরেজ কি স্বদেশের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হবে না? ওঁদের স্থির বিশ্বাস স্বদেশি উদ্যোগপতিদের মদত দিতে, স্বদেশের দৌলত বাড়াতে ভারতের ইংরেজ শাসকরা ঠিক নড়েচড়ে বসবেন। একটা ফিকির তাঁরা বের করবেনই। বিশেষ ভারতের ভেতরও বেড়ে উঠছে শ্রমিকের চাহিদা। অসম এবং ডুয়ার্সে চায়ের বাগিচা সাজানো হচ্ছে। সেখানে প্ল্যান্টাররা ইংরেজ! সকলেরই এক দাবি শ্রমিকের বন্দোবস্ত করো রাজ সরকার। গোলাম কেনাবেচা বন্ধ। ঠিক আছে! আমাদের স্বাধীন শ্রমিকই দাও। কুছ পরোয়া নেই!

ভারতে ইংরেজ সরকার অনেক ভেবেচিন্তে একটা ফিকির বের করলেন, তাঁরা একটি মাত্র ইংরেজি শব্দে সর্বসমস্যার মীমাংসা করেছিলেন। শব্দটি "ইনডেনচার"। বাংলায় বললে—চুক্তিপত্র বা চুক্তিনামা। শ্রমিক এবং বাগিচা মালিক একটি চুক্তিপত্রে সই করবেন। নির্দিষ্ট কালের জন্য স্বাধীন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নির্ধারিত কাজ করবে, কড়ার-নামায় এই থাকবে শর্ত। নির্ধারিত কালসীমা পার হয়ে গেলে শ্রমিক আবার ফিরে আসতে পারবে নিজ নিজ ঘরে। চমৎকার বন্দোবস্ত। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙ্গল না। ক্রীতদাস প্রথা ফিরিয়া আনা হল না। অথচ মালিকদের দাবিও মেটানো গেল। এখন শুধু মানুষ সংগ্রহ করে চালান দেওয়া। সে-দায়িত্ব রাজসরকারের নয়। সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব আপন প্রজাবর্গের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করা। তাঁরা প্রহরীর কাজ করবেন। শ্রমিক সংগ্রহ করবেন কলোনির বাগিচা-মালিকদের তরফে তাঁদের অ্যাজেন্ট বা প্রতিনিধিরা। সরকার বন্দরে বন্দরে "প্রোটেকটার" বা রক্ষী নিয়োগ করবেন। তাঁরা শ্রমিকরা জাহাজে ওঠার আগে কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন, তাদের সম্মতি আছে কিনা যাচাই করবেন; ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও শ্রমিকদের হলফনামা দিতে হবে যে, তারা স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হতে যাচ্ছে।

তা ছাড়া, ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। জাহাজ পরিদর্শন, শ্রমিকদের পোশাক ইত্যাদি যাচাইয়ের ব্যবস্থাও রাখা হল। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য যে অ্যাজেন্টরা কাজ করবে, সরকার থেকে তাঁদের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করা হল। সে-অনুমতিপত্রে প্রোটেকটারের সই চাই, সই চাই ম্যাজিস্ট্রেটেরও। রকমারি নিয়ম কানুন। দেখলে মনে হবে ইংরেজ-রাজ কত না প্রজারঞ্জক! ভারতীয় প্রজার কল্যাণের জন্য সরকার বাহাদুরের চোখে ঘুম নেই।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে যায় সেই বজ্র আঁটুনি আসলে একটি মস্ত ফস্কা গেঁরো।

আসলে সেদিন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জীবনে অন্য নামে ফিরে এসেছিল দাসপ্রথা। শেকল এ বার ভেলভ্যাট মোড়া এই যা। রাজসরকার শ্রমিকদের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রভু যাঁরা তাঁরা দাস-প্রথায় অভ্যস্ত বাগিচা মালিকরা। স্বভাবতই প্রতিটি শব্দ ও বাক্য মেনে তাঁদের পক্ষে চলার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে পলায়নের কৌশল তারা অচিরে রপ্ত করে নিয়েছিলেন খাস ভারতেই। তারপর একবার শ্রমিকদের হাতে পাওয়ার পর তো তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারাই। স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসক, বিচারক, পুলিশ সব তাঁদের হাতে। কলকাতা বা নয়াদিল্লির হাত যত দীর্ঘই হোক, সেখানে পৌঁছাবার সাধ্য নেই। আর নির্দিষ্ট কাল পেরিয়ে যাওয়ার পর মুক্তি? চুক্তিতে সাধারণত লেখা থাকত পাঁচ বছর। অসম বা কাছাকাছি সিংহল বা ব্রহ্মদেশের শ্রমিকদের পক্ষে আরও কম, তিন বছর। বাগিচা মালিকদের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি,—দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কয়জন ফিরতে পারে। সব দেখেশুনে পর্যবেক্ষকরা অতএব স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন "ইনডেনচার" শ্রমিক, অন্য নামে দাস প্রথারই পুনরাবৃত্তি। কড়ার নামা একটা বাজে কাগজমাত্র। শ্রমিকের জীবনে তার কোনও মূল্য নেই। সে আসলে সেই পুরনো দাসদেরই নিকট আত্মীয়, তাদের জ্ঞাতিভাই।

—তা ছাড়া আর কী?

আমরা ভারতের গরিব মানুষ। স্বদেশ আমাদের কাছে সুখের স্বর্গ ছিল না। তবু ভারত ছিল আমাদের কাছে মায়ের কোলের মতো আশ্রয়। এ দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষই যাকে বলে 'ধরিত্রী-কা-লাল' মাটির সন্তান। আমাদের সর্বাঙ্গে স্বদেশের মাটি আর ধুলো। আমরা যারা ভদ্রাসনটুকু ছাড়া অন্য কোনও জমির মালিক নই, তারাও মাটির সঙ্গে নানা বন্ধনে বাঁধা। কেউ ভাগচাষি, কেউ ভূমিশ্রমিক। আমাদের মধ্যে কৃষিশ্রমিক যারা তারা মরশুমে কৃষিকাজ করে, অন্য সময় অন্য কোনও কাজ। খাটতে পারলে দুটি ভাতের সংস্থান করা এমনকী শক্ত কাজ? আমরা ধনীমানুষের নানা কাজে হাত লাগাই, রাজ-সরকারের নানা উদ্যোগেও ঠিকাদাররা আমাদের কাজে লাগায়। অনেক সময় ফসল কাটার মরশুমে আমরা হয়তো চলে গেলাম অন্য কোনও এলাকায়। তাতে কী আর আসে যায়? আমরা জানি, মরশুম শেষে আবার আমরা ফিরে আসব নিজেদের গাঁয়ে, বউ বাচ্চার কাছে। ট্যাঁকে থাকবে কিছু না কিছু নগদ পয়সা।

অস্বীকার করব না, তা সত্ত্বেও আমাদের অধিকাংশের জীবন ছিল দুঃখীর জীবন। গাঁয়ের মোড়ল কিংবা সম্পন্নরা অনেক সময় অত্যাচারী হত। মহাজনরা ছিল সুদখোর। তাদের দেনা পাওনা কোনও দিনই আর শোধ হত না। অনেক সময় আমাদের ঋণের দায়ে বেগার খাটতে হত। কখনও-বা পুরুষানুক্রমে। দুর্ভিক্ষে সকলের আগে কঙ্কালে পরিণত হতাম আমরা। মহামারীতে গ্রামের গরিব পল্লিতেই প্রথম শোনা যেত বুকফাটা কান্না। তবু আমরা কখনও দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা ভারতাম না। 'যে দিকে দু'চোখ যায়' বলে আমাদের মধ্যে কোনও কথার চল ছিল

না। কারণ, ওই দুঃখের সংসারেও আমাদের একটা সমাজ ছিল। দুঃখীদের মধ্যে সহমর্মিতা ছিল। এমনকী স্বচ্ছল সম্পন্ন কিংবা উচ্চবর্ণের মানুষও আমাদের বাদ দিয়ে গ্রাম-জীবন ভাবতে পারতেন না। আমাদের সেই সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল। হাট ছিল। বাজার ছিল। মেলা ছিল। তীর্থ ছিল। আমরা তাই কখনও "বিলাতের" কথা ভাবতাম না, বিদেশ সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। আমাদের গ্রামের মধ্যে যারা পড়ালেখা করা মানুষ, যাঁরা মাঝে মধ্যে টাউনে যান, তাঁরাও পুবে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে সিন্ধুনদী, তার বাইরে কোনও দেশের কথা জানেন না। আমাদের স্বদেশ থেকে হয়তো তাদের স্বদেশ অনেক বড়। কিন্তু সমুদ্র তাঁদের কাছেও কালাপানি। কেউ তা পার হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের মতো তাঁদের অধিকাংশই সমুদ্র চোখেই দেখেননি। আমরা কি কখনও কালাপানি পার হতে পারি?

অথচ ভাগ্যের ফেরে তাই করতে হল আমাদের। আমরা কালাপানি পার হতে চলেছি। কানাঘুষায় শুনেছি কালাপানির ও পারে এমন দেশ আছে যার চারপাশে জল, মাঝখানে ডাঙা। তার মানে "টাপু"। পড়ালেখা জানা লোকেরা যাকে বলে দ্বীপ। একটি নয়, অনেক দ্বীপ। যেমন—'মির চিয়াস' (মরিশাস), 'ডেমেরেরা' (ব্রিটিশ গিয়ানা), 'চিনিটাট' (ত্রিনিদাদ) কিংবা 'কলম্বো' (সিংহল)। কোনটি কোনদিকে আমরা তার কিছুই জানি না। মিথ্যে বলব না, ও সব নিয়ে আমাদের মাথায় কোনও চিন্তাই ছিল না। এক কানে শুনতাম, অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যেত।

হঠাৎ একদিন গাঁয়ের হাটে এক পরদেশির সঙ্গে দেখা। পরদেশি মানে আমাদের গাঁয়ের কেউ নয়, তবে আমাদেরই বুলি তার মুখে, পোশাক-আশাক আমাদেরই মতো, তবে একটু সাফাই করা এই যা। আমাদের দু'জনকে নিয়ে সে গাছতলায় বসে সুখদুঃখের গল্প জুড়ল। আমরা গাঁয়ের সরল মানুষ, মনে কোনও ঘোর প্যাঁচ নেই। মন খুলেই বললাম আমাদের গরিবানার কথা। সে খুব দরদ দিয়ে সব শুনল। তারপর যা বলল তা বিশ্বাস করা শক্ত। লোকটি বলল, সে একদিনে আমাদের সব সমস্যার হিল্লে করে দিতে পারে। লোকটা জাদুকর নাকি? আমরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। লোকটি আমাদের মনের কথা যেন জেনে গেছে। সে কোচর থেকে বড়সড়ে পাঁচটি রুপোর টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল—এই নাও। বিশ্বাস হল তো এ বার? সে আরও পাঁচটি টাকা দিয়ে দিল আমার সঙ্গীকে। হ্যাঁ, আরও পাবে। দু'দিন সময় দিচ্ছি, ভেবে দেখো। সরকারি কাজ। মাসে মাইনে পাঁচ টাকা। ছুটি আছে। পাঁচ সালের কড়ার। তারপর ইচ্ছা হলে ফিরে আসবে ঘরে। মোটে তো পাঁচটি বছর। তবে হ্যাঁ, ঘরে বসে তো আর টাকা পাবে না। আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে হবে। সেখানে রাজ সরকার ঠিক করবেন, কোথায় তোমাদের যেতে হবে; কাজই-বা কী। তবে কাজটি সাধারণত বাগবাগিচার, খেত খামারের। যদি রাজি হও, তবে খাই খরচা, রাহাখরচা ঘরওয়ালির জন্য নগদ, সব মিলিয়ে আরও কিছু পাবে। আগে মনস্থির করো। আমি এক ক্রোশ দূরে যে-গঞ্জ, সেখানে বটগাছতলায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা

করব। দেখবে, তোমাদের মতো আরও অনেকেই আসবে সেখানে। ব্যস, বাড়ি যাও; নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করো, তারপর সকলের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসো। পাঁচটি মাত্র বছর বই তো নয়। তোমার এক সালের বাচ্চার উমর হবে তখন ছয় শাল, তা-ই না? তুমি বউয়ের জন্য শাড়ি গয়না, বাচ্চার জন্য নতুন জামা আর মিঠাই নিয়ে ঘরে ফিরবে। দেখবে কত আনন্দ হবে সেদিন। এই এক ঘেয়ে জীবনে কী এমন আছে যে, কয়েদির মতো নিত্য ঘানি টেনে যেতে হবে! ভেবে দেখো।

দু'দিন দুই রাত্তির ধরে আমি স্বপ্ন দেখি। সুখের স্বপ্ন। পেটভরা খাবার। উৎসব দিনে ভাল পোশাক। খড়ের ঘরে নতুন চাল। হয়তো দু'এক কাঠা নিজের জমিনও। হাল। গোরু বলদ। ছাগল। আমার কানে কাঁচা টাকার ঝনঝন! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গঞ্জের পথ ধরি। সেই সঙ্গীও আমার পিছু নেয়। বটতলায় আমাদের মতো আরও কেউ কেউ ছিল। থাকবে না কেন? একজন বলল, সে বছর বাংলার বীরভূম থেকে এক সাহেবের বাক্স মাথায় নিয়ে সে কলকাতায় গিয়েছিল। বেশ কয়েকদিনের পথ। ব্যথায় পা টনটন করে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। শেষ পর্যন্ত আসা যাওয়ার খরচা সহ মজুরি মিলেছিল আড়াই টাকা। আর, এই লোকটি কিছু না চাইতেই দিচ্ছে পাঁচ টাকা! এ তো ছপ্পড় ফুঁড়ে পাওয়া! সুতরাং আমরা তার পিছু পিছু কলকাতা রওনা হয়েছিলাম।

এই লোকটিকে, পরে শুনেছি, বলা হয় আড়কাঠি। যদিও সে নিজেকে সরকারি লোক বলে, কিন্তু আসলে সরকারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তার উপরওয়ালা যে কলকাতায় বসে আছে সেও সরকারি লোক নয়। আসলে সরকারি লোক বলা যায় লাইসেন্সধারী অ্যাজেন্টকে। সে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য সরকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। 'প্রোটেকটার' বা কুলিদের সরকারি রক্ষক একমাত্র তাকেই স্বীকার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়াবার হক তার মতো লাইসেন্সধারীদের। সরকার তাদের হাতে লাইসেন্স ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সামনে রইল এই বিশাল দেশ। এখানে শ্রমিকের অভাব নেই। ইচ্ছে মতো সংগ্রহ করো। তবে হ্যাঁ, কাউকে জোর করে বিদেশে পাঠানো যাবে না। এরা আমাদের বিশ্বস্ত প্রজা। যা করবে, আইন মোতাবেক। অ্যাজেন্টরা সরাসরি লোক সংগ্রহ করবে কেমন করে? তারা এ দেশের কতটুকু জানে? সুতরাং তারা ঠিকাদারদের ধরল। ঠিকাদাররা—আড়কাঠিদের। তারা গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, রেলস্টশনে, হাটেবাজারে, মেলায়, তীর্থস্থানে হানা দিতে শুরু করে। পকেটে বা কোটরে তাদের ঠিকাদারের টাকা। ঠিকাদারকে মূলধন জোগাচ্ছে অ্যাজেন্ট। দেশময় তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে শত শত মানুষ খেকো, আড়কাঠি।

আড়কাঠি আমাদের যে-ভাবে হাতে পেয়েছিল, বলাই বাহুল্য, সকলকে সেভাবে বশ করতে পারেনি। আমাদের সে আগামও দিয়েছিল। কিন্তু অসংখ্যকে যা দিয়েছিল সে নির্ভেজাল ফাঁকি! কাউকে শহরে চাকুরির আশ্বাস, কাউকে সাহেব কুঠিতে বাবুর্চি বা খিদমদগারের কাজ, কাউকে পুলিশের, কাউকে দরোয়ানের। মেয়েদেরও নানাভাবে প্রলুব্ধ করা হত। চাকিতে গম কিংবা চানা পেষাই করতে হবে, মেমসাহেবের বাচ্চাদের দেখভাল করতে হবে, হাসপাতালে কাজ পাবে, এমনকী

বাচ্চাদেরও নিখরচায় স্কুলে পড়ানো হবে। ফাঁকি আর ফাঁকি আর ফাঁকি। মিথ্যা আর মিথ্যা, আর মিথ্যা, মিথ্যার সাত কাহন।

ফলে আড়কাঠির জাল যখন টেনে ডাঙায় তোলা হত তখন দেখা যেত সেখানে ধরা পড়েছে এমন অনেকে যাদের না আছে দেশান্তরী হওয়ার ইচ্ছা, না ঘড়া ঘড়া মোহরের সাধ। ১৮৫৬-৫৭ সালে দেখা যায়, শ্রমিকদের একটি দলে রয়েছে পূজারি ব্রাহ্মণ, মুসলমান ফকির, বাজিকর, বা এমনই সব মানুষ যাদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবীর কোনও সম্পর্ক নেই। তারাও "শ্রমিক" হিসাবে চালান হয়ে গেল। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ গিয়ানায় একটি জাহাজ যাদের নিয়ে এল সে-দলে ছিল ১৩ জন কৃষি শ্রমিক, ১ জন চুনের কারিগর, একজন রাখাল, ৩ জন পুরোহিত, ১ জন ঝাড়ুদার। তৎসহ এমন আরও ১৪ জন যাদের মধ্যে ছিল পুরোহিত, তাঁতি, কেরানি, মুচি, ভিখারি প্রভৃতি। সুরিনামেও একই কাণ্ড। সেখানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল ভূত-পূর্ব সৈনিক, ভূতপূর্ব পুলিশ, পরামানিক, দোকানদার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি। ক'বছর পরে শ্রমিকের দলের সঙ্গে নামল এসে একটি নাচের দল, তাদের 'মাসি' বা অভিভাবিকা, সেই সঙ্গে সহযোগী বাদ্যকররা! তারা কিন্তু দুঃখী শ্রমিকদের আনন্দদানের জন্য আসেনি, এসেছে আড়কাঠির হাতযশের জন্য! সবাই তারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে হবে খেতখামারে।

একবার সে এক কাণ্ড। ১৮৯১ সালে জ্যামাইকাতে 'কড়ারি মজুর'দের সঙ্গে মিশে এসে পৌঁছাল এক সুন্দরী নেপাল কন্যা। তার চেহারা, চোখমুখ, সাজগোজ দেখে সবাই অবাক। এই মেয়ে এই গরিবের ভিড়ে এল কী করে? মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হল—কে তুমি? কী করেই-বা এখানে এলে? মেয়েটি বলল আমি নেপালের এক রাজা জং বাহাদুরের কন্যা। দেশ দেখব বলে প্রাসাদের ভৃত্যদের সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। তোমাদের লোকেদের আমি আমার সঙ্গে নোকরকে দেখিয়ে বলেছি—আমার স্বামী। সুতরাং, ওরা সহজেই আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জাহাজে তুলে দিল! কর্তৃপক্ষের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহের স্মৃতি এখনও জ্বল জ্বল করছে। নেপাল ছিল সেই দুর্যোগে ইংরেজের সহায়। তার রাজকুমারীকে ধরে রাখলে কে জানে কী বিপদ ঘনিয়ে আসবে। সুতরাং, যত দ্রুত পারা যায় ওকে ফেরত পাঠানো দরকার।

আড়কাঠির জাল কী তুলতে যে কী তুলে নিয়ে আসবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ১৮৭১ সালের কথা। কানপুরের একজন মুসলিম গৃহস্থ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী এবং তিনটি সন্তানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কী করে পাওয়া যাবে? আড়কাটি বেচারাদের ধরে আরও ক'জনের সঙ্গে হাজির করে লখনৌয়ে অ্যাজেন্টের কাছে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ছাড়পত্র আদায় করে লোকটি ওদের নিয়ে ট্রেনে কলকাতা যাত্রা করে। পথে সেই কানপুরে বিরতি। মুসলমানটি দৈবাৎ তখন সেখানে। হঠাৎ তিনি দেখতে পান জানালার ধারে বসে তাঁর স্ত্রী কাঁদছে। তিনি শোরগোল বাঁধালেন। পুলিশ এসে সন্তানসহ মেয়েটিকে উদ্ধার

করে। আড়কাঠির নাকি সেই অপরাধে শাস্তি হয়েছিল।

সে-বছরই (১৮৭১) একজন মিশনারির তৎপরতায় চালান হতে হতে বেঁচে যায় একটি বড়-সড়ো দল। দলের সবাই মেয়ে। তাদের বলা হয়—রাজসরকারের হুকুম, তোমাদের মিরিচদেশে যেতে হবে, সেখানে তোমাদের চাকিতে দানা ভাঙতে হবে। ওরা তাতে রাজি নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বলদেও জমাদার নামে এলাহাবাদেরই এক আড়কাঠি সংগ্রহ করেছিল ওদের। এলাহাবাদের এক পাদ্রি সাহেবের কাজ করত একজন চর্মকার। জুতা সারাই করতে করতে সে সাহেবকে বলল, বলদেও নামে একজন তার চাচিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। চাচা খবর পেয়ে তার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে। বলে ওকে ছেড়ে দাও। শেষ পর্যন্ত বলদেও রাজি হল। ছাড়তে পারি, কিন্তু আমাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে। চাচা টাকা পাবে কোথায়? সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে।

সাহেব তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। ছুটলেন প্রথমে থানায়, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। পুলিশ নিয়ে তিনি বলদেওয়ের আড্ডায় পৌঁছালেন। সেখানে দশ বারোটি নানা বয়সের মেয়ে। সবাই কাঁদছে। কিছু বাচ্চা কাচ্ছাও ছিল। সাহেবকে দেখে মেয়েরা তাঁর পা জড়িয়ে ধরল, সাহেব তুমি আমাদের মা বাপ, আমাদের বাঁচাও। ওদের কথায় জানা গেল, বলদেও একজন সর্দার, লোকধরার জন্য তার সাত-আটজন চেলা আছে, তারা মাথা পিছু এক টাকা করে পায়। যা-হোক, সাহেব তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি যে যার ঘরে ফিরে যেতে চাও? ওরা সবাই বলল—হ্যাঁ। আমরা কেউ মিরিচদেশে যাব না। সাহেব বললেন, তবে যাও! ওরা নাকি হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। একটি মেয়ে তাড়াহুড়োয় এমনকী কোলের বাচ্চাটিকেও ফেলে যায়। তাকে ডেকে আনতে হয়। সেবারও নাকি সাজা হয়েছিল আড়কাঠিরই, নিয়োগকর্তাদের নয়।

কেউ হয়তো গঙ্গায় স্নান করছিল। আড়কাঠি তাকে ছলে বলে কৌশলে হাত করে চালান দিয়ে দিল। খাতায় ব্রাহ্মণ সন্তানের পরিচয় হত চাষি। হিন্দু কলমের খোঁচায় মুসলমান হয়ে যেত, মুসলমান হিন্দু। একবার জালে পড়লে ছাড় পাওয়া শক্ত। আড়কাঠি বলবে বেশ যাও। তবে এই রইল তোমার লোটা আর থালা। তোমার জন্য যে আমি টাকা খরচা করেছি, সে টাকা কে দেবে? লোকটি দেখল, এ তো ভারী বিপদ। সে নতুন থালা আর লোটা কিনবে কী দিয়ে। সুতরাং, মাথা হেঁট করে বসে থাকে। ভাবে, এই আমার নসিব, ললাটের লিখন, তাকে খণ্ডাব তার সাধ্য কী! ভারতীয়দের অদ্ভুত ধর্মবোধ। আড়কাঠির হেপাজতে এক রাত্তির কাটাবার পর সে নরম হয়ে যায়। চোখের জল মুছে বলে, ঠিক আছে, একবার যখন তোমার নুন খেয়েছি তখন নিমকহারামি করব না, তুমি যা বলবে তা-ই হবে!

মালাবারে আড়কাঠিরা এমনকী বারবনিতাদের দিয়েও নাকি লোক ধরাত। ওদের ফিকিরের অন্ত ছিল না। দেশের ভেতরে 'কড়ারি মজুর' ধরবার জন্য আড়কাঠিরা এ ভাবে যত্রতত্র হানা দিত না। যেহেতু অসমের চা বাগানের শ্রমিকরা ছিল বিশেষ

কোনও অঞ্চলের বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর, সেইহেতু তারা ঘুরে বেড়াত সর্দার বা গোষ্ঠীপতিদের পিছু পিছু। কোনও মতে তাদের মন গলাতে পারলে কেল্লা ফতে। দূরের উপনিবেশগুলোতে শ্রমিক পাঠানো হত প্রধানত বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে। বিশেষত উত্তর বিহার এবং বেনারস অঞ্চল থেকে। সবচেয়ে বেশি শ্রমিক বিদেশ যাত্রী হয়েছে বেনারস আজমগড়, গোরখপুর, জৌনপুর, গাজিপুর, মুজাফরপুর, চম্পারন, সাহাবাদ, পাটনা, গয়া, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর থেকে। এ দিকে বৃহত্তর কলকাতা এবং চব্বিশ পরগনাও বাদ ছিল না। অসমে চা বাগান সাজানো হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কাছাড়, এবং ডুয়ার্সে চা শিল্পের বড়ই রমরমা। তা সামাল দেওয়ার জন্য বেড়ে যায় 'ঝুলি'র চাহিদা। তার জোগান আসত ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনা থেকে।

তা ছাড়া ছিল মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনা থেকে সংগ্রহ করা হত প্রধানত পাহাড়ি সম্প্রদায় বা বনচারীদের। অবশ্য তরাই এবং নেপালের শ্রমিকও ছিল বেশ কিছু। তবে বেশির ভাগেরই আদি নিবাস ছিল ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনা। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে অসমে রাজ্যের বাইরে থেকে ইংরেজ বাগানমালিকরা শ্রমিক আমদানি করে থাকেন যদি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, তবে তার মধ্যে ছোটনাগপুর এলাকা থেকেই আমদানি করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার!

পশ্চিম যাত্রীদের মতো একই কান্নার ইতিহাস পুবের যাত্রীদের। মাথাপিছু শ্রমিকদের জন্য মালিকদের খরচ হত ৭০ থেকে ৯০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী তাদের মাইনে ছিল মাসে পাঁচ টাকা। সে-টাকা তো পাওয়া যাবে ঠিকানায় পৌঁছাবার পর। সেখানে বউ বাচ্চা নিয়ে বাস করা যাবে, রেশন পাওয়া যাবে, ডাক্তার থাকবে, সরকারি ইন্সপেক্টরবাবু থাকবেন। কিন্তু সেই সুখের স্বর্গে পৌঁছানোই তো মুশকিল। পথে পদে পদে অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু। মুরগির খাঁচার মতো রেলের কামরায় গাদাগাদি করে কোনও মতে হয়তো তাদের রানিগঞ্জ থেকে কলকাতায় আনা হল। কিন্তু সে তো যাত্রার শেষ নয়, সবে শুরু। মরিশাস এবং ওয়েস্টইন্ডিজের যাত্রীদের জন্য কলকাতায় গুদাম ছিল একটা। সেটি ছিল নদীর গাঁ সেটে, টালির নালার ধারে, খিদিরপুরে। এখনও লোকেরা তাকে বলে কুলিবাজার। আর চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য অপেক্ষা ঘর বা গোলামখানা ছিল একাধিক, গার্ডেনরিচ, বালিগঞ্জ এবং চিৎপুরে। বউবাজার এলাকায় আড়পুলি লেন বলে একটা রাস্তা আছে। কেউ কেউ বলেন সেটা ওই কুলিচালান দেওয়ার সময়কারই স্মৃতি বহন করছে এখনও। আড়পুলি, না আড়-কুলি? কুলিধরা আড়কাঠিদের আড্ডা ছিল কি সেখানে। না আড়কাঠিরা যাদের ধরে নিয়ে আসত সেই হতভাগ্য কুলিদের ডিপো? জানি না। সবই সম্ভব।

কানাঘুষায় অসম সম্পর্কে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনার লোকের মনে ত্রাস ছিল। ওরা নাকি অসমকে বলত—ফাটক, জেলখানা। দমবন্ধ হয়ে যায় এমন

পরিবেশে কলকাতার ডিপোতে পৌঁছোবার পর তাদের মনে হয় তবে কি এই সেই ফাটক, জেলখানা? চারদিক উঁচু পাঁচিল। দুয়ারে পাহারাদার। ভেতরে অন্ধকার। মাপ মতো খাওয়া। উঠো বসো, দাঁড়াও হাঁটো,—ফের বসো! যেমন হুকুম তেমনটি করতে হবে।

তারপর একদিন যাত্রা। ভোরের আলো ফোটার আগেই নদী পথে অচিন দেশে। খোলা নৌকা। গাদাগাদি মানুষ। মানুষ নয়তো যেন বণ্য প্রাণী। যাত্রা যখন স্টিমারে তখনও বোঝাই করা হত দ্বিগুণ লোক। পথে নৌকাডুবি, স্টিমার ডুবি—সবই হত। তা ছাড়া প্রায়ই হানা দিত মহামারি। কলকাতায় দু'চার সপ্তাহ 'ডিপো' নামক কয়েদখানায় কাটানোর পর নদীপথে দীর্ঘ পথ পার হয়ে বাগানে পৌছানো রীতিমতো এক অভিযান। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনও মতে পৌঁছাবার পর এ বার আর এক কয়েদখানায়। প্রভুরাই সেখানেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁদের হাতেই জীবন মরণ। গরিবেরও ইজ্জত থাকে। অন্তত তাদের ছিল। কিন্তু বাগানে ওদের কোনও ইজ্জত নেই। দূর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতোই স্বদেশের মাটিতেও একই হাল তাদের। এমনকী সর্দাররা পর্যন্ত এখানে যেন ভয়ে কেঁচো। আর মেয়েরা? তারা তো প্রায়ই সাহেবদের লালসার শিকার। বাগানবাবুরাও যেন কতকাল মেয়েমানুষের মুখ দেখেননি, এমনি তাদের হাবভাব, চোখের চাউনি। মেয়েরা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। তবু কেউ কেউ কেঁদেকেটে রাতে সাহেব-কুঠি এড়াতে পারে না। যথা সময়ে কালোদের ঘর আলো করে সাদা নরম বেড়ালছানার মতো আবির্ভূত হয় সাদা শিশু। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

লজ্জিত এমনকী কখনও কখনও মেমসাহেবরা পর্যন্ত। একবার একজন বাগান-মালিক পকেটে প্রচুর পয়সা নিয়ে ছুটি কাটাতে দেশে গিয়েছিলেন। বাহাদুর বটে। ফেরার সময় একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন বাগানে। রাজরানির আদর তাঁর। কিন্তু একটা মাসও কাটল না। বুদ্ধিমতী মেম জেনে গেলেন তাঁর স্বামীর গোপন জীবন। দুই-দুইটি কালো মেয়ে তাঁর সঙ্গিনী। তাদের দৌলতে কুলিলাইনে চার-পাঁচটি সাদা বাচ্চা! লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় মেম আত্মঘাতী হলেন! ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবা মরিশাসে কোনও শ্বেতাঙ্গগৃহিণী আত্মহত্যা করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু মেয়েদের লাঞ্ছনার কাহিনী মোটে গোপন ছিল না। পুবে, পশ্চিমে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের একই হাল সেদিন। তাদের জীবনের কানাকড়ি দাম নেই। তারা যেন শরীর সর্বস্ব মানুষ, তাদের কোনও মন নেই। সুতরাং, মানও নেই।

আপাতত সেসব কথা থাক। পুব থেকে একবার তাকানো যাক পশ্চিম যাত্রীদের দিকে। ঘরের কাছে অসম-ডুয়ার্সের যন্ত্রণার কাহিনী অনেকেরই জানা। বিস্তর লেখালেখি হয়েছে কুলির যন্ত্রণা নিয়ে, হয়েছে আন্দোলনও। চা পান, না কুলির রক্তপান? সেদিন এ প্রশ্ন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কান্না-বিলাসী ছিলেন না। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি-র ইতিহাস দুঃখী মানুষের রক্তেই লেখা।

আমরা যারা পশ্চিমযাত্রী তাদেরও যাত্রা শুরু হত কলকাতা থেকে। রেল হওয়ার আগে কলকাতা পৌঁছানো সহজ ছিল না। হাঁটা পথে উত্তর প্রদেশ থেকে কলকাতা

ত্রিশ-চল্লিশ দিনের মামলা। নদীপথে সময় হয়তো কিছু কম লাগে, কিন্তু খরচ অনেক। ১৮৫৮ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে পায়ে হেঁটে একটি দল পৌঁছাবার পরে দেখা যায় মেয়েদের পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ছোটদের পায়ের অবস্থাও যাচ্ছেতাই। কিন্তু আড়কাঠি এবং উপরওয়ালারা তবু নাছোড়বান্দা। 'ডিপো'তে পৌঁছাবার আগে মাথা পিছু ৩০ থেকে ৪০ টাকার বেশি কিছুতেই খরচ করা চলবে না। খামার-মালিকরা কেউ দানছত্র খোলেননি। তাঁরা ব্যবসায়ী। তাঁরা জানেন, ব্যবসা করতে হলে মূলধন চাই। এই ভারতীয়রাও মূলধন। কিন্তু তাই বলে মুনাফার চিন্তা বাদ দেওয়া চলে না। এত কাণ্ড তো দুটি পাউন্ডেরই জন্য! বেশি দয়ামায়া থাকলে তাঁরা পাদ্রি হতেন, ব্যবসায়ী বা উদ্যোগপতি নন।

কলকাতায় 'ডিপো'তে পৌঁছাবার আগেই চালাকরা কেউ কেউ পালিয়ে যেত। কেউ কেউ বুদ্ধি করেই আড়কাঠিদের ফাঁকিতে ফেলত। ওদের দলের সঙ্গে এসে কলকাতায় নেমে ঝটতি পালিয়ে যেত। আসলে চালাকরা ওদের খরচায় বড় শহরে পৌঁছাতে চেয়েছিল মাত্র। কারও কারও মতলব ছিল কলকাতা থেকে পুরীতে তীর্থ যাত্রা। হিসাব করে কর্তারা দেখেছেন হরেদরে শতকরা পাঁচজন ধরা দিয়েও শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। কলকাতার জনারণ্যে মিশে যায়। ওই শহরেই নতুন জীবন খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কালাপানির হাতছানি তারা সভয়ে এড়িয়ে যায়। যারা এতখানি বুদ্ধিমান নয়। যারা টোপ গিলে ফেলেছে তারা 'ডিপো' নামক কয়েদখানার অন্ধকারে দিন গোনে। এখানেও উঁচু দেওয়ালের বেষ্টনী, এখানে ভেতরে বাইরে পাহারা, এখানের প্রায় অন্ধকারে দিবারাত্র পোহানো, অনিশ্চিতের জন্য অপেক্ষা।

'ডিপো'তে নারী পুরুষকে আলাদা রাখা হত। কিছুকাল এক সঙ্গে কাটানোর পর কখনও কখনও যেমন পুরুষদের মধ্যে গড়ে উঠত ভ্রাতৃত্ববোধ, তেমনই কখনও কখনও শরীরের টানে নারী পুরুষ কাছাকাছি আসত। বিশেষত, নিঃসঙ্গ নারী ও পুরুষরা। সরকারি আইন, কোনও নিঃসঙ্গ নারীকে মরিশাস কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা অন্য কোথায়ও পাঠানো চলবে না। অ্যাজেন্টরা তা-ই আড় চোখে ওই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা, একের গায়ে অন্যের গড়িয়ে পড়া, ফিস ফিস অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে, সুযোগ নিতেন। বলতেন,—মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছ? বেশ ভাল কথা। খুব খুশির কথা। এসো তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিই। ওরা তাদের বিয়ে দিত। অন্যরা এই বিয়ের নাম দিয়েছিল 'ডিপোর বিয়ে।' জোড়ায় নামবার পর অন্য কোনও মেয়ে হয়তো জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ, বোন তোমার কি ডিপোর বিয়ে।'—আমারও।

এটাই সান্ত্বনা ওদের। অনেকেরই বিয়ে 'ডিপোর বিয়ে।' কোনও আচার অনুষ্ঠান নেই। কোনও 'বরাত' নেই, কোনও হইহল্লা আমোদ প্রমোদ নেই। ওদের বিয়ে হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক জানে না, স্বজাতির আত্মীয় বন্ধুরা কেউ জানে না, ওদের বিয়ে হল। গ্রামে গরিবের বিয়েও একটা ঘটনা। তারও একটা অনুষ্ঠান আছে। খানা পিনা, গানা আছে, এখানে কিছুই নেই। কার সঙ্গে বিয়ে হল কার কী জাত, কে স্বজাতির মানুষ, কে অন্য জাতের, তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। অ্যাজেন্টের খাতায়

A medallion designed by Josiah Wedgwood: the answer to the question 'Am I not a man and a brother?' in the American South was a firm 'no'.

মুক্তি-প্রত্যাশী আর্ত ক্রীতদাস। ধাতব মেডেল।

মাত্র নয় টাকার বিনিময়ে নিজেদের বেচে দিয়েছিলেন বাঙালি স্বামী স্ত্রী।
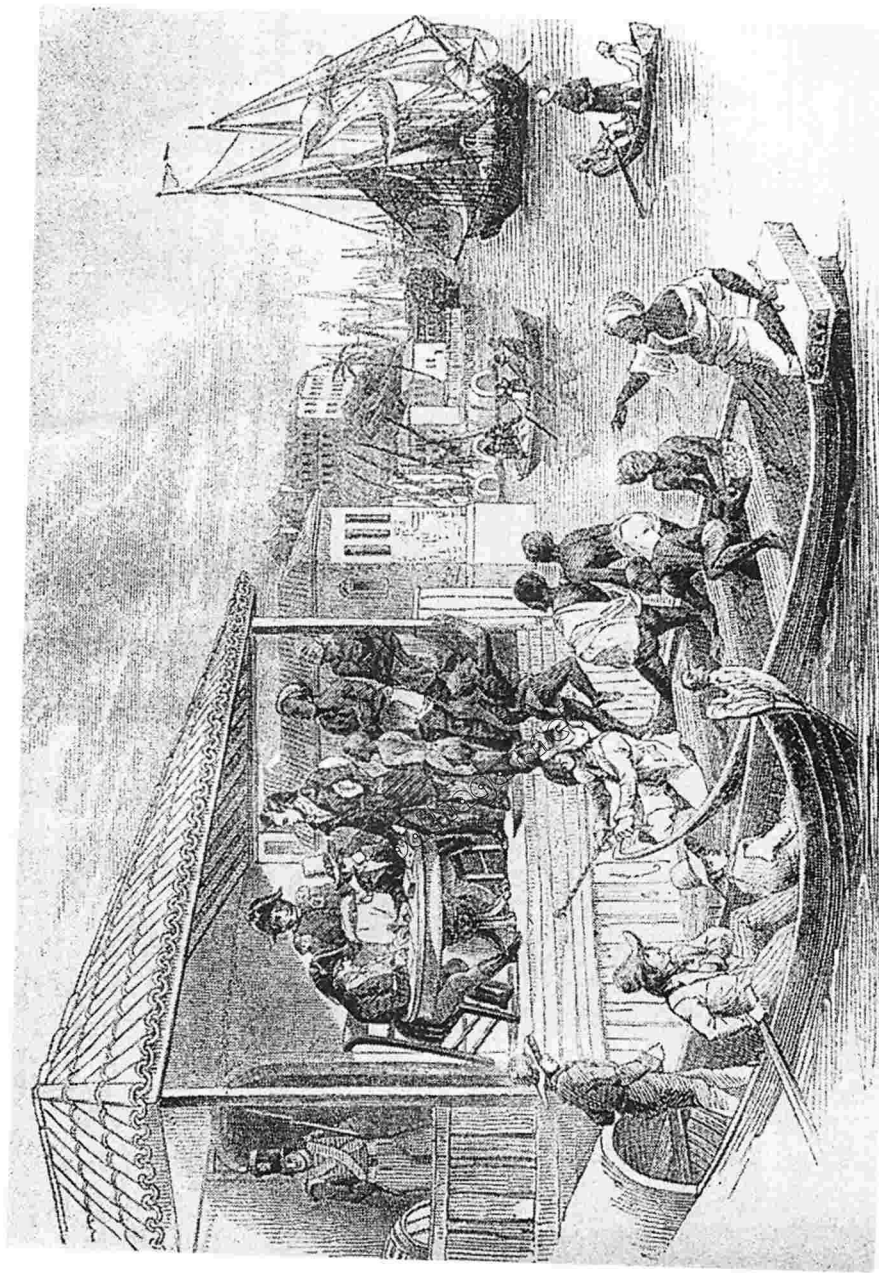
ছদ্মবেশে ফের দাসপ্রথা। ভারতীয় "কুলি" চালান হচ্ছে মরিশাসে।
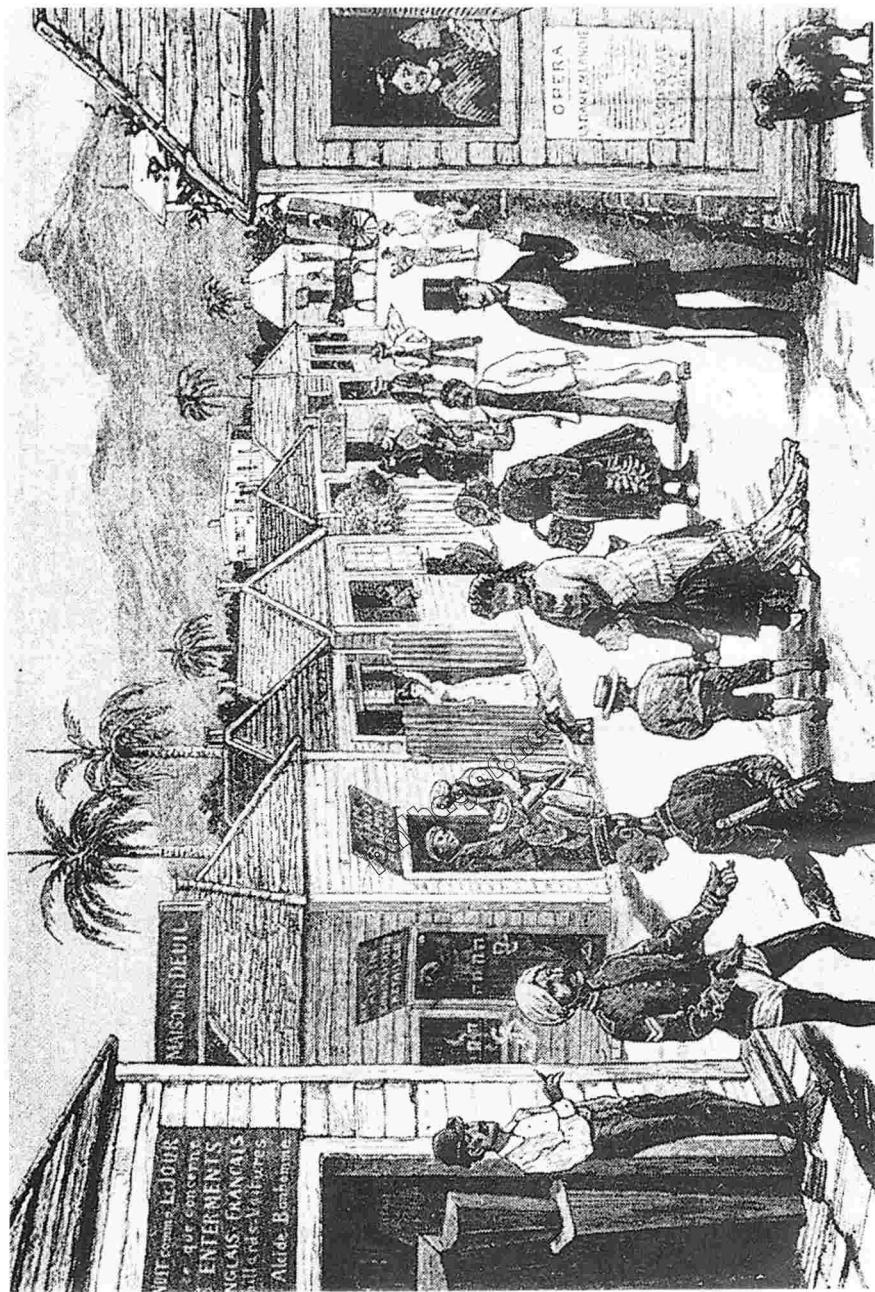
মরিশাসে শ্রমিক মহল্লায় নতুন পোশাকে ভারতীয় "কুলি।"

Old Immigrant's Ticket.

DUPLICATE

Name of Immigrant .... Teeluck

Number 237529

Name of Father.............. Bheenick

Name of Mother.............. Jacooty

Age (in letters) .... Forty yrs

Stature (in feet and inches)... 5 Feet

Caste .... Doosad

Marks...................... None visible

Native Country .... Arrah

Number of Vessel by which introduced 876

This Immigrant is free to engage himself.

Delivered this 22nd April 1869.

In absence of the Protector of Immigrants.

Chief Clerk.

একজন ভারতীয় মরিশাস-যাত্রীর পরিচয়-পত্র।

দাস-প্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতা উইলিয়াম উইলবারফোর্স।

রোমান গ্ল্যাডিয়েটার। নিত্য যাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। মোজাইক।
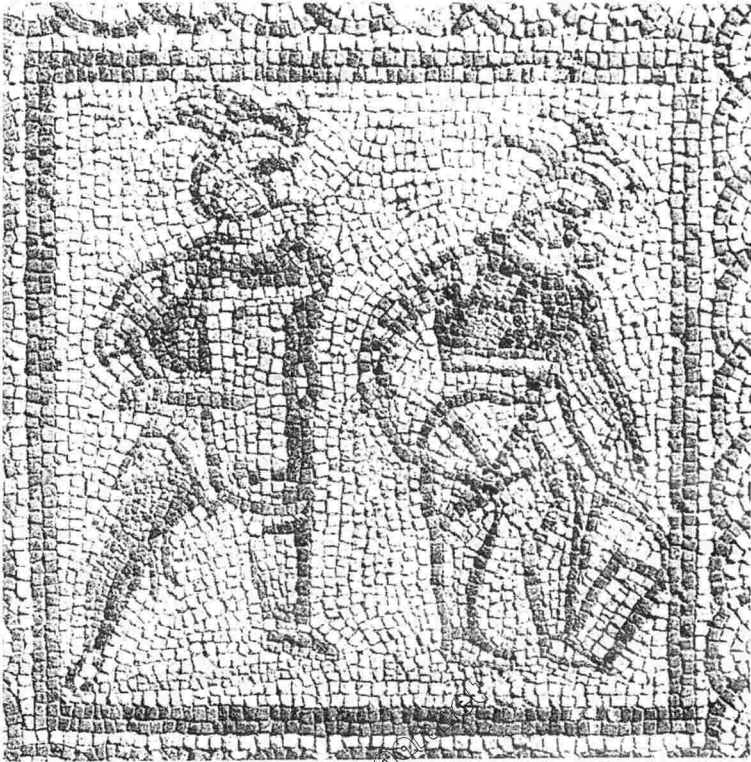
রোমান মোজাইকে গ্ল্যাডিয়েটারদের লড়াইয়ের আরও একটি দৃশ্য।

বলছে—ওরা স্বামী স্ত্রী। ওরা তাই স্বামী স্ত্রী!

ডিপোতে ওদের একই পোশাক পরতে হত। কয়েদিদের পোশাকেরই রকমফের। ওদের নিজেদের জামা কাপড় নিয়ে ধোলাই করে আবার ওদের ফেরত দেওয়া হত। মরিশাস যাত্রীদের মিলত টুপি ও এক ধরনের জার্সি। জার্সি সাধারণত ব্রিটিশ সৈন্যদের পরিত্যক্ত লাল ইউনিফর্ম। জুতোও মিলত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ফিজিতে যারা যাবে তাদের গরম জামা কাপড়ও দেওয়া হত। হ্যাঁ, মেয়েদেরও। তাদের শাড়ি ছাড়াও দেওয়া হত পশমি জ্যাকেট, পশমি পেটিকোট এবং জুতামোজা। ওদের পথ গেছে ভারত মহাসাগর, অতলান্তিক এবং দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর দিয়ে। সুতরাং পথে প্রচণ্ড শীতের জন্যও প্রস্তুতি দরকার। দু'-চার সপ্তাহ এই কয়েদখানায় কাটাবার পর জাহাজে উঠার পালা। তার আগে একটা পরব ছিল। মাথা গুন্তি করে সবাইকে সার বেঁধে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হত। কারণ, সেটা সরকারি কানুন। ডাক্তার আমাদের হাত দেখতেন, পেশি দেখতেন। দেখতেন, এইসব মরদ আর জেনানা শক্ত কাজের যোগ্য কিনা। নামকা ওয়াস্তে পরীক্ষা। নিমেষে পরীক্ষা সারা। তারপর একটা কাগজ দেখিয়ে বলা হত এখানে টিপ ছাপ লাগাও। সেটাই নাকি আমাদের চুক্তিনামা। কী লেখা আছে সেখানে ওঁরাই তা জানেন। আমরা জানলাম, আমরা গিরমিটওয়ালা হয়ে গেলাম। এ বার প্রত্যেকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা টিনের চাকতি। তাতে কোম্পানির নাম আর আমাদের নম্বর খোদাই করা। শুনেছি আগে আগে গোলামদের বান্দা ছাপ দেওয়া হত লোহা পুড়িয়ে চামড়ায়। হাতে, পিঠে, এমনকী কপালে। আমরা ইংরেজ সরকারের প্রজা। আমাদের সঙ্গে তা চলবে কেন, তাই ছাপের বদলে এই চিনাস। ওঁরা হুঁসিয়ার করে দিলেন, খবরদার এটা হারাবে না। এতে যে তোমরা কাজ পাবে তাই নয়, মাইনে, রেশন, ঔষধপত্র সবকিছু পেতেই এই টিকিট লাগবে। আমরা মাথা নাড়ি। হ্যাঁ, জি, ঠিক আছে।

এ বার দামি পোশাক পরা, রকমারি তকমা আঁটা, মাথায় টুপি-পরা এক লম্বাচওড়া সাহেব এলেন। কেরানিবাবু বললেন, এই সাহেব তোমাদের জাহাজের কাপ্তান ওঁকে সেলাম করো। আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁকে সেলাম জানালাম। তারপর এলেন আর এক সাহেব। বলা হল, ইনি জাহাজের ডাক্তার সুপার। তোমাদের দেখভালের দায়িত্ব ওঁর উপর। তোমাদের কোনও অভাব অভিযোগ থাকলে ইনিই তা মেটাবেন। ওঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলো। আমরা এ বারও মাথা নেড়ে, তাঁকে সালাম জানালাম। আবার মাথাগুনতি হল। এ বার খাতার সঙ্গে মিলিয়ে। নামওয়ারি পাকা হিসাব। দেখা গেল দলে রয়েছে ১৬৪ জন পুরুষ, ১২৫ জন মেয়ে, ১৪০ জন কিশোর কিশোরী আর ১৪টি শিশু। হিসাব মিলে গেছে দেখে ওঁরা খুশি। আমাদের বুক দুরু দুরু।

নদীর ঘাট থেকে নৌকো বোঝাই করে আমাদের জাহাজে নিয়ে তোলা হত ভোরে, সূর্য ওঠার আগে। কলকাতা তখন ঘুমে। ভারতও তখন ঘুমিয়ে। অন্তত এ দেশের অধিকাংশ মানুষ তখনও ঘর ছেড়ে বের হয়নি। আমরা হতভাগার দল তাদের সকলের অজান্তে চলেছি অজানা দেশে। নৌকোয় কান্নার রোল উঠত। জাহাজেও।

আমরা বুঝতে পারছি নিজেদের দেশ ছেড়ে আমরা দূরে, দেশান্তরে চলেছি। কলকাতা তবু আমাদের দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল। এ বার তাও হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ তা ভেবে বেসামাল হয়ে পড়ল। দু'চারজন কখনও কখনও ঝাঁপ দিত জলে। তারা শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গায় পৌঁছাতে পারত কিনা জানি না। ওঁদের খাতায় ঢেরা পড়ত, পলাতক। কে জানে, হয়তো ওঁরা লিখতেন, মৃত।

জাহাজের দিনগুলোর কথা আর নতুন করে কী বলব। এটা ঠিক আফ্রিকার অসহায় মানুষগুলোকে যেভাবে অতলান্তিক পার করে তথাকথিত নয়া-দুনিয়ায় নিয়ে ফেলা হত, আমাদের মনিবেরা ঠিক ততখানি নিষ্ঠুর ছিলেন না। কারণ যত গরিবই হই না কেন, আমরা পুরোপুরি বেওয়ারিশ ছিলাম না। আমাদের জন্য কাঁদবার, ভাববার মতো লোকও ছিল, তা ছাড়া ছিল ইংরেজ সরকার। তারা স্বজাতির মুনাফার জন্য লোক দিতে রাজি ছিল বটে, কিন্তু বিনা কড়ারে নয়। আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের কত না কেতা কানুন! জাহাজে এমনকী ডাক্তার পর্যন্ত মোতায়েন আমাদের জন্য।

জাহাজগুলো আফ্রিকার সেইসব জাহাজের তুলনায় ঈষৎ উন্নত। দীর্ঘ পথে তবু যন্ত্রণার অন্ত ছিল না। আমরা অধিকাংশ শ্রমিকরাই ছিলাম পালখাটানো জাহাজের যাত্রী। পালের জাহাজে মরিশাস পৌঁছাতে লাগত ১০ সপ্তাহ, নাটালে ১২ সপ্তাহ, জ্যামাইকায় ২৭ সপ্তাহ। হাওয়ার এ দিক ও দিকের জন্য কখনও কখনও অনেক বেশি সময় লেগে যেত। ১৮৮২-৮৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটি জাহাজ পৌঁছেছিল ১৭৪ দিনে, আর একটি ১৭৮ দিনে। ১৯০৪ সালে একটি জাহাজের ফিজি পৌঁছাতে লেগেছিল ১২৩ দিন। স্টিমবোট বা কলের জাহাজ অবশ্য সময় প্রায় অর্ধেক ছেঁটে দেয়। তখন ৫৭ দিনে দিব্যি জ্যামাইকা পৌঁছানো যায়। খামার মালিকরা তবু স্টিমবোট চালু হওয়ার পর পালের জাহাজই পছন্দ করত, কারণ তাতে খরচ কম। এমনকী ১৮৯৫ সালেও কলকাতা থেকে বাইশটি পালের জাহাজ যাতায়াত করছে, স্টিমবোট মাত্র ছয়টি। মুনাফা! মুনাফা! মুনাফা শুধু আখের খেতে নয়, মাথা খাটালে মুনাফা জাহাজের পালেও।

দরিয়ায় জাহাজে মাঝে মাঝে মৃত্যু হানা দিত। কখনও কখনও রীতিমতো মড়ক। অনেক হতভাগারই আর নতুন দেশে পৌঁছানো হত না। একবার মরিশাসের পথে শতকরা ২৯ জনই মারা যায়। সেটা ১৮৪৪ সালের কথা। মৃত্যুর রূপ আরও ভয়াবহ ১৮৫৬-৫৭ সালে, ব্রিটিশ গিয়ানার পথে যাত্রী বোঝাই জাহাজ থেকে সুস্থ অবস্থায় নেমেছিল মাত্র ১৭২ জন, মৃত ১২০ জন, ৯৩ জনকে জাহাজঘাটা থেকে সরাসরি নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে, কেউ কেউ জাহাজ থেকে নামে হামাগুড়ি দিয়ে। তাদের শরীর কঙ্কালসার, দৃষ্টি উদাস, মুখে ভাষা নেই। সব যেন বোবা। খাবারের অভাবে নয়, ওরা অসুস্থ কাঁদতে কাঁদতে। ওরা কিছুতেই ভুলতে পারছে না দেশের কথা, আপন জনদের কথা। স্মৃতি ওদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। ১৮৫৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানো হয়েছিল ৪,০৯৪ জনকে। পুরুষ ২,৬৩৯ জন, নারী

১,৯৩১ জন, কমবয়সী ছেলে মেয়ে ৫২৪ জন। তার মধ্যে পথে মারা যায়—৭০৭ জন।

লোকসানের বহর দেখে কলকাতায় অ্যাজেন্ট কপাল থাপড়ান। চুক্তি অনুযায়ী খামারমালিক পয়সা দেবে একমাত্র জ্যান্ত মানুষের জন্যই! যারা নামে তাদের সবাই আবার বাঁচে না। মনমরা হয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ অকাজের মানুষ হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার আত্মঘাতী হয়। একবার আড়কাঠি একজন লোককে পাকড়াও করে। সে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা করত। অর্থাৎ, পেশায় ছিল হাতুড়ে ডাক্তার। আড়কাঠি তাকে বলল, বেশ তো, তুমি সে-দেশে গিয়ে ডাক্তারিই করবে তাতে কী অসুবিধা আছে। সেখানে অনেক রোগীও পাবে। লোকটি তার বউ আর ওষুধের বাক্স নিয়ে চলে গেল সাতসমুদ্র তেরো নদীর ও পারে। সেখানে পৌঁছানোর পর স্বভাবতই তাকে আখ খেত দেখিয়ে দেওয়া হল। গর্বিত পেশাদার সে, কিছুতেই জনমজুরের কাজ কবে না। ঔষধের বাক্স থেকে বিষ বের করে ওরা স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে নিয়ম হয় শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও বাক্স থাকলে তা পরখ করে দেখতে হবে!

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওঁরা দেখেশুনে ধরে নিয়েছিলেন, ভারতীয় শ্রমিক মোটামুটি প্রথম বছরটা কেঁদে কেঁদেই কাটাবে। গুম হয়ে বসে স্মৃতি মন্থন করবে, আর চোখের জলে গাল ভাসাবে। মাঠের কাজে যখন, তখনও সে থেকে থেকেই আনমনা হয়ে যাবে। হাত শিথিল হবে, কাজ এগোবে অতি ধীরে, মন্থর গতিতে। ওঁরা কেউ কি তা লক্ষ্য করতেন? তাহলে কেন আমাদের অলস, কুঁড়ে বলে গাল দিতেন, চাবুক আস্ফালন করতেন?

পথে কখনও যদি মড়ক তবে কখনও হয়তো আবার দুর্ঘটনা। ১৮৫৯ সালের কথা। কলকাতা থেকে মরিশাস যাচ্ছিল 'শাহ আলম' নামে একটা জাহাজ। জাহাজে ছিল ৪০০ কুলি বা ভারতীয় শ্রমিক আর ৪০ জন নাবিক। বিপদ সংকেত পেয়ে 'ভাস্কো-ডা-গামা' নামে একটা জাহাজ নাবিকদের উদ্ধার করে, কিন্তু শ্রমিকদের আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর একবার নাটালে সমুদ্রতটে একটি জাহাজের অবশেষ ভেসে আসে, সেই সঙ্গে ১৬৭টি দেহ। মৃতদের অধিকাংশই ভারতীয়। কী হয়েছিল কেউ জানেন না। কারণ, কেউ নাকি বেঁচে ছিল না।

১৮৬৪ সালে কলকাতার কাছেই গঙ্গার মোহনায় চড়ায় আটকে জাহাজ ভেঙে ডুবে যায়। ৩৪৩ জন যাত্রীর মধ্যে বেঁচে ছিল মাত্র ২২জন। পরের বছর ফের দুর্ঘটনা। ভাঙা জাহাজ থেকে বোট ভাসিয়ে ক্যাপ্টেন এবং নাবিকরা পালিয়ে যান। পেছনে থেকে যান জাহাজের চিফ আফিসার আর তিনজন পদস্থ কর্মী। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ১০০ ভারতীয় নাকি কোনও মতে ডাঙায় পৌঁছাতে পেরেছিল। পাইলট বোট অন্যদের উদ্ধার করে, ফলে বেশ কিছু প্রাণ রক্ষা পায়। তা সত্ত্বেও ১৯ জন ভারতীয় মারা যায়।

মোহনায় ফের দুর্ঘটনা। জাহাজটির নাম ছিল 'দ্য ঈগল স্পিড'। সেটি বাঁধা ছিল

‘লেডি এলগিন’ নামে একটি পাইলট জাহাজের সঙ্গে। ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে সমুদ্রগামী জাহাজটি ভেঙে পড়ে। জাহাজে শ্রমিক ছিল ৪৮৭ জন, নাবিক ২৭ জন। ২৬২ জন শ্রমিক মারা যায়। নাবিকরা পাইলট বোটে আশ্রয় নেয়। তদন্তে জানা যায় ২৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জন স্বাভাবিক বাদবাকি সবাই মাতাল। অতিরিক্ত পানের ফলে টলটলায়মান। জাহাজ দরিয়ায় ভাসবার পর ওই এক সমস্যা। কাপ্তান থেকে শুরু করে অফিসার এবং নাবিকেরা সবাই ভাসতে আরম্ভ করতেন সুরায়।

আর একবারের ঘটনা। ফিজির কাছে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ‘সিরিয়া’ নামে একটি জাহাজ ভেঙে যায়। সেবার জাহাজডুবিতে তলিয়ে যায় ৫০ জন ভারতীয়। কিন্তু সত্যিকারের মানুষের মতো কাজ করেছিলেন জাহাজের ডাক্তার বা সার্জন সুপার ডাঃ শ নামে সাহেব। তিনি কোনও মতে কাঠ ধরে ভেসে ভেসে ডাঙায় পৌঁছেছিলেন। তারপর দ্রুত লোকজন নিয়ে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর চেষ্টায় সেবার বেশির ভাগ যাত্রীই বেঁচে যায়। সেবার আর এক কাণ্ড করেছিলেন জাহাজের ইংরেজ কাপ্তান। ব্রিটিশ রীতি নাকি এই যে, ডুবন্ত জাহাজ থেকে সকলের শেষে নামবেন কাপ্তেন। তাঁর আগে সব যাত্রীরা নেবে যাবে, তিনি নামবেন সবাই বোটে উঠবার পর। সবাই নেমে যাওয়ার পর দেখা গেল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন, তাঁর বাহুলগ্ন একটি মাতাল ভারতীয় মেয়ে! হ্যাঁ, আমাদেরই কোনও মেয়ে। তদন্তের রিপোর্টে তা-ই নাকি লেখা হয়েছিল। কে জানে, কেন ওঁরা লেখেননি যে, সাহেবও ছিলেন মাতাল। কেউ জানতে চাননি, এ মেয়েকে তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? সে কি ভেসে পড়ে ছিল, না বন্দি ছিল কাপ্তেনের কেবিনে?

দরিয়ায় এই এক বিপদ; মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানো শক্ত। আমাদের মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তিনি বলতেন জাহাজে ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। জাহাজ হচ্ছে শ্রীক্ষেত্র। এখানে সবাই সমান। এখানে জাত যাওয়ার কোনও ভয় নেই। ভয় একটাই, যুবতী মেয়েগুলোকে রক্ষা করা। মনে রেখো, শকুনেরা ওৎ পেতে বসে আছে, সুযোগ পেলেই ওদের ছিড়েফুড়ে খাবে, এই মাংসলোলুপরাও জাত মানে না। আমরা ভেবে পাই না ওঁরা এমন ফুর্তিবাজ হন কেমন করে? তবে কি সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় এমন কিছু আছে যা রক্তে ঢেউ তোলে, তলপেট থেকে মাস্তুল প্যান্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়? শিশ্ন তো আমাদেরও প্রত্যেকের রয়েছে। কিন্তু কই, ওঁদের মতো তো আমাদের ক্ষুধা নেই। কাম আমাদের কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই সহজ স্বাভাবিক। আমাদের মেয়েদের কাছেও। বছর বছর পেটে বাচ্চা এলেও কখনও তারা পিঠ ঘুরিয়ে ঘুমোয় না। কিন্তু এখন সেসব কথা চিন্তা করার সময় কোথায়। ভয়ে আমরা সব কুঁকড়ে গেছি। আমরা সব নপুংসক। আমাদের মেয়েরা সব ঠান্ডা পাথর। একদিকে আমাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে হারানো দেশের স্মৃতি, অন্যদিকে না দেখা নতুন দেশের চিন্তা, না জানি, কী সেখানে অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য! আশ্চর্য, তার-ই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ বেছে বেছে জোয়ান মেয়েদের তলব, —কেবিনে চলো।

কলকাতা থেকে জাহাজে তোলার আগে ডাক্তার-সুপার প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতেন এক গ্লাস ব্র্যান্ডিপানি, শরীরটাকে গরম এবং মনটাকে উদাস করার জন্য। কেবিনেও পাথর মেয়েগুলোকে ওঁরা খাওয়ার আগে গরম করে নিতেন দারুপানিতে। ডুবন্ত জাহাজের কাপ্তানের বাহুলগ্ন ওই মাতাল মেয়েটির রহস্য এখানেই।

সেবার জাহাজে আমাদের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন এক বাঙালি বাবু, ডাঃ বিপিনবিহারী দত্ত। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে। শ্রমিকদের নিয়ে জাহাজ যাবে অতলান্তিক পেরিয়ে দূর সুরিনামে। পথে সদাচারী ডাক্তারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন বিভানের ঘোর বিবাদ বেঁধে গেল। কাপ্তান বলেন, বাবু তোমাকে আমি দেখে নেব। বাবু বলেন, সাহেব তোমাকে আমি দেখিয়ে ছাড়ব কত ধানে কত চাল। কিন্তু দরিয়ায় বিবাদ। কাপ্তান সেখানে জলে কুমিরের মতো। বাবু তাঁর সঙ্গে পারবেন কেন? কাপ্তান পথে অ্যাসেজসাজ নামে একটি দ্বীপে স্ত্রী পুত্রাদি সহ ডাক্তারকে নামিয়ে দিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলেন, এই বাঙালি ডাক্তার ভারতীয় কুলিদের বিদ্রোহী করে তুলছিলেন। তিনি জাহাজে থাকলে বিদ্রোহ নিশ্চিত। সুতরাং তাঁকে নামিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওঁরা ডাক্তারের হাতে পঞ্চাশ পাউন্ড গুঁজে দিয়ে জাহাজ এবং শ্রমিকদের নিয়ে চলে গেল। আমরা হায় হায় করতে লাগলাম। এই বাঙালি ডাক্তার ছিল আমাদের সত্যকারে অভিভাবক। তিনি আমাদের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সাহস দিয়েছেন প্রতিবাদ করতে। যাহোক, বিচার সভা বসল সেই অজানা দ্বীপে। ডাক্তার বললেন ক্যাপ্টেন বিভান মিথ্যাবাদী। তিনি যা বলেছেন তার এক বর্ণও সত্য নয়। আসলে এই ক্যাপ্টেন জাহাজের মাল তছরুপ করছেন, শ্রমিকদের খাবার পর্যন্ত চুরি করছেন। আর জাহাজের থার্ড অফিসার দুটি ভারতীয় মেয়েকে জোর করে শয্যাসঙ্গিনী করছে। আমি এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার দেশের শ্রমিকরা যখন মেয়েদের মুক্তি দাবি করে, তখন আমি তাদের সমর্থন করেছিলাম, এই আমার অপরাধ। বিচারে ডাক্তার নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। বিচারকরা মন্তব্য করলেন, ক্যাপ্টেন বিভান যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়নি। ডাক্তার কেমন করে পঞ্চাশ পাউন্ড সম্বল করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, এবং সেখানে এসে কীভাবে অবিচারের প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের জানা নেই। একজন অন্তত আমাদের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য লড়েছিলেন, এই স্মৃতি নিয়েই আমরা পৌঁছেছিলাম আমাদের নতুন ঠিকানায়। ডাক্তারবাবুকে আমাদের সালাম!

ডাঙায় নামবার পর শুরু হত আর এক জীবন। সে জীবনের সঙ্গে আমেরিকার দাসদের জীবনের যত না অমিল তার চেয়ে বেশি মিল। এ ব্যাপারে সব উপনিবেশের 'কুলি' তথা শ্রমিকদের ভাগ্য বলতে গেলে একই সূত্রে বাঁধা। আমরা কেনা গোলাম না হতে পারি, যদিও আমরা প্রায় সকলেই 'গিরমিটওয়ালা, ' কেউ

কেউ 'খুলা' বা মুক্ত শ্রমিক, তবু ক'দিন পার হতে না হতে জেনে যাই আমরাও গোলাম মাত্র। কি মরিশাসে, কি ফিজিতে, কি মালয়ের রবার বাগানে, কি ওয়েস্ট ইন্ডিজে, কি সিংহলে কিংবা অসমের চা বাগানে আমরা যেন গোলামেরও অধম, প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমাদের সম্বল দুটি হাত, আর দুটি হাতিয়ার, একটি গাইতি বা শাবল আর একটি ভারী ধারালো ওজনদার কাটারি, যাকে ওঁরা বলেন 'কাটলাস'। তাই নিয়ে জমি সাফ থেকে শুরু করে, গাড়ি টানা, গর্ত করা, জমিতে খাল কাটা, আখ রোপন, আগাছা পরিষ্কার করা,—সব করতে হয় আমাদের। তারপর আখ কাটার মরশুমে, আখ কাটা, পেষাই করা, রস জ্বাল দেওয়া। চিনি? না তিক্ত রস? শ্রমিকের ঘাম আর রক্তে সে এক আশ্চর্য রসায়ন, বাইরের জগতে তার বড়ই কদর।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঠকয়লায় ছবি আঁকত। একবার একজন এঁকেছিল 'গিরমিটওয়ালা'দের। তার পিঠ বাঁকা, সে যেন কুঁজো, দুটি হাত পেছনে পিঠমোড়া করে শিকলে বাঁধা, চোখ দিয়ে জলের ফোটা মাটিতে পড়ছে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ছবিটির দিকে। কে বলবে, এ ছবি আমাদের নয়? দেশেও নাকি রটে গিয়েছিল আমাদের দুঃখের কথা। কে বা কারা রটিয়ে দেয় সাহেবরা এ দেশের মানুষকে কালাপানি পার করে অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের মাথা গুঁড়িয়ে তেল তৈরি করে। সে তেলকে বলে—'মিমিয়ামি কি তেল।' ছবিতে দেখা যায় গরম কড়াইয়ে টপটপ করে পড়ছে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলানো কুলির ভাঙা মুণ্ডু থেকে তেল! এ ছবিকেও পুরোপুরি মিথ্যা বলতে পারি না আমরা। শুধু তেলের বদলে আখের রস বললেই হুবহু ঠিক বলা হত, এই যা।

মাথা গুড়িয়ে না দিলেও খেতে খাটুনি ছিল হাড়ভাঙ্গা। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। হাতে শাবল দিয়ে বলা হল—যাও, গর্ত করো, আখ বসাতে হবে। মাথার উপর চাবুক হাতে ওভারসিয়ার। ধীরে সুস্থে কাজ করার সুযোগ নেই। থামলেই উদ্যত চাবুক, কী থামলে যে? দিনের মধ্যে ৫ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া, ৫ ফুট গভীর অন্তত আশি নব্বুইটি গর্ত করতে হবে। মাটি নরম হলে ১৫০টি! তার জন্য মজুরি কত জানো? ২০ সেন্ট। কোনও ঠিকাদারকে দিয়ে এ কাজ করাতে হলে খরচ পড়ত সাড়ে তিন ডলার। আমরা স্পষ্টতই ঠগের হাতে পড়েছি।

নিয়ম ছিল কাজ করতে হবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। কিন্তু কখনও পনেরো ঘণ্টার আগে ছুটি মিলবে না। মাড়াইয়ের মরশুমে কাজ চলত রাতভর। কিন্তু বোনাস ছিল নাম মাত্র। আইন মাফিক মাইনে পর্যন্ত সব সময় মিলত না। প্রথম দিকে কেটে নেওয়া হত সেই আড়কাঠি থেকে শুরু করে ফড়েদের দেওয়া আগাম। কিস্তিতে কিস্তিতে, সুদ সমেত। বলতে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মাইনেই মিলত না। চলতে হত ধার করে। ওসব দেশেও ছিল সুদখোর মহাজন। আমাদের দেশের মহাজনদের অধম। চশমখোর সব। টাকায় বছরে সুদ ২৫০ টাকা, কেউ কেউ চায় ৫০০ টাকা! যখন মাইনে মিলত তখন আবার কথায় কথায় কাটাকাটি।

আলসেমির জন্য, ঠিক সময়ে কাজ হাসিল না করতে পারার জন্য, আরও নানা ছুতো। কাজ শেষ হয়নি বলে, কখনও কখনও আবার মাইনেই দেওয়া হত না। মরিশাসে ওঁরা নিয়ম করলেন, কেউ কাজে অনুপস্থিত হলে, তা কারণ যা-ই হোক না কেন, 'ডাবল কাট' হবে। অর্থাৎ একদিনের বদলে দু'দিনের মাইনে কেটে নেওয়া হবে! একে তো ওই মাইনে, তার উপর এই কাটাকুটি। সরকার পর্যন্ত কাণ্ড দেখে তাজ্জব। ১৮৮২ সালে তাঁরা মরিশাসে তদন্ত করে দেখলেন যেখানে শ্রমিকদের মাসে প্রাপ্য হওয়া উচিত ৬ টাকা ৭৯ পয়সা, তারা সেখানে পাচ্ছে মাত্র ৪ টাকা ৮৭ পয়সা। এমনকী ১৯০০ সালেও সেখানে কাজ হয়নি ওজর তুলে কেটে দেওয়া হয়েছিল শতকরা ৪০ টাকা হারে মজুরি। ত্রিনিদাদে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল শ্রমিকদের যেখানে বছরে ২৮০ দিন কাজ করার কথা, সেখানে ৯১ দিনের মাইনেই কেটে নেওয়া হয়েছে নানা ছুতো দেখিয়ে। লুঠ আর কাকে বলে।

কোম্পানির আসল কর্তারা বাগিচা বা খামার থেকে অনেক দূরে লন্ডন, বার্মিংহাম, কিংবা প্যারিস আমস্টারডামে টাকার পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন। খামারে খামারে রয়েছেন তাঁদের মাইনে করা কুঠিয়াল। তাঁর অধীনে নানা অফিসার। মাঠে খবরদারির জন্য ওভারসিয়ার। সবাই কিন্তু নানা মাপের লুঠেরা। সুযোগ পেলেই শ্রমিককে যেমন ঠকাচ্ছেন, তেমনই মালিকের পকেটেও হাত গলাচ্ছেন। হ্যাঁ, শ্রমিকের স্বার্থ দেখবার জন্য এখানেও আছেন প্রোটেকটার বা রক্ষক, আইনের মান রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট, এবং উপরওয়ালা শাসক। কিন্তু খামার মালিক তথা কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁরা যেন হরিহর আত্মা। এক সঙ্গে উঠাবসা, নিয়ম করে খানাগানা, আমোদ আহ্লাদ। দেশে যেমন নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সরকারি আমলা ম্যাজিস্ট্রেটদের মাখামাখি, কলোনিগুলিতেও তা-ই। শ্রমিকের আর্তনাদ কর্তাদের কানে পৌঁছায় না। তাঁরা হা-ডুডু বলে কুঠিওয়ালাদের সঙ্গে করমর্দন করতে ব্যস্ত।

আর সেই মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি। ওঁরা যেন ধরেই নিয়েছিল আমাদের শরীরের শেষ বলটুকুর মতো মেয়েদের নাভির তলটিও ওঁদের কেনা। আফ্রিকার দাস মেয়েদের নিয়ে ওঁরা যা করছিলেন ভারতীয় মেয়েদের নিয়েও তা-ই করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। আমাদের দলে মেয়েরা পুরুষের অনুপাতে সব সময়ই কম থাকত। খামারেও কেউ কেউ তা-ই ঘরওয়ালি খুঁজত। কিন্তু সাহেবদের উচ্ছিষ্টে সকলের মন ভরবে কেন? সাহেবদের অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েগুলো কবে বড় হবে তারা সেই আশায় বসে থাকবেন কেন? যাকে পান, তাকেই কাছে টানেন। সব উপনিবেশেই স্বভাবত ক্রমে হামা দিতে শুরু করে বর্ণসংকর শিশুর দল। ক্যারিবিয়ানে তাদের বলে 'মুলাটো'। তাদের জননী আফ্রিকান অথবা এশীয়।

ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে অনেক সময় গোলমাল হত। আমরা প্রতিবাদী হতাম।

মেয়েরাও কখনও কখনও এমন ভাবে দুই উরু খিল দিত যে বলাৎকার ছাড়া তখন আর বিকল্প থাকত না কামার্ত সাহেবদের সামনে। আগে আত্মহত্যার কথা বলেছি। মরিশাস আত্মহত্যার অনেক ঘটনাই দেখেছে। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সনের মধ্যে সেখানে ক্রমান্বয়ে প্রতি বছর আত্মঘাতী হয়েছে ৮৯ জন, ৫৯ জন, ৫৭ জন। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা তখন মাত্র ৯০ হাজার। কর্তৃপক্ষ এই আত্মনাশের কারণ নিয়ে ভেবে ভেবে কুল পাননি। তাঁদের মনে হয়েছিল এক কারণ যদি স্বদেশের স্মৃতি ভুলতে না পারা, তবে আর এক কারণ সঙ্গিনীর অভাব। মেয়েরা যে কখনও ইজ্জত বাঁচাতে আত্মঘাতী হতে পারে, এ তথ্য তাঁদের মাথায় ঢোকেনি।

কলোনিগুলোতে কেনা গোলামের মতোই অত্যাচারিত হতাম আমরা। ওভারসিয়ারদের চাবুকের সামনে আমরা ছিলাম ভারবাহী জন্তু মাত্র। 'কুলি' শব্দটার মানেও ছিল তাদের কাছে—ভারবাহী মানুষ। সুতরাং, মারধর, যা খুশি কর ওকে নিয়ে। মেরে ফেললেও কিছু আসে যায় না। কানুন যা-ই বলুক, সাতখুন মাফ! মরিশাসে একবার তদন্ত করে দেখা গেল ১৮৬৭ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে সেখানে অন্তত ৫০ জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের খাতায় যার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে—প্লীহা ফেটে যাওয়া! কারা ফাটিয়ে ছিল, কী ভাবে সে প্রশ্ন কেউ তোলেনি।

আমাদের সরকার গঙ্গামাইয়ের মতো, সকলের সব পাপহর। পার্থক্য একটাই, গঙ্গায় একবার অন্তত ডুব দিতে হয়, এঁদের মার্জনা পেতে হলে মোটা দক্ষিণা দিতে হয়! মরিশাসে ১৮৯৩ সালে এক সরকারি বয়ানে দেখা যায় আমরা খামার মালিকদের বিরুদ্ধে রাজসরকারের কাছে নালিশ করেছি ১১৯ বার। প্রধানত মাইনে আটকে দেওয়া, আর অহেতুক মারধরই ছিল আমাদের অভিযোগের উপলক্ষ। তার মধ্যে ৭৮টি ক্ষেত্রে সরকারি লোকেরা আমাদের তরফে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে মালিক তরফ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কয়েক হাজার। তাতে সাজা হয় ৬৭৫৪ জন পুরুষ শ্রমিকের, ৭২২ জন মহিলার। অনেককেই পাঠানো হয় শ্রীঘরে। বোঝো তা হলে ন্যায় বিচার কাকে বলে! একজন ভাল মানুষ সাহেব ১৮৭৫ সালে হিসাব করে সরকারকে জানিয়েছিলেন এই দ্বীপের মোট জনসংখ্যার প্রতি সাতজনের মধ্যে একজনকে কখনও না কখনও কোনও ছুতোয় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এসব কি ঠিক হচ্ছে?

উপনিবেশগুলোতে কিছুই ঠিকঠাক চলছিল না। বঞ্চনার উপর বঞ্চনা। অত্যাচারের উপর ফের অত্যাচার। মেয়েদের বেশরম করা, মানুষকে যতভাবে ঠকানো যায়, যন্ত্রণা দেওয়া যায়, সবই ওঁরা করেছেন নয়াপত্তন ওই সব দ্বীপে কিংবা অন্যান্য নিজেদের এলাকায় সাজানো বাগবাগিচায়। ফলে যদিও আমরা ছিলাম 'গিরমিটওয়ালা', যদিও পাঁচ বছর পর দেশে ফেরার হকদার, তবু অধিকাংশের কাছেই সেই স্বপ্ন থেকে যায় অপূর্ণ। অধিকাংশের ফেরার ক্ষমতা নেই, দেনায় হাত পা বাঁধা। অন্যদের অনেকে ব্যর্থ অভিযাত্রী, দেশে ফিরবে তারা

কোন মুখে? বিদেশে হতাশা কুড়ানো ছাড়া আর কিছুই যে তাদের তববিলে নেই। তৃতীয় দল জীবনযুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। তাদের কাছে যেন পাঁচটা বছর ছিল টানা দুঃস্বপ্ন, তবু তারা কঙ্কালটিকে টানতে টানতে একবার দেশে পৌঁছে মাটিতে মিশতে চায়। একমাত্র খুশি মনে ফিরত সর্দাররা। কেউ কেউ আবার নতুন দল নিয়ে ফিরেও যেত। অন্যরা, ব্যর্থ এবং অক্ষমেরাও কেউ কেউ ফিরত বটে, কিন্তু সংখ্যায় কোনও দলই খুব বেশি নয়। এক কথায় রপ্তানির তুলনায় আমদানি রীতিমতো তুচ্ছ। একেবারে শেষদিককার একটা হিসাব শোনানো যেতে পারে। ১৯১৬ সালে ত্রিনিদাদ থেকে ফিরে আসে ৫৮০ জন, জ্যামাইকা থেকে ২৭০ জন, ফিজি থেকে ৪৩৬ জন, মরিশাস থেকে ২৬৪ জন, নাটাল থেকে ৬২৫ জন! তাদের মধ্যে ১৫০ টাকা নিয়ে (বা তার বেশি) ফিরতে পেরেছিল যথাক্রমে ১২০, ৬৩, ১০৪, ১৪ এবং ৫ জন। ১ টাকা বা তার বেশি ছিল ১৯২, ৯০, ১৫৯, ৬৮ এবং ৫ জনের। কিছুই যাদের ছিল না তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৮, ১৮০, ২৭৭, ১৯৬ এবং ৬২০ জনের।

> আমি গঙ্গাধর। পনেরো বছর খামারে খাটার পর সদ্য আমি কলকাতায় পৌঁছালাম। আমি ছিলাম একজন 'গিরমিটওয়ালা'। আমাকে পাঠানো হয়েছিল ডাচ গিয়ানায়। পাঁচের বদলে আমি সেখানে পনেরো বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছি। আমার পকেটে আজ একটিও টাকা নেই। আমার খাবারের পয়সা নেই। আমার ঘর ছিল বান্দায়। সেখানে পৌঁছাবার মতো রেলভাড়া নেই। দোহাই হুজুর, আমার প্রাণ বাঁচান!

গঙ্গাধর এ আর্জি পেশ করেছিল কলকাতায় 'প্রোটেকটার'-এর কাছে। জানি না তিনি কী করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত বেচারা গঙ্গাধরের কী হয়েছিল। সে কি তার গ্রামের বাড়িতে বউ বাচ্চাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল?

আমরা যারা কোথায়ও পৌঁছাইনি তারা যে-যার জমি আঁকড়েই পড়েছিলাম। বাধ্য হয়ে বিদেশকেই স্বদেশ বানিয়েছিলাম। আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, আমরা পুরোপুরি অন্য মানুষ। দূর দূরান্তে আমরাই সব। আমরাই সেখানে সরকার গড়ি। আমরা কিংবা আমাদের আফ্রিকান ভাইরা। বলতে গেলে সব উপনিবেশেই আমাদের রাজ। আমরাই প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিধায়ক। আমরাই পুলিশ, প্রশাসন, আমলা। আমরা খবরের কাগজ চালাই, বই লিখি, গান বাঁধি, সিনেমা থিয়েটার তৈরি করি। ক্রিকেটের দল গড়ি। আমরা স্কুল কলেজ চালাই, হাসপাতাল চালাই,—আমাদেরই সব। এমনকী জেলখানা পর্যন্ত আমাদের। এখন খামারমালিক যিনি বা যাঁরাই হোন, সেখানে বহাল আমাদের কানুন। আমরা আর 'গিরমিট' নই, আমরা স্বাধীন মানুষ।

এটা সম্ভব হয়েছে কারণ আদিযুগের আফ্রিকার দাসদের মতো আমরা বেওয়ারিশ ছিলাম না। আমাদের দেশ ছিল, সমাজ ছিল। দেশে আমাদের জন্য কাঁদবার মতো মানুষ ছিলেন। ছিলেন বিদেশেও। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় জনৈক

অ্যাটর্নি মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীকে কুলির পোশাক পরিয়েছিলাম। আমাদের জন্য লড়তে গিয়েই তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন মহাত্মায়। মহাত্মা, যিনি সদা জনানং হৃদয়ে স্থিত। আমাদের জন্যই কাঁদতে কাঁদতে সি এফ অ্যান্ড্রুজ পরিণত হয়েছিলেন দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের আর্তনাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন দাদাভাই নৌরজি। ভারতের মাটিতে আমাদের কান্নাকে ভাষা দিয়েছিলেন মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, এবং আরও কত না জননায়ক। আমরা ভারতীয় জাতীয়তার উন্মেষকে ত্বরান্বিত করেছিলাম। ব্রিটিশ সরকারের সাধ্য ছিল না সেদিন এইসব উঁচু মাপের মানুষের সওয়াল উপেক্ষা করেন। তাঁরা আইন সংস্কার করেছেন দফায় দফায়। তারপরও যখন আমাদের দাবি মেটানো সম্ভব হল না, তখন বাধ্য হয়েই তাঁরা পুরোপুরি বাতিল করে দিলেন সেই কালাকানুন। সেটা ১৯১৭ সালের কথা। অসমে ওরা দাসখত ছিঁড়ে ফেলে আরও আগে, ১৯১৩ সালে।

কানুন বাতিল করতে ওঁরা বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ একদিকে সেদিন যেমন মহাযুদ্ধের দামামা, অন্যদিকে কলোনি-কলোনিতে প্রতিবাদের ঝড়। আমরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম।

প্রথম বিদ্রোহ ১৮৭৩ সালে ব্রিটিশ গিয়ানার পথে জাহাজে। আমাদের নেতা ছিল হনুমান আর লক্ষণ নামে দুই সর্দার। গোলমাল শুরু হয়েছিল খাবার নিয়ে। ক্যাপ্টেন ১১ জন কুলিকে শেকল পরান। জর্জ টাউনে বিচারসভা বসে। সেখানে ঝাড়ুদার বলে দেয় যে, সাহেবরা আসলে মেয়েদের বলৎকার করত। শেষ পর্যন্ত কর্তারা ক্যাপ্টেনকে তিরস্কার করে ছেড়ে দেন। সে-বছরই ওই ডোমেরারা বা ব্রিটিশ গিয়ানায় বিদ্রোহের অভিযোগে ৫ জন কুলিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৫০০ কুলি একযোগে প্রতিবাদ জানায়। মালিকেরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ওঁরা আপস করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ওই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিল কলকাত্তাওয়ালারা। তাদের মধ্যে ৫/৬ জন ছিল এক সময় ফৌজি। সে-বছরই একটি বাগানে বেতন কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৯০৯ জন শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয়। যাকে বলে ধর্মঘট। তারা মিছিল করে শহরে গিয়ে পৌঁছায়। তাদের নেতা ছিল হংসরাজ। উপরওয়ালারা তাকে গ্রেপ্তার করে। শ্রমিকেরা তাকে জোর করে ছিনিয়ে নেয়। তুমুল গোলমাল। সেবারও কোনও মতে ওঁরা শান্তি ফিরিয়ে আনেন। রফা হিসাবে পুরো মাইনে দিতে হয়। তবে বিদ্রোহের অপরাধে হংসরাজ, ললিত ও জওহর নামে একজন, মোট তিনজনের শাস্তি হয়। বিদ্রোহ সুরিনাম বা ডাচ গিয়ানাতেও। উপলক্ষ একদিকে মাইনে কেটে নেওয়া, অন্যদিকে মেয়েদের নিয়ে টানাটানি। বিরোধ মীমাংসার জন্য এক সাহেবকে মধ্যস্থ নিয়োগ করা হয়। বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। বদলা হিসাবে ডাচ পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে ১৩ জন শ্রমিককে। আহত হয় ৪০ জন! দাবানলের মতো সে-খবর ছড়িয়ে পড়ে খামারে খামারে। চতুর্দিকে ধূমায়িত অশান্তি। এক ব্রিটিশ গিয়ানাতেই

১৯০৩ সালে ধর্মঘট হয় এগারোটি! একটিতে পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৬ জন ভারতীয়, আহত ৭জন।

আরও অনেক ঘটনা। ১৯০৩ সালে ত্রিনিদাদের একটি এস্টেটে গোলমাল শুরু হয়। শ্রমিকেরা ততদিনে দল বেঁধে প্রতিবাদে দীক্ষিত হয়েছে। ৬৭ জন একজোট হয়ে হাজির হয় ইনস্পেক্টারের অফিসে। তিনি তাদের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন। ৬৪ জনকে বিদ্রোহের দায়ে সাত দিনের জন্য বন্দি করা হয়। গোলমাল তবু মিটল না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজনকে 'গিরমিট'গিরি থেকে রেহাই দেওয়া হয়, কাউকে কাউকে অন্য খামারে বদলি করা হয়। আর শ্রমিকদের নেতা দৌলত সিংকে ফেরত পাঠানো হয় ভারতে।

১৯১৩ সালের আর একটি ঘটনা। সাধারণত চিনি তৈরির মরশুম শেষ হওয়ার পর সব খামারেই শ্রমিকরা চারদিন ছুটি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ গিয়ানায় 'রোজ হিল' নামে একটা বাগানের মালিক বললেন—তা হচ্ছে না। এ বার ছুটি দিতে পারব না।

শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলল, তা কেমন করে হয়? মালিক রেগে গিয়ে বললেন হয় কি না হয় দেখা যাবে। তিনি অবাধ্যতার জন্য ৭ জন শ্রমিকের নামে পুলিশে নালিশ করে সমন ধরালেন। অ্যাজেন্ট জেনাবেল বললেন, হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে তিন দিন ছুটি দেওয়া হোক। কিন্তু খামারের কর্তৃপক্ষ নাচার। তিনি সমন তুলে নিতেও রাজি হলেন না। বরং নিজেদের শক্তি দেখাবার জন্য ওঁরা ছয় জনকে ছাঁটাই করে বসলেন। দু'-তিনশো শ্রমিক দল বেঁধে হাজির হল আদালত প্রাঙ্গণে। খামার কর্তৃপক্ষ আগেই পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ দিকে এই ডামাডোলের মধ্যে খামারের ম্যানেজার কয়েকজনকে বদলির সংবাদ ঘোষণা করলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। পুলিশ বদলি করা শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করতে গেলে গঙ্গা নামে একজন শ্রমিক অন্যদের উত্তেজিত করে পুলিশকে প্রতিহত করতে। পুলিশ অফিসার পরিস্থিতি দেখে থমকে দাঁড়ান। ও দিকে খামারের কাজ পুরোপুরি বন্ধ। বিদ্রোহী ভারতীয় শ্রমিকরা অন্যদেরও কাজ করতে দেবে না। গঙ্গা এবং আরও চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। বিরাট বাহিনী নিয়ে পুলিশ এ বার এগিয়ে আসে পরোয়ানা কার্যকর করতে। পুলিশ বাহিনীরই একজন অফিসার কর্পোরাল জেমস রামসে ছুটে এলেন মতিখান নামে একজন নেতাকে ধরতে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভারী কাটারি যাকে বলে কাটলাস দিয়ে একজন তাঁর ধড় থেকে মুন্ডু ছিন্ন করে বসল। হাতে হাতে উদ্যত কাটলাস। পুলিশ বেপরোয়ার মতো এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করল। তাতে প্রাণ হারায় ১৫ জন ভারতীয় শ্রমিক। আহত হয় ৪০ জন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিল মতিখান, শাদুল্লা এবং গফুর। হিন্দু মুসলমান আমরা সেদিন ভাই ভাই।

শেষ করার আগে আর একটি ঘটনা। কবে সেটি ঘটেছিল এবং কোথায় আজ আর তা মনে নেই। এটুকুই মনে পড়ছে, নাম না জানা সেই ছোট্ট দ্বীপটি ছিল মরিশাসের কাছে। আমরা ছিলাম মালাবার থেকে ধরে আনা 'কড়ারি শ্রমিক'। কথা

ছিল আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে মরিশাসে। কিন্তু জাহাজের কাপ্তান বোধহয় লোভের বশে, চালাকি করে আমাদের নামিয়ে দেয় সেই দ্বীপে। সেখানে আখ কেন, কোনও খেতই নেই। চারদিকে শুধু নারকেল গাছ। নারকেল গাছের বন। মালিক ছিলেন এক স্থানীয় ফরাসি সাহেব। খুবই বদরাগী মানুষ। আমরা কখনও নারকেল গাছে চড়িনি। সাহেব বললেন, তোমাদের এইসব গাছ থেকে নারকেল পাড়তে হবে। হ্যাঁ, এটাই তোমাদের কাজ। আমরা তাঁর মূর্তি দেখে ভয় পাই, ইতঃস্তত করি। তিনি বললেন,—কাল থেকেই লেগে যাও। নতুন কাজ। রপ্ত করতেও সময় লাগে। কিন্তু সাহেব বড়ই অধৈর্য। তিনি সেজেগুজে সিটি দিতে দিতে বাগানে এসেই থমকে দাঁড়ান। তাঁর হাতে দেড় ইঞ্চি মোটা চার ফুট লম্বা একটা দড়ি। সেটাই বোধহয় তাঁর চাবুক। খেলাচ্ছলে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি আমাদের কাছে আসার ইঙ্গিত করলেন। রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে জিজ্ঞাসা করলেন—এত ধীরে কাজ করছ কেন তোমরা?

—এ কেমন কাজের ধারা? আমাদের সর্দার এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল কাজটা রপ্ত হলেই আরও তাড়াতাড়ি কাজ হবে সাহেব। কিন্তু কে কার কথা শোনে? সাহেব রেগে গিয়ে তার পিঠে বসিয়ে দিলেন দড়ির এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের একজন ছুটে এসে কুড়ুলের এক ঘায়ে তাঁর মাথা দু'ফাঁক করে দিল। যা হবার হয়ে গেছে। উচিত সাজা পেয়েছে শয়তান। এখন আর ভয় পেলে চলবে না। আমরা তক্ষুনি সাহেবকে বালিতে পুঁতে ফেললাম। দু'দিনের মধ্যে সেই জাহাজ ফেরার পথে ভিড়ল এসে দ্বীপে। আমরা কাটারি, কুড়ুল নিয়ে লাফিয়ে উঠলাম জাহাজে। কাপ্তানকে বললাম—আমাদের দেশে নিয়ে চলো। আমরা এখানে থাকব না। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, আমরা মালাবারের মানুষ, দরিয়া জাহাজ কিছুই আমাদের অজানা নয়। সুতরাং, আমাদের ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথায়ও যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমাদের চেহারা দেখে কাপ্তান ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন,—তোমরা শান্ত হও। আমি ঠিক তোমাদের মালাবারে পৌঁছে দেব। সাহেব কথা রেখেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকারের শাসন যন্ত্রটি নিপুণ হাতে বোনা, তাকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। সুতরাং যথাসময়ে আমাদের নামে হুলিয়া বের হল। ক্রমে ক্রমে আমরা প্রায় সকলেই ধরা পড়ে গেলাম। বিচারও হল। বিচার হয়েছিল কোন অপরাধে জানো? সাহেব খুনের দায়ে নয়, বিদ্রোহের জন্য। হ্যাঁ, আমরা ছিলাম বিদ্রোহী। স্বাধীনতা আমরা রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিলাম। স্বাধীনতা আমরা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

সভ্যতা, একবার নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো। তুমি কি পুরোপুরি পাপস্খালন করতে পেরেছ? তোমার রক্তাক্ত হাত দুটি কি এখন পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন? তুমি কি লোভ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? তবে এখনও কেন হার্লেমে কালোমানুষের কান্না শুনি, কেন এখনও তাদের লিঙ্কন মেমোরিয়ালের দিকে

মিছিল করে হাঁটতে হয়? কেন, আদালত সেখানে এখনও পক্ষপাতদুষ্ট? কেন, সাদা কালো ভেদাভেদ? কেন আরব মুলুকের কোনও কোনও দেশে মেয়েরা এখনও হারেমে বন্দি? কেন, তাদের ভগাঙ্কুর ছেঁটে দিয়ে তাদের যৌনতাকে বশে রাখার চেষ্টা হয়? কেন, ভারতে উচ্চবর্ণের জোতদারের ভাড়াটিয়া পকেট ফৌজের বন্দুকবাজ গুণ্ডারা যখন তখন গরিবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে এমনকী শিশুকেও হত্যা করে রক্তের উৎসবে মাতে? কেন দলিতের বসতিতে নিশুতি রাতে এই সনাতন দেশের উপরতলার মানুষ এখনও তাদের অনিবার্য ভবিতব্যকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য বেপরোয়া চেষ্টা করে? কেন এখনও হাজারিবাগ বা গয়ায় ঠাকুর্দার বাবার দশ টাকার কর্জ শোধ করতে তিন চার পুরুষ পরেও গরিবকে বেগার খাটতে হয়? সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, কেন বিশ্বময় একনও পুঁজির এই নির্লজ্জ আস্ফালন? এই বাধাবন্ধহীন খোলা বাজার কার স্বার্থে? তথাকথিত মুক্ত দুনিয়াতেই বা সত্যকারের মুক্ত কারা? বলা হচ্ছে, মানুষ নাকি স্বভাবতই স্বার্থপর, তবে ওঁরা কেমন করে ভুলে যান গরিবেরও স্বার্থ চিন্তা থাকা সম্ভব? তা হলে কেন তারা আজ নতুন করে হাটের পণ্য। কেন নিয়ত শুনি 'ফায়ার'! 'ফায়ার'! আমাদের কানে গোলাগুলির মতো অহরহ আজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এই শব্দ। চোখ বুঁজলে দেখতে পাই, রণক্ষেত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গরিব শ্রমজীবির শব। স্বভাবতই এখনও আমাদের কানে বাজে শৃঙ্খলের ঝনঝন। হাওয়ায় এখনও ভাসে যুগযুগান্তব্যাপী অসহায় নরনারীর সেই কান্না। ঈশ্বর নাকি সর্বজ্ঞ, কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। তবু কেন আমরা ন্যায়বিচার পাই না! কেন আমাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা? কেনই-বা এই প্রতিরোধের স্পৃহা। সে কি ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী শয়তানের প্ররোচনায়? ওঁরা হয়তো তা-ই বলবেন। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা জেনে গেছি আমাদের লড়াই চলতে থাকবে। গরিবের, দলিতের ছেঁড়া জামা-ই একদিন বিজয়ী রোমানদের পতাকার মতো পতপত করে উড়বে আকাশে।—আমি জানি না কে আমি, কী আমার বয়স, কোথায়ই-বা আমি জন্মেছি।—'হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যান্ড হোয়ার আই ইজ বর্ণ, আই ডু নট নো!'

চিত্র পরিচিতি

১. দম্পতি। আফ্রিকার ভাস্কর্য। কাঠ ও ধাতু। মালি। সংগ্রহ: মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউইয়র্ক। প্রতিলিপি: "ব্ল্যাক আফ্রিকা/মাস্ক স্কাল্পচার জুয়েলারি", লরি মেয়ার, টেরিয়াল, ১৯৯২।

২. "কৃষ্ণাঙ্গ ভেনাস", অ্যাঙ্গোলা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পথে। শ্বেতাঙ্গ শিল্পীর কল্পনাবিলাস। শিল্পী: টমাস স্টোথার্ড। প্রতিলিপি: "ব্ল্যাক কার্গোজ", ড্যানিয়েল পি ম্যানিক্স ও ম্যালকম কাউলে, লন্ডন, ১৯৬৩। মূল ছবি উদ্ধৃত হয়েছে বাইরান এডোয়ার্ডস-এর "হিস্ট্রি অব দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ" থেকে।

৩. নিলামের মঞ্চে কৃষ্ণাঙ্গ নারী। ভার্জিনিয়ায়। "দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ কিং কটন", অ্যান্টনি বার্টন, লন্ডন, ১৯৮৪ থেকে।

৪. সুরিনামে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বিদ্রোহের অপরাধে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর শাস্তি। শিল্পী: উইলিয়াম ব্লেক। "ব্ল্যাক কার্গোজ," ড্যানিয়েল পি ম্যানিক্স ও ম্যালকম কাউলে, লন্ডন, ১৯৬৩।

৫. গোলামের হাটে আমন্ত্রণ। পোস্টারে। আমেরিকা। ১৮২৯। উদ্ধৃত: "জ্যাকড সিরিজ" (১২ নম্বর), জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৬৬। সৌজন্য: উইলবারফোর্স মিউজিয়াম, হাল।

৬. স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার হাতিয়ার,—শেকল। খাস আফ্রিকা থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন লিভিংস্টোন। "জ্যাকড সিরিজ" (১২ নম্বর), জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৬৬ থেকে। সৌজন্য: উইলবারফোর্স মিউজিয়াম, হাল।

৭. দাস-শিকারিদের ফাঁদে যারা ধরা পড়েছে বন্দি করে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দরিয়ায় নোঙর-করা সাহেবদের জাহাজের দিকে। "জ্যাকড সিরিজ" (১২ নম্বর), জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৬৬ থেকে।

৮. দাসবাহী জাহাজ "ব্রুক্‌স"-এর ভেতরে এভাবেই পণ্য হিসাবে সাজিয়ে রাখা হত অসহায় মানুষকে। কত কম জায়গায় কত বেশি মানুষকে রাখা যায়, লক্ষ্য ছিল সেটাই। "দ্য হিস্ট্রি অব দ্যা রাইজ, প্রোগ্রেস অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশমেণ্ট অফ দ্য স্লেভ ট্রেড", টমাস ক্লার্কসন, লন্ডন, ১৮০৮। বইটির সূত্র ধরে নকশাটি তৈরি করা হয় "উইলবারফোর্স কমিটি"-র উদ্যোগে।

৯. দাস-ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতার একটি পৃষ্ঠা। ওই বিশেষ কোম্পানিটি ১৬৯৮-১৭০১ সালের মধ্যে আফ্রিকা থেকে বার্বাদোস, জ্যামাইকা, এবং আন্টিগুয়ায় কত দাস আমদানি করা হয়েছে তার খতিয়ানের অংশ। সৌজন্য: ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন।

১০. আবার একটি নিলামের দৃশ্য। আমেরিকার গোলামের হাট থেকে। "জ্যাকড সিরিজ" (১২ নম্বর), জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৬৬ থেকে।

১১. বিনোদিনী। তুর্কি হারেমের এই সুন্দরী গুণবতী আমোদিনীরা ছিলেন আসলে বন্দিনী। এই মেয়েটি একজন সিরকাসিয়ান ক্রীতদাসী। "লর্ডস অব দ্য গোল্ডেন হর্ন," নোয়েল বার্বার, লন্ডন, ১৯৭৬ থেকে। মূল ছবি উদ্ধৃত: "ইলাস্ট্রেশনস অব কনস্টান্টিনোপল অ্যান্ড ইটস এনভাইরনমেন্ট," ফিশার, লন্ডন, ১৯৩৮ থেকে।

১২. সুলতানা রাজিয়া। দাস বংশের সুলতান ইলতুতমিসের এই কন্যাই ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে প্রথম নারী। ষড়যন্ত্রকারী পুরুষেরা এই বীরনারীকে হত্যা করেছিলেন। সমকালের চিত্র অবলম্বনে আঁকা। শিল্পী: গণেশ হালুই।

১৩. আকবর নাচ দেখছেন। (১৫৬১) এই নর্তকীরা ছিলেন মালবে বজবাহাদুরের দরবারে নর্তকী। তিনি মুঘল সম্রাটের কাছে পরাজয়ের পর বাদশাহের সম্পত্তি। মধ্যযুগেও হাতফিরি হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরী হতে হত হতভাগ্য সুন্দরী অথবা কলাবন্ত নারীকে। সমসাময়িক মুঘল-চিত্র। "গুলবদন", পোর্ট্রেট অফ আ রোজ প্রিন্সেস অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট, রুমার গডেন। নিউইয়র্ক, ১৯৮১।

১৪. মধ্যযুগে দিল্লির এক হারেমকন্যা। কোন দেশের মেয়ে, কার মেয়ে, কীভাবে, কোন পথে পৌঁছাল ভারতের রাজধানীতে, মুঘল অন্তঃপুরে, কে তার খবর রাখেন? মূল ছবি রয়েছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট

মিউজিয়ামে। উদ্ধৃত: "দ্য ওম্যান ইন ইন্ডিয়ান আর্ট," হেইনজ মোদে, লিপজিগ, ১৯৭২।

১৫. আনারকলি বেশে চলচ্চিত্র-নায়িকা মধুবালা। চলচ্চিত্রের একটি স্থিরচিত্র। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র "মুঘল-ই-আজম" ছিল ওঁর জীবন ও প্রণয়কাহিনী নিয়ে।

১৬. বাদশাজাদি গুলবদন। বাদশাহ হুমায়ুনের কন্যা তিনি। কিন্তু ঘটনা এই, কি সুলতানি আমলে, কি মুঘল আমলে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা কখনও কখনও দাস থেকে বাদশা, দাসী থেকে বাদশাহের লীলাসঙ্গিনীতে উত্তীর্ণ হতেন। বাদশাজাদি গুলবদনের জননী কে, আমরা জানি না, নিজে তিনি কোনও রাজ-নন্দিনী নাও হতে পারেন। সমসাময়িক মুঘল চিত্র। মূল ছবি রয়েছে বার্লিনের স্টেট মিউজিয়ামে। উদ্ধৃত: "দ্য ওম্যান ইন ইন্ডিয়ান আর্ট," হেইনজ মোদে, লিপজিগ, ১৯৭২ থেকে।

১৭. "অ্যাম আই নট আ ম্যান অ্যান্ড ব্রাদার?"—আমি কি মানুষ নই? আমি কি নই একজন ভাই? আর্ত জিজ্ঞাসা এই বন্দি ক্রীতদাসের। শিল্পী জোসিয়া ওয়েড উর্ড-এর তৈরি একটি ধাতব মেডেল। প্রতিলিপি: "দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব কিং কটন," অ্যান্টনি বার্টন, লন্ডন, ১৯৮৪ থেকে।

১৮. "আত্ম বিক্রয় পত্র", বা গোলামির আইন সম্মত খত। আমাদেরই বাংলায় ১১০১ সনে জনৈক সনাতন দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী "অন্নোপহতি ও কর্জ্জোপহতি", অর্থাৎ অন্নাভাব এবং দেনাগ্রস্তবশত নয় টাকার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছেন জনৈক রামেশ্বর মিত্রের কাছে। "হুগলি জেলার ইতিহাস" সুধীরকুমার মিত্র, কলকাতা... থেকে।

১৯. মরিশাসের বন্দরে কলকাতা থেকে চালান দেওয়া ভারতীয় দাসদের নামানো হচ্ছে। সরকারি ভাবে তাঁরা আর ক্রীতদাস নন, "চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক"। কিন্তু সন্ধানীরা বলেন বাস্তবে তাঁরা ছদ্মবেশি কেনা-গোলামেরই রকমফের। মূল ছবি: ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি অ্যান্ড রেকর্ডস, লন্ডন। উদ্ধৃত: "আ নিউ সিস্টেম অব স্লেভারি/দ্য এক্সপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান লেবার ওভারসিজ (১৮৩০-১৯২০)," হিউ টিঙ্কার, লন্ডন, ১৯৭৪।

২০. মরিশাসের পোর্ট লুইস-এ আমদানি-করা ভারতীয় শ্রমিক। নতুন পরিবেশে তাঁদের কারও কারও পোশাকও বদলে গেছে। অনেকের গায়ে সৈন্যদের পরিত্যক্ত উর্দি। মূল ছবি: ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি অ্যান্ড

রেকর্ডস। উদ্ধৃত: "আ নিউ সিস্টেম অব স্লেভারি/দ্য এক্সপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান লেবার ওভারসিজ, (১৮৩০-১৯২০)", হিউ টিঙ্কার, লন্ডন, ১৯৭৪।

২১. মরিশাস যাত্রী ভারতীয় শ্রমিকের পরিচয়পত্র। নতুন শিকারের সন্ধানে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল স্বদেশে। উদ্ধৃত: সার্ভেন্টস সরদারস অ্যান্ড সেটেলারস, ইন্ডিয়ানস ইন মরিশাস, মারিনা কার্টার, দিল্লি, ১৯৯৫।

২২. উইলিয়াম উইলবারফোর্স। বিশ্ববন্দিত রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক (১৭৫৯-১৮৩৩)। প্রতিকৃতিশিল্পী: সার টমাস লরেন্স। মূল প্রতিকৃতি রয়েছে ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি, লন্ডন-এ। উদ্ধৃত: "জ্যাকড সিরিজ" (১২ নম্বর), জোনাথন কেপ, লন্ডন, ১৯৬৬ থেকে।

২৩. প্রভুদের আনন্দদানের জন্য মৃত্যুপথযাত্রীদের জীবন নিয়ে খেলা। বধ্যভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাঁরা উচ্চৈস্বরে বলতেন,—"হে সিজার, যাঁরা মৃত্যুপথযাত্রী তুমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করো!" চতুর্থ শতকের রোমান মোজাইকে গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই। লড়িয়েদের নামও রয়েছে। উদ্ধৃত: "গ্ল্যাডিয়েটারস", মাইকেল গ্রান্ট, লন্ডন, ১৯৭১ থেকে।

২৪. গ্ল্যাডিয়েটারদের মরণপণ লড়াইয়ের আরও একটি দৃশ্য। চতুর্থ শতকের রোমান মোজাইকটি বর্বরতার স্থায়ী একটি স্মারক। উদ্ধৃত: "গ্ল্যাডিয়েটারস," মাইকেল গ্র্যান্ট, লন্ডন, ১৯৭১ থেকে।

Simon, Kathleen, Slavery, London, 1929

Coupland, R, The British Anti-Slavery Movement, London, 1937

Mathison, W.L., British Slavery and its Abolition, London, 1926

Coupland, Sir R, Wilberforce, London, 1945

Williams, Eric, Capitalism and Slavery, Newyork, 1944

Franklin, John Hope, From Slavery to Freedom, Newyork, 1956

Mannix, Daniel P. & Cowley, Malcom, Black Cargoes, A History of the Atlantic Slave Trade, London, 1963

Davidson, Basil, Black Mother, London, 1961

Davis, Brion David, The Problem of Slavery in Western Culture, London, 1970

Finly, M.L., Ancient Slavery and Modern Idiology, London, 1980

Maugham, Robin, The Slaves of Timbuktu, London, 1961

Spears, R. John, The American Slave Trade, Newyork, 1960

Lester, Julins, To be a Slave, London, 1968

Montejo, Esteban, The Autobiography of Runaway Slave, London, 1970

Haley, Alex, Roots, The Saga of an American Family, Newyork, 1976

Du Bois, W.E.B., John Brown, Berlin, 1974

Baldwin, James, The Fire Nextime, London, 1964

Aptheker, Herbert, American Negro Slave Revolts, Newyork, 1943

Carcopino, J., Dailylife in Ancient Rome, London, 1956

Mannix, Daniel P., Those about to Die, Newyork, 1958

Grant, Michael, Gladiators, London, 1967

Koestler, Arthur, The Sladiators, London, 1939

Fast, Haward, Spartacus, Newyork, 1952

Penzer, N.M., The Harem, London, 1936

Barbar, Noel, Lords of the Golden Horn, London, 1973

Sharma, R.S., Sudras in Ancient India, (NE), Delhi, 1990

Lal, K.S., The Mughal Harem, New Delhi, 1988

Elliot, H.M. & Dowson, J, History of India as told by its own Historians, Vol II, London, 1871

Raverty, H.G. (Tr), Tabaqat-i-Nasiri, London, 1881

Zakaria, Rafiq, Razia: Queen of India, Bombay, 1966

Setu, P & Rao Madhava, Tamas Nama, Bombay, 1967

Sewell, R., A Forgotten Empire, Vijoynagar, London, 1924

Ali, Shanti Sadiq, The African Dispersal in the Deccan, New Delhi, 1996

Banaji, D.R., Slavery in British India, Bombay, 1933

Ganguli, Dwarkanath, Slavery in British India, Calcutta, 1972

Chattopadhy Amalkumar, Slavery in India, Calcutta, 1959

Foster, William, Early Travels in India, London, 1921

Chattopadhy, Slavery in Bengal Presidency, 1772-1843

Stark, H.A., Calcutta in Slavery Days, Calcutta, 1916

Tinker, Hugh, A New System of Slavery, The Export of Indian Labour Overseas, London, 1974

Carter, Marina, Servants, Sirdars and Settlers: Indians in Mauritius (1834-1874)

Patnaik, Usta & Dingwaney, Manjari, Chains of Servitude/Bondage and Slavery in India, Madras, 1985

Chatterjee, Indrani, Gender, Slavery and Law in Colonial India, New Delhi, 1999

তুমিই সেই অন্ধ গর্ব, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। তোমার ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে কালিমাময় অধ্যায় হিসেবে—তোমার বৈপরীত্য হিসেবে তুমিই আমাকে নির্মাণ করেছ। আমার নাম দিয়েছ ক্রীতদাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার অন্ধকার আমাকে ভোলাতে পারেনি। আমি বিস্মৃত হইনি ক্রীতদাস আমার মৌল পরিচয় নয়। আমি মানুষ। আমি আর আমার আরও হাজার হাজার মুখ—আমরা মানুষ। এই গ্রন্থ ধরে রেখেছে তোমাকে, আমাকে, আমাদের যন্ত্রণা ও কান্নার ইতিহাসকে। তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এ গ্রন্থ পড়ে, তুমি, হে সভ্যতা আরও একবার গভীর লজ্জিত হও।